সংকলন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬

২৮ জুলাই - ৩ আগস্ট

সাগর নদী সকল জলে
মাছ চাষে সোনা ফলে

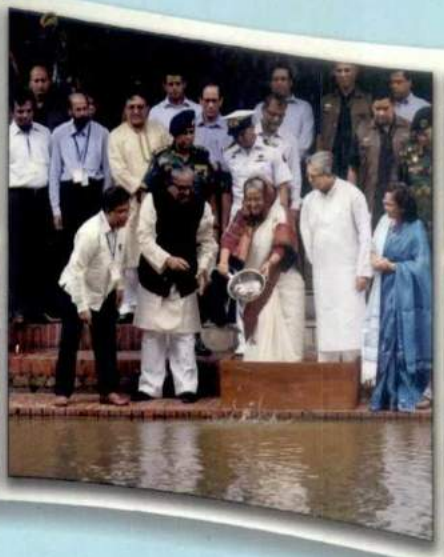

মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫

সাগর নদী সকল জলে
মাছ চাষে সোনা ফলে

মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

সৈয়দ আরিফ আজাদ	মহাপরিচালক	প্রধান উপদেষ্টা
পরিমল চন্দ্র দাস	উপপরিচালক	সভাপতি
মোঃ আবুল হাশেম সুমন	প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
মোঃ আমিনুল ইসলাম	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
মোঃ মজিবুর রহমান	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
ড. বিনয় কুমার চক্রবর্ত্তী	প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
এ কে এম লুৎফুর রহমান সিদ্দীক	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
ড. মোহাঃ সাইনার আলম	সিনিয়র সহকারী পরিচালক	সদস্য
ড. আলী মুহম্মদ ওমর ফারুক	সিনিয়র সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ হুমায়ুন কবির খান	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারুক	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ মুখলেসুর রহমান	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ মনোয়ার হোসেন	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

প্রকাশনায়
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১৫

প্রচ্ছদ
সৈয়দ রাকিবুল মইন রুমি, মৎস্য অধিদপ্তর

প্রচার সংখ্যা
৮,৫০০ (সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)

মুদ্রণ ও অলংকরণ
রিমিনি ইন্টারন্যাশনাল লি.
২৯১/বি, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা

Citation: DoF.2015. National Fish Week 2015 Compendium (in Bangla).
Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh. 148p.

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৪ শ্রাবণ ১৪২২
২৯ জুলাই ২০১৫

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষি, ব্যবসায়ী, মৎস্য বিজ্ঞানীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানসহ রপ্তানি আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ আসে এখাত থেকে। সরকার মৎস্যখাতের উন্নয়নে মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম, মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ ও মৎস্য গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। ফলে মাছের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিককালে সমুদ্র বিজয়ের ফলে 'ব্লু-ইকোনমি'র বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। দেশের সমৃদ্ধির জন্য এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে দক্ষ জনবল ও লাগসই প্রযুক্তি নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ও অন্যান্য বদ্ধ জলাশয়ে পরিকল্পিত মাছ চাষের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ স্থান অর্জন করেছে। মৎস্যখাতের উন্নয়নে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে আমি মনে করি। অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্যখাতের উন্নয়নে যে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে তা কাজে লাগাতে পারলে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্য-আয়ের দেশে রূপান্তরে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। দেশের সমৃদ্ধি প্রচেষ্টার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবারের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য 'সাগর নদী সকল জলে, মাছ চাষে সোনা ফলে' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

আমি 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫' এর সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রী

১৪ শ্রাবণ ১৪২২
২৯ জুলাই ২০১৫

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের এবারের প্রতিপাদ্য 'সাগর নদী সকল জলে, মাছ চাষে সোনা ফলে' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবীসহ মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় মাছ আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির একটি অংশ। আমাদের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে মৎস্যখাত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের ১১ শতাংশের বেশি মানুষের জীবন-জীবিকা মৎস্যখাতের উপর নির্ভরশীল। জিডিপিতে মৎস্যসম্পদের অবদান ৩.৬৯ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপিতে প্রায় ২২.৬০ শতাংশ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকারে এসেছে তখনই মৎস্যখাতের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। আমরা মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী ও সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রায় ৮৩ হাজার ৫২৪ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশ আয় করেছে ৪ হাজার ৬৬০ কোটি টাকা।

প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ বান্ধব ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৩৫ লাখ ৪৮ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে আমরা গভীর সমুদ্রে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার মালিকানা অর্জন করেছি। বিশাল এ সমুদ্র এলাকা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথা মৎস্য আহরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমরাই প্রথমবারের মত জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের কাজ শুরু করি যা এখন সফল সমাপ্তির পথে। ভিজিএফ কার্যক্রমের আওতায় ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে মৎস্যজীবীদের পরিবার পিছু ৪০ কেজি চাল দেয়া হচ্ছে এবং একইসাথে তাঁদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সরকার রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে কাজ করে যাচ্ছে। বিপুল সম্ভাবনাময় মৎস্যখাত এ লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মৎস্যখাতের সার্বিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সবাই আরো নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন- এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১৪ শ্রাবণ ১৪২২
২৯ জুলাই ২০১৫

বাণী

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এ দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্যখাত অসামান্য অবদান রাখছে।

দেশের মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে দেশের পুকুর-দিঘির হেক্টর প্রতি বার্ষিক গড় উৎপাদন ৪.১ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় থেকে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বে ৪র্থ এবং অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে ৫ম স্থান অধিকার করেছে। অভ্যন্তরীণ জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য জলাশয়সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী-জেলেদের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দেশে বর্তমানে ৫৫০টি মৎস্য অভয়াশ্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে উক্ত প্রজাতিসমূহের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হচ্ছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইলিশকে আমরা সহজলভ্য করতে পেরেছি, আমরা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে নিরাপদ আমিষের যোগান দিতে পারছি পাঙ্গাস-তেলাপিয়ার মাধ্যমে। মাছ ও চিংড়ির মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে। ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্রে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের এক নব দিগন্তের সূচনা হয়েছে।

একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তিনির্ভর, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য মৎস্য-সেক্টর-সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ বিশেষ করে মৎস্য অধিদপ্তর তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশের মৎস্যসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫** উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য 'সাগর নদী সকল জলে, মাছ চাষে সোনা ফলে' কে সামনে রেখে দেশের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নে আমরা সবাই একযোগে কাজ করে যাব।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫ এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এম.পি

প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১৪ শ্রাবণ ১৪২২
২৯ জুলাই ২০১৫

বাণী

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আরও মজবুত ও স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও ২৮ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত 'সাগর নদী সকল জলে, মাছ চাষে সোনা ফলে' কে প্রতিপাদ্য করে দেশব্যাপী **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫** উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

জনগণের প্রাণিজ আমিষজাতীয় খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সারাদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ মৎস্যচাষি সৃষ্টি করার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে মৎস্য সেক্টর কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্যখাতে আইসিটি'র ব্যবহার সম্প্রসারণ, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সার্ভেল্যান্স সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর বর্তমান সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা 'ভিশন-২০২১, বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী'-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

মৎস্য সেক্টর সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ৮ শতাংশ নারী। বর্তমানে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই নারী। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নে মৎস্য সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমান সরকারের আমলে দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে। সমুদ্র বিজয়ের এ সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আমাদের সম্ভাবনাময় সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই আহরণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

সম্ভাবনাময় মৎস্যখাতের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫ এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এম.পি

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১৪ শ্রাবণ ১৪২২
২৯ জুলাই ২০১৫

বাণী

আবহমানকাল থেকেই মাছ আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে জড়িয়ে আছে। আমাদের রয়েছে বিশাল অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলরাশি যা প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের মানুষের মাছের যোগান দিয়ে আসছে। তথাপি বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান কৃষির মত সর্বজনস্বীকৃত নয়। বিশাল জনগোষ্ঠীর আমিষের যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমানে মৎস্য সেক্টর সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। একথা আজ আর কারো অজানা নয় যে, কৃষি প্রধান বাংলাদেশের বিশাল অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলসম্পদে রয়েছে মৎস্য উৎপাদনের অপার সম্ভাবনা। বিশাল এ জলজসম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন তথা দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা সম্ভব।

এ প্রেক্ষাপটে দেশের সাধারণ মানুষকে মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে আরো সচেতন করা এবং এ সম্পদকে সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫' উদ্‌যাপিত হচ্ছে। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের মূল উদ্দেশ্য মৎস্যসম্পদের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ভিতকে আরও মজবুত ও স্বনির্ভর করা এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণে দেশবাসীকে অধিকতর সচেতন, নিবিড়ভাবে সম্পৃক্তকরণ ও আগ্রহী করে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা ও পেশাজীবীসহ সকল মহলে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দেশব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

'সাগর নদী সকল জলে
মাছ চাষে সোনা ফলে'

এবারের **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫** এর উপরোক্ত শ্লোগানটি নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ মৎস্য সপ্তাহের উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

শেলীনা আফরোজা পিএইচডি

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ শ্রাবণ ১৪২২
২৯ জুলাই ২০১৫

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। বর্তমান সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রমের জন্য ২০১৩-১৪ সালে দেশে মোট ৩৫.৪৮ লক্ষ মে.টন মৎস্য উৎপাদন হয়েছে, যার চলতি মূল্যমান ৫৩ হাজার কোটি টাকার অধিক। বিগত পাঁচ বছরে মৎস্যখাতে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৫.৬১ শতাংশ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুযায়ী জাতীয় জিডিপিতে মৎস্যখাতের অবদান ৩.৬৯ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপিতে মৎস্যখাতের অবদান প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২২.৬০ শতাংশ)। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়েও মৎস্যখাত রাখছে উল্লেখযোগ্য অবদান। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ, যা প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে একটি নিরাপদ ও সহজলভ্য উৎস হিসেবেই আজ স্বীকৃত। দেশের জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক তথা প্রায় ১৭৮ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। বিগত পাঁচ বছরে এ খাতে বার্ষিক অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৬ লক্ষাধিক লোকের।

দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরও মজবুত ও স্বনির্ভর করার পাশাপাশি প্রতিটি মানুষের জন্য পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশবাসীকে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অধিকতর সচেতন ও সম্পৃক্ত করার নিমিত্ত অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও ২৮ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট দেশব্যাপী **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫** উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। অপার সম্ভাবনাময় সমুদ্রসহ অভ্যন্তরীণ সকল জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে এ বছরের শ্লোগান নির্বাচন করা হয়েছে **সাগর নদী সকল জলে মাছ চাষে সোনা ফলে**।

অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি বিগত তিন দশকের ক্রমধারায় এবারও **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫** উপলক্ষে মৎস্য বিষয়ক সংকলন প্রকাশ করা হচ্ছে। মূল্যবান ও সহজপাঠ্য এ সংকলনটি যাদের রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে আমরা তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। স্থানাভাবে কিছু লেখা ছাপানো সম্ভব হয়নি, এজন্য আমরা দুঃখিত। একই কারণে কিছু লেখা সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। সংকলনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, তাই তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সংকলনটি প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রকাশনার সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ যে নিরলস শ্রম দিয়েছেন, এজন্য আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দেশের মৎস্যসম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়নে দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করবো- **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫** উদ্‌যাপনের সন্ধিক্ষণে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

সৈয়দ আরিফ আজাদ

সূচিপত্র

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাত ১৩
সৈয়দ আরিফ আজাদ

প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভূমিকা : সাম্প্রতিক অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ২৪
মোহাম্মদ জাহের

মাছ চাষ ও মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনায় জেনেটিক্স কলা-কৌশল : মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ-ভাবনা ২৯
ড. মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ্

বাণিজ্যিক চিংড়ি ট্রলারের ক্যাচ লগ ব্যবহার করে চিংড়ি মাছের মজুদ নিরূপণ ৩৩
নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন ও সুমন বড়ুয়া

ইলিশ উৎপাদনে নদীর পরিবেশ, জাটকা সংরক্ষণ ও অভয়াশ্রমের প্রভাব ৩৭
ড. মোঃ আনিছুর রহমান ও মোহাম্মদ জাহের

ডিজিটাল বাংলাদেশ : প্রেক্ষিত সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ৪১
এবি এম আনোয়ারুল ইসলাম, মোঃ শফিকুল ইসলাম ও মোহাঃ আতিয়ার রহমান

সামুদ্রিক মাছের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের ওপর ভোক্তার চাপ হ্রাস এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ৪৩
মোঃ কদর আহমদ

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কৌশল ৪৮
মোঃ আবুল হাশেম ও মোঃ তৌহিদুর রহমান

মাছের আহরণ-পরবর্তী ক্ষতি কমানোর জন্য সঠিক পরিচর্যা ৫২
প্রফেসর ড. এ কে এম নওশাদ আলম

আধানিবিড় পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ ৫৪
প্রফুল্ল কুমার সরকার

রাজশাহী অঞ্চলে বাণিজ্যিক রুইজাতীয় মাছ চাষের নতুন ধারা : নিরাপদ মাছ সরবরাহের সম্ভাবনা ৫৮
মোহাঃ গোলাম রাব্বানী, মোঃ বায়েজিদ আলম ও ড. আলী মুহম্মদ ওমর ফারুক

উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনা ৬১
মোঃ মিজানুর রহমান ও মোঃ মনজুরুল ইসলাম

ঢাকা বিভাগের সংযোগ মৎস্যচাষি কার্যক্রম : একটি সফল মৎস্য সম্প্রসারণ উদ্যোগ ৬৪
ফরিদা বেগম ও এস এম রেজাউল করিম

হাওর ও উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন এবং এদের সংরক্ষণ ৬৭
ড. সৈয়দ আলী আজহার

চলনবিল - অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ৭১
মোঃ রেজাউল ইসলাম, মোঃ আব্দুদ দাইয়ান ও মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী

মৎস্য প্রজাতির প্রাচুর্যের ওপর নদীর গতিপথ পরিবর্তনের প্রভাব ৭৩
মোহাঃ ওবাইদুল্লাহ ও সরদার মহীউদ্দিন

বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা এবং অধিক মৎস্য উৎপাদনে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন ৭৬
ড. এ কে এম আমিনুল হক

মাছ ও চিংড়ি চাষে প্রোবায়োটিক ব্যবহার : সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত ৭৯
ড. খন্দকার আনিছুল হক, জয়ন্ত বীর ও মোঃ আবুল কালাম আজাদ

ইএমএস : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চিংড়ি সম্পদের সাম্প্রতিক বিপর্যয় ৮২
অমিতোষ সেন

উপকূলে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রাপ্যতা ও মুক্তা চাষের সম্ভাবনা ৮৪
ড. মোঃ ইনামুল হক, মোঃ আতাউর রহমান ও মোঃ হারুনর রশিদ

ভাসমান খাঁচায় সুস্বাদু গুলশা মাছের চাষ ৮৬
ড. এএইচএম কোহিনুর, মোঃ মশিউর রহমান ও ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

মৎস্য সেক্টরের দ্রুত বিকাশ : মৎস্যচাষ প্রকৌশলের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও কর্মপরিধি ৮৮
মোঃ আলীমুজ্জামান চৌধুরী

গলদা চিংড়ির আগাম ব্রুড উৎপাদনে গ্রীন হাউজ প্রযুক্তি ৯১
ড. এস. বি. সাহা

বাংলাদেশের কাঁকড়া ও এর উন্নয়ন সম্ভাবনা ৯৩
ড. বিনয় কুমার চক্রবর্ত্তী

মৎস্য সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন সম্ভাবনা ৯৭
ড. মোহাঃ সাইনার আলম ও শবনম মোস্তারী

ইউএসএআইডি - অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্পের পোনা উৎপাদন কার্যক্রম ও অর্জিত ফলাফল ১০২
মোঃ শহিদুল ইসলাম, মোঃ রফিকুল ইসলাম খান ও Hendrik Jan Keus

বিএফএফই পরিচালিত 'চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্প' : বাগদা চিংড়ি উৎপাদনে একটি সাফল্য ১০৫
এস এম মোরশেদ জাফর

মৎস্য প্রজাতি শনাক্তকরণে ডিএনএ বারকোডিং প্রদ্ধতির প্রয়োগ ১০৭
ওয়াহিদা হক, পূজা বৈদ্য ও শংকর চন্দ্র মন্ডল

ইউএসএআইডি-অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্প ঃ মৎস্যচাষে স্থানীয় সেবাদানকারীদের ভূমিকা ১০৯
মোঃ মাহবুবুল ইসলাম, Hendrik Jan Keus ও মোঃ জাকির হোসেন

ওয়ান মাদার ওয়ান ট্যাংক : WSS ভাইরাসমুক্ত পিএল উৎপাদনের একটি আদর্শ পদ্ধতি ১১২
সৈয়দ এম ইসতিয়াক, Aung Kyaw Mra ও মোঃ মাহফুজ ইকবাল

ইলিশ ও জেলে ১১৫
মোঃ এমরুল হোসাইন

ইকোফিস-বিডি প্রকল্প : পদ্মা-মেঘনা অববাহিকায় ইলিশসহ অন্যান্য মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন ও মৎস্যজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সরকারি-বেসরকারি-দাতাদের যৌথ প্রয়াস ১১৬
ড. এম জলিলুর রহমান, ড. এম এ ওহাব ও ড. ক্রেইগ এ মেইসনার

মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি, প্রভাব ও অভিযোজন ১১৯
ড. আলী মুহম্মদ ওমর ফারুক, মোঃ হুমায়ুন কবির ও ড. মোহাঃ সাইনার আলম

প্রাকৃতিক জলজসম্পদ ও জীববৈচিত্র্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ক্রেল প্রকল্প ১২৩
ড. মোঃ শরীফ উদ্দীন, ড. বিনয় কুমার বর্ম্মন ও ড. মোঃ আবদুল কাইয়োম

বঙ্গোপসাগরের কোমলাস্থি মৎস্যসম্পদ ও এর সংরক্ষণ ১২৫
প্রফেসর ড. এম নিয়ামুল নাসের

হালদা নদীর অনন্য বৈচিত্র্য ও বর্তমান অবস্থা ১২৭
শেখ মুস্তাফিজুর রহমান ও প্রভাতী দেব

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ ১২৯

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর ১৩৫

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাত

Fisheries Sector in Socio-economic Development of Bangladesh

সৈয়দ আরিফ আজাদ

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মৎস্যখাতের অবদান আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণ ও বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে (এফএও, ২০১৪)। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভাবনাময় খাতের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। দেশের মোট জিডিপি'র ৩.৬৯ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২২.৬০ শতাংশ) মৎস্যখাতের অবদান (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪)। দেশের রপ্তানি আয়ের ২ শতাংশের অধিক আসে মৎস্যখাত হতে। এ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহে মৎস্যখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের খাদ্যে প্রাপ্ত প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে।

মৎস্যখাতে অর্জিত সাফল্য ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

১. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান: সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা এবং চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক কারিগরি পরিষেবা প্রদানের ফলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৩৫.৪৮ লক্ষ মে.টন। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ২৭.০১ লক্ষ মে.টন। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনের ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৭.০৩ লক্ষ মে.টন অর্জিত হবে বলে প্রাথমিক তথ্যে প্রতীয়মান হয়।

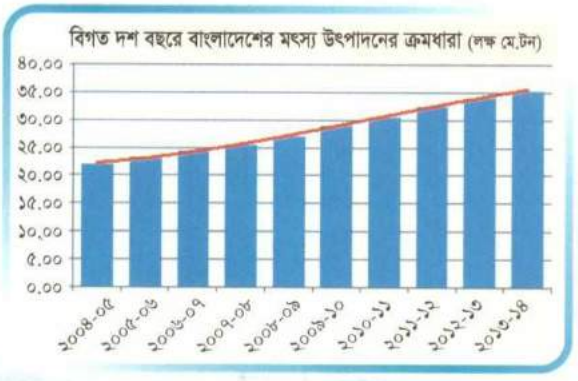

বিগত ১০ বছরের দেশের মৎস্য উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ খাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি উৎসাহব্যঞ্জক (গড় প্রবৃদ্ধি ৫.৩৮ শতাংশ) এবং বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হারে স্থিতিশীলতা বিরাজমান (মৎস্যসম্পদ জরিপ পদ্ধতি, ২০১৪)। প্রবৃদ্ধির এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২০-২১ সালের মধ্যে দেশে মৎস্য উৎপাদন ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টন অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়। ফলে ২০২০-২১ সালে দেশের বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রক্ষেপিত মৎস্য চাহিদা ৪৫.২৮ লক্ষ মে.টন পূরণ করা সম্ভব হবে।

দেশের ১৪ লক্ষের বেশি নারীসহ প্রায় ১ কোটি ৭৮ লক্ষ লোক মৎস্যখাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে তাঁদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে, যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশের অধিক। মৎস্যখাতে সংশ্লিষ্ট এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ১০ শতাংশ নারী, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক শতাংশ। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, বর্তমানে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকের ৮০ শতাংশের অধিক নারী। দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিগত ৫ বছরে এ সেক্টরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বার্ষিক অতিরিক্ত ৬ লক্ষাধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের (নদী, বিল ও প্লাবনভূমি, কাপ্তাই লেক, সুন্দরবন) পরিমাণ প্রায় ৩৯ লক্ষ ১০ হাজার হেক্টর, বদ্ধ জলাশয়ের (পুকুর, মৌসুমী চাষকৃত জলাশয়, বাঁওড় ও চিংড়ি ঘের) পরিমাণ ৭ লক্ষ ৮৯ হাজার হেক্টর, সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিমি এবং সমুদ্র উপকূল রয়েছে ৭১০ কিমি। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে দেশে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মে.টন।

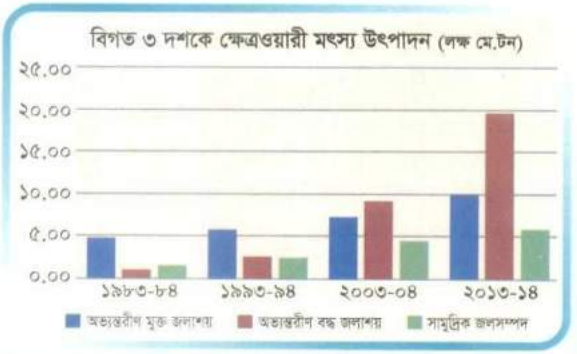

বিগত তিন দশকের ব্যবধানে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৫.৪৮ লক্ষ মে.টনে। এ সময়ে উপখাতওয়ারী উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ সালে উন্মুক্ত জলাশয়ের অবদান ৬৩ শতাংশ হলেও ২০১৩-১৪ সালে এ ক্ষেত্রের অংশ দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৮ শতাংশে। অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয়ের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে সাড়ে ৩ গুণ। মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও মূলত বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করা

সম্ভব হয়নি। দেশের স্বাদু পানির মৎস্য উৎপাদনে সাফল্যের পাশাপাশি বর্তমান সরকারের বিশাল সমুদ্র বিজয়ের প্রেক্ষিতে Blue Economy-এর অপরিমেয় সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

২. বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ নিবিড়করণ: মৎস্য অধিদপ্তরের লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর ও চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যেই রুইজাতীয় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙ্গাস, কৈ, শিং, মাগুর ও তেলাপিয়া মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে চাষি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে দেশের ৩.৭১ লক্ষ হেক্টর পুকুর-দিঘিতে বার্ষিক হেক্টর প্রতি গড় মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৪.১ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সব পুকুর-দিঘি লাগসই মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে ২০২০-২১ সালের মধ্যে হেক্টর প্রতি মৎস্য উৎপাদন ৫.০ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব।

বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ১০টি প্রজাতির অবদান নিচের সারণিতে দেয়া হলো:

ক্রমিক	প্রজাতি	মোট উৎপাদন (মে.টন)	অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে অবদান (%)
০১.	পাঙ্গাস	৩৭১০৬৮	১২.৫৭
০২.	রুই	৩০৩৯৫০	১০.২৯
০৩.	তেলাপিয়া	২৯৮০৬২	১০.০৯
০৪.	সিলভার কার্প	২১৮৯৮২	৭.৪২
০৫.	কাতলা	২১৭৯৩৩	৭.৩৮
০৬.	মৃগেল	২০৬৮১২	৭.০০
০৭.	ইলিশ*	১২৭৫১৪	৪.৩২
০৮.	চিংড়ি	১২৪৮৫৬	৪.২৩
০৯.	কমন কার্প	১০০৬৭৪	৩.৪১
১০.	বোয়াল/আইর	৮১৫৩৬	২.৭৬

*সামুদ্রিক উৎসের ইলিশ উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত নেই।

উত্তরাঞ্চলের অপার সম্ভাবনাময় খাস জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার আপামর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থসামাজিক

অবস্থার উন্নয়নের নিমিত্ত সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ ও তাড়াশ এবং পাবনা জেলার চাটমোহর ও ভাঙ্গুড়া উপজেলার প্রায় ৬৭৪.৭৬ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট ৭৮৩টি সরকারি পুকুর-দিঘি নিয়ে নিমগাছী সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ প্রকল্প চলমান রয়েছে। মোট ৩,৩৬৪.৪৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পে জলাশয়ের প্রয়োজনীয় খনন ও পুনঃখনন, হ্যাচারি ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহের নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় মেরামত, সুফলভোগী নির্বাচন, দল গঠন, সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান, উন্নয়নকৃত জলাশয়ে পোনামজুদ ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন, উন্নত ব্রুডমাছ পালন, মাছ ও পোনা উৎপাদন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের নিমিত্ত উল্লিখিত ৪টি উপজেলার ৯২৬৩ জন সুফলভোগীকে নিয়ে ৫৪৬টি সুফলভোগী দল গঠন করে মৎস্য সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ৫,৪৮৮ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট প্রায় ৬০০টি বাঁওড় রয়েছে। বাঁওড়গুলোতে কাঙ্ক্ষিত হারে মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য সরকার ঝিনাইদহ ও যশোর জেলার ৬টি বাঁওড় মৎস্য অধিদপ্তরে হস্তান্তর করেছে। এ সব বাঁওড়ে ৯৩৫ জন সুফলভোগী সমন্বয়ে ৬৭টি দল গঠনের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এসব বাঁওড় থেকে মোট ৫৬৬ মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে বলে প্রাথমিক তথ্যে জানা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) -এর আওতায় পার্বত্য এলাকার ৮০৪টি ক্রিক উন্নয়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে ৫০৭টি ক্রিকের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ১২৮টি ক্রিকের উন্নয়ন কাজ চলমান। উন্নয়নকৃত এসব ক্রিকের জলায়তন ৪৮৭.৫২ হেক্টর। প্রতি হেক্টরে গড়ে ২ মে.টন করে মাছ উৎপাদন করা গেলে উন্নয়নকৃত ক্রিক থেকে

প্রায় ৯৭৫ মে.টন মাছ উৎপাদন সম্ভব হবে, যা পার্বত্য জনগণের মাছের চাহিদা পূরণের সাথে সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উন্নয়নকৃত এ সব ক্রিকের পানি মাছ চাষ ছাড়াও সেচ, গৃহস্থালী এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাবার পানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে উন্নয়নকৃত ৪৮৪টি ক্রিকের ৩৬৩০ জন সুফলভোগীকে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যায়, ৮০৪টি ক্রিকের উন্নয়ন সম্ভব হলে পার্বত্য এলাকায় প্রায় ২০০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

৩. পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ: চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি মৎস্যপণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি খামারে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, ঘেরের গভীরতা

বৃদ্ধি ও পিএল নার্সিংয়ের মাধ্যমে ঘেরে জুভেনাইল মজুদের বিষয়ে চাষি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। ট্রেসিবিলিটি নিশ্চিত করার জন্য ইতোমধ্যে ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়ি ঘের রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। চাষি পর্যায়ে রোগমুক্ত ও গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি পোনার সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১০টি জীবাণু শনাক্তকরণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও ওয়ার্ল্ডফিস-এর যৌথ উদ্যোগে পিসিআর প্রটোকল তৈরির পাশাপাশি পিসিআর পরীক্ষিত পোনা মজুদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এলক্ষ্যে কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও খুলনায় ৩টি পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার জেলার কলাতলীতে আরো একটি পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা বর্তমানে কার্যক্রম শুরুর অপেক্ষায় রয়েছে।

চিংড়ি চাষে ক্লাস্টার ফার্মিং

চাষি পর্যায়ে ভাইরাসমুক্ত পিএল সরবরাহ এবং রোগবালাই নিয়ন্ত্রিত ও দূষণমুক্ত পরিবেশে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর ও এফএও -এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত কারিগরি সহায়তা প্রকল্প STDF (Standard and Trade Development Facility) -এর মাধ্যমে ক্লাস্টারভিত্তিক খামার পরিচালনা (cluster farming) ও সংযোগ চাষ (contract farming) কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যেই ১০০০ চাষি সমন্বয়ে ৪০টি ক্লাস্টার সংগঠিত করা হয়েছে।

ক্লাস্টারভিত্তিক চাষ ও নিম্নোক্ত লাগসই প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে-

- ঘেরে পানির গভীরতা ন্যূনতম ১ মিটার বজায় রাখা;
- পিসিআর পরীক্ষিত নিরোগ পিএল লালন করা;
- ন্যূনতম ১৪ দিন পিএল নার্সিং করে ঘেরে জুভেনাইল মজুদ করা।

প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, সংগঠিত চাষিরা উপরোক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে এক বছরে প্রায় ৭০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। উৎপাদিত চিংড়ির অধিকমূল্য প্রাপ্তির জন্য বাজারজাতকরণের দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশে ২০১৪ সালে প্রথমবারের মত আমেরিকার হাওয়াই থেকে এসপিএফ বা রোগমুক্ত বাগদা চিংড়ি আমদানির মাধ্যমে পিএল উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ২০ লক্ষ এসপিএফ বাগদা চিংড়ি পিএল-১৫ উৎপাদন করে চাষির খামারে বিতরণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় অধিদপ্তরাধীন ১০টি পুরাতন গলদা হ্যাচারি সংস্কার ও আধুনিকায়ন এবং ৯টি নতুন গলদা হ্যাচারি নির্মাণ করে পিএল উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে বাগদা চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের কারিগরি সহযোগিতায় বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন ২০১৪ সালে কক্সবাজার জেলায় সীমিত পরিসরে আধানিবিড় পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ শুরু করে। কার্যক্রম শুরুর প্রথম বছরেই এ খামার থেকে হেক্টর প্রতি ৭.২ মে.টন বাগদা চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব হয়। জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪ অনুমোদিত হয়েছে। এ নীতিমালার আওতায় পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, চাষি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে চিংড়ি খামার থেকে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি একটি স্থায়িত্বশীল চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন সম্ভব হবে। নানাবিধ অপপ্রচার ও নেতিবাচক কার্যক্রমকে মোকাবেলা করে ক্রমবর্ধনশীল চিংড়ি শিল্পকে স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি-বেসরকারি সকল সুফলভোগীদের নিয়ে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

৪. জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন: বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত মাছের এক-দশমাংশের অধিক আসে শুধু ইলিশ থেকে। কাজেই একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। সর্বোপরি উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা নির্বাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় প্রশাসন, কোস্টগার্ড, পুলিশ ও নৌবাহিনীর সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা

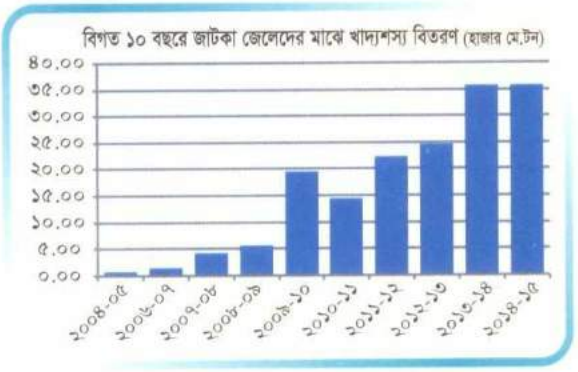

পালন করে আসছে। ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল হচ্ছে জাটকা সংরক্ষণ ও মা ইলিশ রক্ষা। মা ইলিশ রক্ষার পাশাপাশি প্রধান প্রজনন মৌসুমে সুরক্ষা নিশ্চিত করা গেলে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অধিকতর ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব। এ লক্ষ্যে প্রতি বছর আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার দিনসহ আগের তিন দিন ও পরের এগারো দিন মিলে মোট ১৫ দিন উপকূলীয় এলাকাসহ দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ করে বিধির সংশোধনী সম্বলিত প্রাক প্রকাশনা ২৫ জুন ২০১৫ তারিখের গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। দি প্রটেকশন এন্ড কনজার্ভেশন অব ফিস রুলস, ১৯৮৫ সংশোধন করে ৪টির স্থলে ৫টি এলাকায় ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। আরো একটি অভয়াশ্রম স্থাপনের বিষয় বিবেচনাধীন রয়েছে। কারেন্ট জালের উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাটকাসমৃদ্ধ ১৫ জেলার ৮০টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত ২,২৪,১০২টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মোট ৩৫,৮৫৬ মে.টন চাল প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বিগত ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জেলেদের সহায়তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬,৯০৬ মে. টন। সেখানে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত এ সরকারের বিগত ৭ বছরে এ সহায়তা দেয়া হয়েছে ১,৫৮,৭৮১.১২ মে. টন। তাছাড়া বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রমের আওতায় একই সময়ে সর্বমোট ৩২,৫০৯ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল পালন, ভ্যান/ রিক্সা চালানো, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। দরিদ্র জেলেদের সঞ্চয়ী ও স্বয়ম্ভর করে তোলা এবং আপদকালীন জীবন-জীবিকা পরিচালনা ও বিকল্প কর্মসংস্থানের তহবিল গঠনের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর ও ওয়ার্ল্ডফিস-এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন USAID সহায়তাপুষ্ট Enhanced Coastal Fisheries (ECOFISH) প্রকল্পের মাধ্যমে সঞ্চয়ের বিপরীতে সরকারি অনুদানভিত্তিক ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ইলিশ উৎপাদিত হয়েছে ৩.৮৫ লক্ষ মে.টন, যার বর্তমান বাজার মূল্য ১৭ হাজার কোটি টাকার বেশি।

৫. পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম ও বিল নার্সারি স্থাপন: জলাশয় ভরাট, দূষণ, মাছের অতি আহরণ, প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা সংগ্রহ, বিদেশি প্রজাতির মাছ অন্তর্ভুক্তি, কৃষি জমিতে নির্বিচারে কীটনাশকের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে মুক্ত জলাশয়ের

ক্রমহ্রাসমান মাছের প্রাচুর্যসমৃদ্ধকরণ ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি ও বিল নার্সারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত ছয় বছরে মোট পোনামাছ অবমুক্তির পরিমাণ প্রায় ৪ হাজার মে.টন। পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৪১ হাজার মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় দেশব্যাপী প্রায় ৯৪১ মে.টন গুণগত

মানসম্পন্ন ও বিপন্নপ্রায় প্রজাতির পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে বার্ষিক প্রায় সাত হাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে এবং ইতোমধ্যেই অনেক বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। তাছাড়া বিগত ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত ৬ বছরে রাজস্ব বাজেটে মোট ৮৫৩টি বিল নার্সারি স্থাপিত হয়েছে। দেশব্যাপী বিল নার্সারি কার্যক্রম আরো স্থায়ীত্বশীল করার লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন ও পোনা অবমুক্তকরণ শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর ফলে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় দেশব্যাপী বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে ৭৮০টি। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, এ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে অতিরিক্ত মোট ১০ হাজার মে.টন এবং বার্ষিক প্রায় ২ হাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে এবং জলমহালের ওপর নির্ভরশীল জেলে ও সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন: অভ্যন্তরীণ জলসম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন, জলাশয় সংশ্লিষ্ট জেলে ও মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জলাশয়ের জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জলাশয় সংশ্লিষ্ট জেলে ও সুফলভোগী সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন, বংশবৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য অভয়াশ্রম

স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩৯টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত অভয়াশ্রমসমূহ স্থানীয় সুফলভোগী কর্তৃক সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। মৎস্য অভয়াশ্রমে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার ফলে মাছের বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও নিরাপদ আবাসস্থল সৃষ্টি হচ্ছে।

ফলে সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রাকৃতিক উৎসে ব্রুড মাছ ও পোনা সুরক্ষা পাচ্ছে; একই সাথে বিলুপ্তপ্রায় ও বিপন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট হাওর, বাঁওড়, নদী, খাল ও প্লাবনভূমিতে মাছের উৎপাদন ও প্রাচুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি, যথা- চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংরা, মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের তাৎপর্যপূর্ণ পুনরাবির্ভাব ঘটেছে এবং প্রাপ্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রমে দেশি কৈ, শিং, মাগুর, পাবদা ইত্যাদির পোনা ছাড়ার ফলে এসব মাছের প্রাচুর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে সংশ্লিষ্ট জলাশয়সমূহে মাছের উৎপাদন ১৪০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে।

৭. মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন: প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, বরোপিট, হাওর-বাঁওড় ও নদী-নালায় পলি জমে ভরাট হয়ে

মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবাধ বিচরণের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এসব জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে উন্নয়ন করে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যে পতিত ও অবক্ষয়িত জলাশয়গুলো সংস্কারের মাধ্যমে মাছ চাষের উপযোগী করা হচ্ছে। একই সাথে ভরাট হয়ে যাওয়া মুক্ত জলাশয় পুনঃখনন ও সংস্কারের মাধ্যমে মাছের প্রজনন ও

বিচরণ উপযোগী করা হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বিগত ৬ বছরে ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ২১০০ হেক্টর অবক্ষয়িত জলাশয় পুনঃখনন, সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ২৮০ হেক্টর জলাশয় পুনঃখনন ও সংস্কার করা হয়েছে। এ সব জলাশয় উন্নয়নের ফলে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৩০০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে বলে

প্রাথমিক তথ্যে জানা যায়। খননকৃত জলাশয়ে দরিদ্র সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৮. **প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ:** রুই-কাতলাজাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী, লবণাক্ত ও আধা-লবণাক্ত মাছের অন্যতম চারণক্ষেত্র সুন্দরবন এবং মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ বাঁওড় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তর নিবিড় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। সরকার প্রাকৃতিক পোনার উৎসস্থল হালদা নদী রক্ষায় নানামুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় ২০১০ সালে হালদা নদীর উজানে ফটিকছড়ি অংশের নাজিরহাট ব্রিজ থেকে নদীর ভাটির অংশে হালদা-কর্ণফুলীর সংযোগস্থলসহ কালুরঘাট ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিমি মাছের অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে।

অভয়াশ্রমে সবধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ, নদীর তীরবর্তী স্থানে হ্যাচারি স্থাপন, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন নির্বিঘ্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে হালদা নদী থেকে মোট ৩ হাজার ৪২ কেজি কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধ মানের রেণু সংগ্রহ করা হয়; বার্ষিক গড় উৎপাদন প্রায় ৬০৯ কেজি।

উল্লেখ্য যে, উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ৪ বছরে মোট উৎপাদন ছিল মাত্র ৮৩২ কেজি (গড় উৎপাদন ২০৮ কেজি)।

৯. **মৎস্য আইন বাস্তবায়ন:** মৎস্য খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত পরিবেশ সংরক্ষণ, মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদি উদ্যোগকে সামনে

নিয়ে সরকার ইতোমধ্যেই বেশ কিছু নীতি, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। প্রণীত এসব আইনের আওতায় মৎস্য হ্যাচারি ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানার নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দি প্রটেকশন এন্ড কনজার্ভেশন অব ফিস রুলস, ১৯৮৫ সংশোধন করে ৪টির স্থলে ৫টি এলাকায় ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা এবং ইলিশের ভরা প্রজনন মৌসুমে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকাল সংশোধন করা হয়েছে। তাছাড়া The Protection and Conservation of Fish (Amendment) Act, 2002 -এর মাধ্যমে কারেন্ট জালের সংজ্ঞা এবং এর উৎপাদন, মজুদ, বিক্রয়, ব্যবহার, পরিবহন ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মহামান্য আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত রায়/আদেশ মোতাবেক বর্তমানে কারেন্ট জালের উৎপাদন, বিক্রয়, ব্যবহার ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সে প্রেক্ষিতে বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে উক্ত আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কারেন্ট জাল উৎপাদন,

বিক্রয়, ব্যবহার ইত্যাদি বন্ধের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ রক্ষার্থে সরকার এসআরও নং-৯৭-আইন/২০১৫, তারিখ: ১৭ মে ২০১৫ -এর মাধ্যমে Marine Fisheries Ordinance 1983 (Ordinance No. XXXV of 1983) এর section 55 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Marine Fisheries Rules, 1983 এর Rule 18 এর পর নতুন Rule 19 সংযোজন করে। এ নতুন Rule -এর মাধ্যমে সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য সরকার প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এছাড়া সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০১৫ এবং মৎস্য সংগনিরোধ আইন, ২০১৫ অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১০. জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদান: প্রকৃত জেলেদের শনাক্ত করে নিবন্ধিকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন একটি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ পরিচয়পত্র ইলিশ জেলেদের চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে চলমান ভিজিএফ ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করছে। এছাড়াও এ কার্যক্রমের ফলে

প্রকৃত জেলেদের জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সরকারি প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান সহজতর হবে। দেশব্যাপী প্রায় ২০ লক্ষ জেলের মধ্যে ২০১৪-১৫ সালে প্রায় ১৪ লক্ষ জেলের নিবন্ধন, ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার জেলের ডাটাবেইজ প্রস্তুত এবং ৮ লক্ষ ৩০ হাজার জেলের পরিচয়পত্র প্রস্তুত ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যায় আগামী এক বছরের মধ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদানের ইপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস), জলদস্যুর আক্রমণ, বাঘের আক্রমণ বা কুমির ও সাপের কামড়ের কারণে জীবননাশ ঘটলে সংশ্লিষ্ট জেলে পরিবারকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। বিগত ২০১২-১৩ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত ২৪৭টি জেলে পরিবারকে মোট ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

১১. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিমি এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে। ফলে নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিত করে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। উপকূলব্যাপী ৭১০ কিমি দীর্ঘ তটরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের বিশাল সুযোগ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদের ন্যায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৎস্যজীবীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী মোট ৬৭,৬৬৯টি যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান মৎস্য আহরণে নিয়োজিত। প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার মৎস্যজীবী পরিবারের ন্যূনতম ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে উপকূলীয় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মাধ্যমে। মৎস্য আহরণে মোট ২০৫টি ও চিংড়ি আহরণে মোট ৩৭টি ট্রলার, অর্থাৎ সর্বমোট ২৪২টি বাণিজ্যিক ট্রলার বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে মৎস্যসম্পদ আহরণে নিয়োজিত রয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে চলমান বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয় করে সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণের নিমিত্ত পেলাজিক, ডিমারসেল ও ল্যান্ডবেইজড জরিপ পরিচালনা করার লক্ষ্যে 'আর ভি মীন সন্ধানী' নামে একটি গবেষণা ও জরিপ জাহাজের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যা বর্তমানে সরবরাহের অপেক্ষায় আছে।

উক্ত প্রকল্প হতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে

পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত স্যাটেলাইট প্রযুক্তিনির্ভর Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। সে অনুযায়ী সব কার্যক্রম সম্পন্ন করে ১৩৩টি ফিসিং ভেসেলের মধ্যে ইতোমধ্যে ৯৩টি ভেসেলে VTMS ডিভাইস সংযোজন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে কার্যকরভাবে ডিভাইস সংযোজনকৃত ভেসেলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের উপকূলীয় জেলেদের মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী ও মাছ ধরার সরঞ্জামসহ মোট ১১৮টি Fiber Re-enforced Plastic (FRP) নৌকা বিতরণ করা হয়েছে। এসব আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব নৌকার বিভিন্ন সুবিধা বিবেচনা করে পরবর্তীতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় জেলেদের মাঝে আরও অধিক সংখ্যায় নৌকা সরবরাহের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। আইইউইউ (IUU-Illegal, Unreported and Unregulated) ফিসিং-এর ক্ষেত্রেও মৎস্য অধিদপ্তর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে আইইউইউ ক্যাচ সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে সামুদ্রিক মাছ রপ্তানি করা হচ্ছে।

Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ Pilot Country হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যথাযথ সংরক্ষণ ও সহনশীল মাত্রায় আহরণের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বশীল প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান ট্রলার বহরের সকল বটম ট্রলার মিডট্রলারে রূপান্তরসহ নতুন বটম ট্রলার ও সামুদ্রিক চিংড়ি ট্রলার সংযোজন রহিতকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া বাণিজ্যিক ট্রলার কর্তৃক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত জেলেদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস, আহরিত মাছের আহরণোত্তর পরিচর্যা এবং সুষ্ঠু সংরক্ষণ নিশ্চিতকল্পে কাঠ বডি নন-ফ্রিজ ট্রলার নির্মাণ ও আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৪ হতে সব ধরনের ট্রলার প্রতিস্থাপন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের নির্দেশনা অনুযায়ী Long liner প্রকৃতির ফিসিং ট্রলার সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)-এর সদস্য হওয়ার জন্য বাংলাদেশ ইতোমধ্যে Cooperating Non-contracting Party-এর মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে টুনা মাছসহ অন্যান্য পেলাজিক মাছের আহরণ বাড়বে এবং মৎস্য রপ্তানি কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আসবে।

১২. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সরবরাহ: আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবে মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত এ ৩টি মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাক্রিডিটেশন সনদ অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে। এসব পরীক্ষাগারে LC-MSMS মেশিনসহ GC-MS (TOF), ELISA, AAS ও PCR মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকার ল্যাবরেটরিটি একটি অত্যাধুনিক রেফারেন্স ল্যাবরেটরি হিসেবে সাভারে কার্যক্রম শুরু করেছে। চিংড়ি সেক্টরে ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম কার্যকর

করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যেই প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়ি খামার ও ৯,৬২৪টি বাণিজ্যিক ফিন ফিস (প্রধানত পাঙ্গাস, কৈ, তেলাপিয়া ও শিং-মাগুর)-এর খামার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। সম্প্রতি মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ই-ট্রেসেবিলিটি পাইলটিং করা হচ্ছে।

বর্তমানে দেশে চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সব স্তরে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি রেগুলেশন কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন বিষয়ে চাষি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, এনআরসিপি বাস্তবায়ন, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারসমূহের আধুনিকায়ন, এনআরসিপি ডাটাবেইজ তৈরি, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮৩ হাজার ৫২৪ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশ আয় করেছে ৪ হাজার ৬৬০ কোটি টাকা। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০৩-০৪ সালে প্রায় ৫৪ হাজার মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে দেশ ২ হাজার কোটি টাকা আয় করেছে।

বিগত ২০-৩০ এপ্রিল ২০১৫ সময়কালে EU-FVO Audit Team ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানির ক্ষেত্রে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের Official Control System এবং Residues & Contaminants Control System-এর ওপর অডিট পরিচালনা করে। এ সময় অডিট টিম ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা ও গাজীপুর জেলায় মৎস্য পরিদর্শন ও

মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, মৎস্য প্রক্রিজাতকরণ কারখানা, মৎস্য আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত জাহাজ, মৎস্য ও চিংড়ি খামার, সাপ্লাই চেইন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থাপনা (যথা- ডিপো, আড়ত, বরফকল ইত্যাদি) এবং ফিস ফিড মিল, পশু চিকিৎসার ঔষধ বিক্রয়কারী দোকান পরিদর্শন করে। অডিট টিম প্রদত্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশে Official Control System বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে, যা মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবেই প্রতীয়মান হয়।

অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সংরক্ষণ এবং বিপণনের বিষয়েও সরকার বিশেষভাবে সচেষ্ট রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর দেশের আপামর জনসাধারণের নিরাপদ মাছ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য বাজার ও আড়তগুলোতে সচেতনতা সভা করার পাশাপাশি আইন প্রয়োগ এবং মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী ও মৎস্য আড়ত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান

করেছে। ইতোমধ্যে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ৮০টি ফরমালিন ডিটেকটিং ডিজিটাল কিট বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতি জেলায় একটি করে ফরমালিনমুক্ত বাজার ঘোষণার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

১৩. জলবায়ু পরিবর্তন ও মৎস্যসম্পদ: প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে জলবায়ু দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। স্থিতিশীল মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন ব্যবস্থায় জলবায়ু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মৎস্যখাত বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির মুখে রয়েছে। জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পানি শুকিয়ে গিয়ে মাছের আবাসস্থল কমে যাচ্ছে, সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ছে মাছের বংশবিস্তার। নদী ও সাগরের মাছের ওপর নির্ভরশীল জেলেদের বেশিরভাগ ভূমিহীন ও হতদরিদ্র এবং নদী ও সাগরের অতি নিকটে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বাস করার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণসহ ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে; এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে মৎস্য প্রজনন ও উৎপাদনে, বিশেষ করে দেশীয় প্রজাতির ক্ষেত্রে। এমতাবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মৎস্য সেক্টরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মৎস্যসম্পদের সহনশীল প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার লক্ষ্যে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে।

১৪. মানব সম্পদ উন্নয়ন: মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সব উন্নয়ন কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত

হচ্ছে। বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার সুফলভোগীকে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারের রূপকল্প, ২০২১-এর অর্জিতব্য লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরে বিদ্যমান মোট ৪,৮৪৬টি রাজস্বখাতের পদের সাথে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত অতিরিক্ত আরও ২,৪৫৭টি পদের মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় ৬৩৭টি প্রথম শ্রেণির ক্যাডার কর্মকর্তা ও ২৮৯টি নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সর্বমোট ৯২৬টি পদের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেছে। সৃজিত পদসমূহ মৎস্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত হওয়ায় মোট পদসংখ্যা বর্তমানে ৫৭৮৬-তে উন্নীত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির ক্যাডার পদ ১,২৭৮, নন-ক্যাডার পদ ৩১৭, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদ যথাক্রমে ৬৪৯, ২,০৬৯ ও ১,৪৭৩টি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক

অনুমোদিত অবশিষ্ট ১,৫৩১টি পদ এবং অতিরিক্ত আরও ৬০০ ক্ষেত্র সহকারীর পদ সৃজনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অতি সম্প্রতি ১৯২ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়েছেন। সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রাপ্ত হয়েছেন যথাক্রমে ২৪ ও ৩ জন কর্মকর্তা। এছাড়া ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১৪ জন কর্মচারীকে টাইমস্কেল ও ৩৬ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যায় এর ফলে মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম আরও বেগবান হবে।

মধ্যম পর্যায়ে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় চাঁদপুরস্থ মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ ইনস্টিটিউট থেকে দু'ব্যাচে ৪৫ জন মৎস্য বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ক্রমবর্ধিষ্ণু মৎস্য খাতের মধ্য পর্যায়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের ব্যাপক চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় এনে গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় আরও ৩টি

মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী চারটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট-এ প্রতি বছর ৪০ জন করে মোট ১৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা সম্ভব হবে। ক্রমবর্ধনশীল মৎস্য সেক্টরের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, খুলনা, কুষ্টিয়া, বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর ও কুমিল্লা জেলায় আরও ৯টি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

১৫. তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রদান: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মহাসড়কে গ্রামীণ মৎস্যচাষি, জেলে ও মৎস্যজীবীদের সম্পৃক্তকরণ বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এলক্ষ্যে দেশব্যাপী জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের নিমিত্ত ডাটাবেইজ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.fisheries.gov.bd) একটি ডাইনামিক ও রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট। এতে মৎস্য বিষয়ক সব আইন, বিধি, নীতি-নির্দেশিকা এবং সব ধরনের প্রকাশনা নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে যে কেউ এ ওয়েবসাইট থেকে মৎস্যচাষ, মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি-তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারে। অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ, ক্রয়-টেন্ডার, বদলী, পদোন্নতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সদর দপ্তরসহ সারা দেশের কর্মকর্তাগণকে দাপ্তরিক ওয়েব মেইলের আওতায় আনা হয়েছে। কার্যকর ও অতিদ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করতে দপ্তর ও পদবিন্যাস অনুযায়ী গ্রুপ মেইল প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তর LAN এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে ফলে সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সার্ভারে সংরক্ষণ ও পারস্পরিক আদান প্রদান করতে পারে। স্বল্প পরিসরে কার পার্কিং-এর

বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ইতোমধ্যেই আধুনিক প্রযুক্তির বহুতল বিশিষ্ট ডিজিটাল কার পার্কিং স্থাপন করা হয়েছে। মৎস্য ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে পুরো মৎস্য ভবনকে সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

১৬. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি: মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১,৪৭৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও সদয় নির্দেশনায় দেশে কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষ জনপ্রিয় করে তোলা, কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষ বিষয়ক নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে দক্ষতা উন্নয়ন এবং উৎপাদিত কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার ও মাঠ পর্যায়ে কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষের প্রদর্শনী খামার স্থাপন, সচেতনতা সভা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর এবং কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে মৎস্য বিষয়ক সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহের সকল বা বেশির ভাগ গ্রামীণ চাষযোগ্য পুকুর বা জলাশয় মাছ চাষের আওতায় আনা ও উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের

মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পুকুর, ঘের ও খাঁচায় মাছ চাষের প্রদর্শনী স্থাপন, মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সংস্কার, প্রশিক্ষণ প্রদান,

ইউনিয়ন পর্যন্ত মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত ৩,০০০ ইউনিয়নে একজন করে লিফ (LEAF) এবং প্রতি ৬টি ইউনিয়নের জন্য একজন করে ক্ষেত্র সহকারী নিয়োগ করা হবে।

বিগত ৭ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে আর্থিক বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিচের সারণিতে দেয়া হলো:

অর্থবছর	প্রকল্প (সংখ্যা)	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)
২০০৮ -০৯	১৮	৭৯.০৫	৭৪
২০০৯ -১০	২২	১১৩.৩৯	৮৮
২০১০ -১১	২৩	১৩৫.৪৭	৯৫
২০১১ -১২	২৮	১৯৪.১০	১০০
২০১২ -১৩	২৭	১৫৩.৩৭	১০০
২০১৩ -১৪	২৬	২১৭.৬১	১০০
২০১৪ -১৫	২১	৩০৯.০৬	১০০

বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- বিল নার্সারি স্থাপন ও পরিচালনা
- প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
- উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন
- ইলিশসম্পদ ব্যবস্থাপনা
- অবক্ষয়িত জলাশয় সংস্কার ও অভয়াশ্রম স্থাপন
- প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ
- মৎস্যসম্পদ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা
- বঙ্গোপসাগরে মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভিলেন্স পদ্ধতি জোরদারকরণ
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ
- মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি।

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
dg@fisheries.gov.bd

এছাড়াও ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য নিম্নবর্ণিত ১৩টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

০১. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, খুলনা, কুষ্টিয়া, বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর ও কুমিল্লা জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প
০২. মৎস্য সম্পদ জরিপ পদ্ধতি হালনাগাদকরণ প্রকল্প
০৩. বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প
০৪. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প
০৫. বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প
০৬. বরেন্দ্র এলাকায় মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প
০৭. জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প
০৮. হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
০৯. উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি ও মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
১০. মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্যায়)
১১. বঙ্গোপসাগরে মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভিলেন্স পদ্ধতি জোরদারকরণ প্রকল্প
১২. কক্সবাজার জেলায় চিংড়ি ও মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
১৩. বাংলাদেশে প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছচাষ প্রকল্প।

উপসংহার

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "প্রতিটি মানুষের পুষ্টিমানসম্মত সুষম খাদ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে"। শুধুমাত্র চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে সুষম পুষ্টি চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হওয়ার কোন বিকল্প নেই। যথাযথ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলজ পরিবেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আগামী ২০২০-২১ সাল নাগাদ দেশের মৎস্য উৎপাদন ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে মৎস্যখাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভূমিকা : সাম্প্রতিক অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

Role of BFRI in Technology Generation : Recent Achievement and Future Plan

মোহাম্মদ জাহের

Abstract

Bangladesh Fisheries Research Institute (BFRI) is the only national organization for conducting research on fisheries development of the country. The institute has so far innovated 49 improved aquaculture and management technologies through demand driven research. Some of the important technologies are: breeding and hatchery management of carp fishes, nursery pond management of carp fishes, polyculture of high yielding fishes, artificial breeding and culture of thai pangas, development of breeding, nursery and culture technique of some important endangered species, fish feed management, fish and shrimp health management, culture of GIFT Tilapia in seasonal pond, pond culture of rajpunti, rice-cum-fish farming, production and culture of magur and sing, development of fry production and culture technique of monosex tilapia, conservation and management of hilsa fishery, freshwater shrimp seed production in the backyard hatchery, improved culture technique of bagda, fattening of mud crab etc. Besides these, institute has also conducted different researches with the objective of developing management policies for formulating different rules and regulations for management of fisheries resources of the country. Most of the developed technologies have been transferred to the farmers and entrepreneurs through Department of Fisheries and NGOs. In Bangladesh, production of fish was about 0.8 million MT during the establishment of the institute. This production has been increased to 3.55 million MT in 2014. This tremendous rate of increase in fish production was made possible due to development and extension of suitable technologies. In the mean time, the institute has achieved remarkable success in induced breeding of several endangered fish species like foli. Through genetic research BFRI, has recently developed some improved brood stocks of rui, rajpunti, koi, tilapia etc. On the other hand, preliminary success has been achieved on the controlled and induced breeding of cuchia and seed production of mud crab.

মৎস্য খাতের উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। গবেষণা কার্যক্রমের দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় এ ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ৪৯টি বিষয়ভিত্তিক উন্নত প্রযুক্তি প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে। ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ প্রধান প্রধান প্রযুক্তিসমূহ হলো- রুইজাতীয় মাছের উন্নত নার্সারি ব্যবস্থাপনা, রুইজাতীয় মাছের মিশ্র চাষ, বিএফআরআই সুপার তেলাপিয়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ, মৎস্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা, মাছ ও চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতির প্রজনন, নার্সারি ও চাষ কৌশল, মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ পদ্ধতি, থাই পাঙ্গাসের প্রজনন ও চাষ, গলদা চিংড়ির গৃহাঙ্গন হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন, বাগদা চিংড়ির উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা, রুই, রাজপুঁটি, কৈ ও তেলাপিয়া মাছের উন্নত জাত উদ্ভাবন, শিং-মাগুর মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ, স্বাদুপানির ঝিনুকে মুক্তা চাষ, ফসল চক্রভিত্তিক বাগদা ও গলদা চিংড়ির চাষ, ইলিশ সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি। গবেষণায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মৎস্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সম্প্রসারণের ফলে ইতোমধ্যে সারাদেশে মৎস্যচাষ ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এমনকি কর্মসংস্থান, গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টি সরবরাহে এসব প্রযুক্তি ব্যাপক অবদান রাখছে। এছাড়া মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্যও ইনস্টিটিউট বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা করছে। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাকালে বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন ছিল ৮.০ লক্ষ মে.টন, যা ২০১৩-১৪ সালে ৩৫.৪৮ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। ইনস্টিটিউট কর্তৃক লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের ফলে এ অভাবনীয় উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচিকে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত করতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত **রূপকল্প ২০২১** এর অর্জনে মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টন নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমান প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ধারা অব্যাহত থাকলে এবং মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ধারাবাহিক বাস্তবায়নে উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

সাম্প্রতিক অর্জন
(Recent Achievement)

১. কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে মাছের জাত উন্নয়ন

দেশে বেসরকারি হ্যাচারিসমূহে ব্রুড মাছের অব্যবস্থাপনা ও অন্তঃপ্রজনন সমস্যার ফলে দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানকল্পে কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট ৪টি মাছের উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে যথা: (১) দেশীয় উন্নত রুই মাছ; (২) বিএফআরআই সুপার গিফট তেলাপিয়া; (৩) বিএফআরআই রাজপুঁটি ও (৪) কৈ মাছ। দেশের বিভিন্ন নদীর প্রাকৃতিক মজুদ থেকে সংগ্রহ করে ক্রস ব্রিডিং পদ্ধতিতে প্রথম প্রজন্মের উন্নত রুই মাছের জাত উদ্ভাবন করা হয়, যা বিদ্যমান জাত হতে ১৫% অধিক উৎপাদনশীল। বিএফআরআই সুপার গিফট তেলাপিয়া স্থানীয় জাতের তেলাপিয়ার চেয়ে ৪৩%, বিএফআরআই রাজপুঁটির জাত বিদ্যমান রাজপুঁটির চেয়ে ৩০% এবং কৈ ২৫% অধিক উৎপাদনশীল।

চিত্র: কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে মাছের জাত উন্নয়ন

২. বিলুপ্তপ্রায় ফলি মাছসহ অন্যান্য মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও সংরক্ষণ

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট দীর্ঘদিন যাবৎ বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজাতির ওপর গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। ইতোমধ্যে বাটা, সরপুঁটি, ভাগনা, কালিবাউস, গনিয়া, মহাশোল, পাবদা, গুলশা, শিং, মাগুর, গুজি, মেনি, ফলি প্রভৃতি মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সফলতা অর্জন করেছে। ফলি (*Notopterus notopterus*) মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু ও জনপ্রিয় বিধায় প্রকৃতি থেকে এ মাছ আহরণের মাত্রা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। চাহিদা ও স্বাদের জন্য এ মাছের বাজারমূল্য অনেক বেশি। এক সময় বাংলাদেশের নদীতে, বিলে, হাওরে ফলি মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। কিন্তু প্রকৃতিতে ফলি মাছ আজ বিপন্নপ্রায়। IUCN (২০০০)-এর মতে দেশীয় ২৬০টি প্রজাতির মাছের মধ্যে ৫৪টি এখন বিলুপ্তপ্রায়; তন্মধ্যে ফলি মাছ অন্যতম। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্রে ২০১৪ সালে প্রকৃতি হতে ফলি মাছের ব্রুড সংগ্রহ করে প্রতিপালন করা হয় এবং কৃত্রিম প্রজননের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে সফলতা অর্জিত হয়। কৃত্রিম প্রজননের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকারের ফলি মাছের পৃষ্ঠপাখনার নিচে বিভিন্ন মাত্রায় পিজি দ্রবণের ইনজেকশন প্রয়োগ হয়। পরবর্তীতে ২৪ ঘণ্টা পর পুরুষ মাছকে স্যাক্রিফাইস করে শুক্রাণু সংগ্রহ করা হয় এবং চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে স্ত্রী মাছ থেকে ডিম সংগ্রহ করে শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত করা হয়। অতঃপর নিষিক্ত ডিম প্রস্ফুটনের জন্য ইনকিউবেশন জারে দেয়া হয়। নিষিক্ত ডিম থেকে ৭২ ঘণ্টা পর রেণুপোনা (হ্যাচলিং) ফুটে বের হলে রেণুপোনাকে সরিয়ে হ্যাচিং ট্রেতে নেয়া হয় এবং সেখানে তিন দিন রাখা হয়। তিন দিন পর ডিম্বথলি নিঃশেষিত হওয়ার পর রেণুপোনাকে প্রতিদিন ৪ বার খাদ্য হিসেবে সেদ্ধ ডিমের কুসুম সরবরাহ করা হয়। অতঃপর রেণুপোনাকে পুকুরে স্থাপিত নার্সিং হাপায় রেখে প্রতিপালন করা হয়।

৩. কুচিয়া পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা

বিগত কয়েক বছর যাবত কুচিয়া রপ্তানি করে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। বিগত ২০১৪ সালে এ খাতে প্রায় ১৪ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। আরও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে কুচিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ইনস্টিটিউট বিগত কয়েক বছর যাবৎ গবেষণা পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে এবং প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে কুচিয়ার পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়েছে। কাঁকড়া ও কুচিয়ার ফিসারি উন্নয়নের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট এবং মৎস্য অধিদপ্তর যৌথ উদ্যোগে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করতে যাচ্ছে। আশা করা যায়, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের কাঁকড়া ও কুচিয়ার উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং দেশের বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি পাবে।

চিত্র: ফলি মাছের ব্রুড

চিত্র: ট্রেতে প্রতিপালিত ফলি মাছের পোনা

চিত্র: পরিপক্ব কুচিয়া

৪. কৃত্রিম প্রজননে কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন

কাঁকড়া একটি লাভজনক প্রচলিত পণ্য। বিগত বছরগুলোতে এদেশ থেকে প্রতি বছর ৫ থেকে ৭ হাজার মে.টন কাঁকড়া চীন, তাইওয়ান, কোরিয়া, হংকং প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়। ২০১৪ সালে কাঁকড়া রপ্তানি করে প্রায় ২৪ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। বিদেশে চাহিদা থাকায় ইনস্টিটিউটের লোনাপানি কেন্দ্র কর্তৃক কাঁকড়া ফ্যাটেনিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপকূলীয় জেলাসমূহে অনেক প্রান্তিক চাষি কাঁকড়া ফ্যাটেনিং করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে। বর্তমানে কাঁকড়া রপ্তানি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে এটি একটি সম্ভাবনাময় শিল্পের রূপ ধারণ করেছে।

চিত্র: পরিপক্ব কাঁকড়া

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রে বিগত ২০০৩ সালে প্রথম কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে গত নভেম্বর ২০১৪ থেকে সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র এবং ওয়ার্ল্ডফিস-এর যৌথ তত্ত্বাবধানে স্থানীয় নিরিবিলি হ্যাচারিতে নতুন উদ্যোগে কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনের গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। হ্যাচারিতে কাঁকড়ার পোনা (crablet) উৎপাদন অপেক্ষাকৃত নতুন প্রযুক্তি। এক্ষেত্রে মূল বাঁধা কাঁকড়ার পোনার বাঁচার হার। যদিও পরিপক্ব কাঁকড়ার ডিম দেওয়ার ক্ষমতা (hatching rate) অনেক (৮০ হাজার থেকে ৪০ লক্ষ), তবে বিভিন্ন দেশে কাঁকড়ার পোনার বাঁচার হার গড়ে প্রায় ১০ ভাগ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র এবং ওয়ার্ল্ডফিস-এর যৌথ গবেষণা পর্যবেক্ষণে হ্যাচারিতে প্রথম পর্যায়ে ডিসেম্বর-জানুয়ারি সময়ে মোট ৪টি পরিপক্ব মা কাঁকড়া থেকে যথাক্রমে ৩২ লক্ষ, ১৬ লক্ষ, ২৬ লক্ষ ও ১৯ লক্ষ হ্যাচিং পরবর্তী জুইয়া পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে হ্যাচারিতে কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনে এটিই সর্বপ্রথম সফলতা। এক্ষেত্রে কাঁকড়ার পোনার বাঁচার হার প্রায় ১.৫ ভাগ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। উৎপাদিত কাঁকড়ার পোনা গবেষণাগারে লালনের পর পুকুরে মজুদ করা হয়েছে।

৫. সামুদ্রিক মাছের পোনা উৎপাদনে লাইভ ফিড চাষ প্রযুক্তি

আমাদের দেশে সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি বা কাঁকড়া চাষে পোনার প্রাপ্যতা অন্যতম প্রধান সমস্যা। বর্তমানে হ্যাচারিতে চিংড়ি পোনা উৎপাদন হলেও মাছ বা কাঁকড়ার পোনার প্রাপ্যতা এখনও প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়। লাইভ ফিড সামুদ্রিক মাছ বা চিংড়ির পোনা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

লাইভ ফিড-এর বাংলা আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মাছ বা চিংড়ির জীবন্ত খাদ্য। পানিতে পোনার প্রাথমিক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদকণা ও প্রাণিজকণাকে লাইভ ফিড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রজাতির ৪০টি ফাইটোপ্লাংকটন (মাইক্রো অ্যালজি) অতিনিবিড় চাষের আওতায় রাখা হয়েছে। বর্তমানে বাণিজ্যিক মানসম্পন্ন ৩২টি প্রজাতিকে মাৎস্যবিজ্ঞানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয়।

চিত্র: গবেষণাগারে লাইফ ফিড চাষ

এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে ৫টি মাইক্রো অ্যালজি ও ১টি জুপ্লাংকটন (রটিফার) প্রজাতির কালচার করা হয়। ফাইটোপ্লাংকটনের মধ্যে *Nannochloropsis oculata, Cheatoceros* sp., *Tetraselmis* sp., *Thalassiosira* sp., *Skeletonema* sp. ইত্যাদি এবং একটি রটিফার প্রজাতি হলো *Brachionus rotundiformis.*

বিশ্বে সামুদ্রিক মাছ ও ক্রাস্টাসিয়ান হ্যাচারি ব্যবস্থাপনায় লাইভ ফিড চাষ প্রযুক্তির কল্যাণে ১৯৮০ সালের পর থেকে সহজেই হ্যাচারিতে মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়ার পোনা উৎপাদিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে চিংড়ি/মাছের হ্যাচারিতে ব্যবহারের জন্য লাইভ ফিড চাষ করা হচ্ছে। অতীতে এ লাইভ ফিড চাষ প্রযুক্তির অভাবে হ্যাচারিতে সামুদ্রিক মাছের পোনা করা সম্ভব হয়নি। লাইভ ফিড চাষের মাধ্যমে সম্প্রতি লোনাপানি কেন্দ্রে পারশে মাছের পোনা উৎপাদন এবং সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রে কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন সফল হয়েছে। ফলে আগামীতে আরও নতুন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছের কৃত্রিম প্রজননে পোনা উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

৬. ইলিশের প্রস্তাবিত ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম চিহ্নিতকরণ ও মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়

অব্যাহত গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে জাটকার প্রাচুর্য পর্যবেক্ষণ এবং পানির গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে জাটকার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত হয়ে বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার নাছাকাটি পয়েন্ট, হরিনাথপুর পয়েন্ট ও ধুলখোলা পয়েন্ট এবং মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার ভাষাণচর পয়েন্ট অঞ্চলে মেঘনার শাখা নদী, হিজলা উপজেলার ধর্মগঞ্জ ও নয়াভাঙ্গানী নদী এবং মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার লতা নদীর ৬০ কিলোমিটার এলাকায় ইলিশ/জাটকার নতুন (৬ষ্ঠ) অভয়াশ্রম ঘোষণার প্রস্তাব পেশ করা হয়। বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন, যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নতুন ঘোষণাযোগ্য এলাকার জিপিএস পয়েন্ট ও সীমানা নির্ধারণ করা হয়। অপর পৃষ্ঠার সারণিতে নতুন প্রস্তাবিত অভয়াশ্রমের জিপিএস পয়েন্ট ও সীমানা সন্নিবেশিত করা হলো। অর্থাৎ বিগত তিন বছরের পর্যবেক্ষণে ধারাবাহিকভাবে জাটকার প্রাচুর্য এবং পানির গুণাগুণসহ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার সকল বৈশিষ্ট্য পূরণ হওয়ায় এ অঞ্চলকে অভয়াশ্রম ঘোষণার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, প্রস্তাব গৃহীত হলে এটি ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম হিসেবে পরিচিত হবে।

সারণি: মেঘনার শাখা নদীতে বরিশালের হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ অঞ্চলে প্রস্তাবিত ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রমের সীমানা এবং মাছ ধরার নিষিদ্ধকাল

প্রস্তাবিত ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রমের সীমানা		জিপিএস পয়েন্ট	মোট আয়তন	মাছ ধরার নিষিদ্ধ কাল (প্রস্তাবিত)
উত্তর-পূর্ব	বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার নাছাকাটি পয়েন্ট (নয়াভাঙ্গানী নদী)	২৩°০২.৭৫' উত্তর অক্ষাংশ ৯০°৩৬.৭৪' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ	৬০ (ষাট) কিলোমিটার	মার্চ-এপ্রিল
উত্তর-পশ্চিম	বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার হরিনাথপুর পয়েন্ট (নয়াভাঙ্গানী নদী)	২২°৫৮.৬৭' উত্তর অক্ষাংশ ৯০°২৭.৬৪' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ		
দক্ষিণ-পূর্ব	বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার ধুলখোলা পয়েন্ট (ধর্মগঞ্জ নদী)	২২°৫১.৯১' উত্তর অক্ষাংশ ৯০°৩৭.৫২' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ		
দক্ষিণ-পশ্চিম	বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার ভাষাণচর পয়েন্ট (লতা নদী)	২২°৪৭.৪৩' উত্তর অক্ষাংশ ৯০°২৬.১৬' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ		

অব্যাহত গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ভরা পূর্ণিমার পূর্বের দিনগুলোর চেয়ে ভরা পূর্ণিমার পরের দিনগুলি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই পরবর্তীতে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর প্রজননক্ষম ইলিশ সংরক্ষণের পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়। 'আশ্বিন মাসের ১ম উদিত চাঁদের বড় পূর্ণিমার পূর্বের ৫ দিন, পূর্ণিমার ১ দিন ও পূর্ণিমার পরের ৯ দিন মোট ১৫ দিন প্রজননক্ষম ইলিশ ধরা, পরিবহন, বাজারজাতসহ সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকবে'।

ভবিষ্যৎ গবেষণা পরিকল্পনা (Future research plan)

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এবং সম্প্রসারণের ফলে বিগত কয়েক দশকে চাষের মাধ্যমে দেশে মৎস্য উৎপাদনে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিগত ২০১৪ খ্রি. সালে স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ স্থানে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ছাড়াও দেশে প্রতি জন দৈনিক প্রায় ৫৩ গ্রাম হারে মাছ গ্রহণ করছে। এ পরিমাণ ৬০ গ্রামে উন্নীত করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে সমুদ্র বিজয়ের ফলে দেশের ১ লক্ষ ১৮ হাজার বর্গ কিমি সামুদ্রিক এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের গবেষণার নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি এবং মৎস্যজাত আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্ণিত গবেষণাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে:

১. কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে মাছের উন্নততর জাত উদ্ভাবন

কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউট কর্তৃক দেশি রুই, তেলাপিয়া, কৈ, পাঙ্গাস ও রাজপুঁটি মাছের জাত উন্নয়ন করা হয়েছে। এ গবেষণার অধীনে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব মাছের আরও উন্নত জাত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মাছসমূহের জাত উন্নয়ন করার পদক্ষেপ নেয়া হবে।

২. বিপন্ন জলজ প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণে জিন ব্যাংক স্থাপন, পোনা উৎপাদন ও চাষ কৌশল উদ্ভাবন

চিহ্নিত ৫৬টি বিপন্ন মৎস্য প্রজাতির মধ্যে ইনস্টিটিউট কর্তৃক ইতোমধ্যে ১২টি মৎস্য প্রজাতির পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে। প্রকৃতিতে বিপন্ন মৎস্য প্রজাতির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উৎপাদনের জন্য উল্লিখিত প্রকল্পের মাধ্যমে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মাছসমূহের পোনা উৎপাদন এবং চাষ কৌশল উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করা হবে। এছাড়া এসব মাছ সংরক্ষণের জন্য জিন ব্যাংক স্থাপন করাও বিশেষ প্রয়োজন।

৩. ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও চাষ কৌশল উদ্ভাবন

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইনস্টিটিউট ইলিশ সম্পদ রক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বাস্তবভিত্তিক গবেষণা লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে গৃহীত পরিকল্পনার ফলে প্রকৃতিতে ইলিশের প্রাচুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। 'জাটকা সংরক্ষণ, বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা'শীর্ষক প্রকল্পটি অতি সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। নদীতে ইলিশের সংরক্ষণ ও উৎপাদন আরও বৃদ্ধির করতে হলে নিরন্তর গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইলিশের নতুন নার্সারি এলাকা শনাক্তকরণ, নতুন অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এলাকা চিহ্নিতকরণ, জাটকার পরিমাণ নির্ধারণ, কৃত্রিম প্রজনন ও চাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের ওপর গবেষণা পরিচালনা করা হবে।

৪. কাঁকড়া, কুচিয়া, শামুক, ঝিনুকসহ অপ্রচলিত জলজ প্রাণির প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন

কাঁকড়া, কুচিয়া, শামুক ও ঝিনুক আমাদের দেশে খাদ্য হিসেবে অপ্রচলিত হলেও বিদেশের বাজারে এসব প্রাণির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানি করে প্রতি বছর বৈদেশিক

মুদ্রাও আয় হচ্ছে। আইইউসিএন কুচিয়াকে ইতোমধ্যে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে ঘোষণা করেছে। দূষণ এবং চিংড়ি খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের কারণে প্রকৃতিতে শামুক ও ঝিনুকের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। অথচ এসব গুরুত্বপূর্ণ জলজ প্রাণীর উৎপাদন বৃদ্ধি করে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এ লক্ষ্যে এসব জলজ প্রাণির প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, প্রজনন, পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা হবে।

৫. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলশায়ে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি

অতীতে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়সমূহ, যথা- হাওর, বিল, বাঁওড় এবং নদী-নালায় পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু পরিবেশ দূষণ ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এসব জলাশয়ে মাছের উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে অনেক জেলে সম্প্রদায়ের জীবন এবং জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রাকৃতিক এসব উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হবে।

৬. পরিবেশবান্ধব চিংড়ি ও মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও দক্ষিণাঞ্চলে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে নিশ্চিতভাবে সমগ্র দেশের বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের চিংড়ি ও মাছ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যুগোপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা না হলে দেশের মৎস্য উৎপাদন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গবেষণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে চিংড়ি ও মাছ চাষের যুগোপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হবে।

৭. সামুদ্রিক মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা

সামুদ্রিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মাছ যেমন- ভেটকি, ভোল, খরশুলা, দাতিনা, চিত্রা ইত্যাদি সুস্বাদু মাছের স্থানীয় এবং বিদেশের বাজারে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। অতীতে প্রাকৃতিক জলাশয়ে এবং চিংড়ি ঘেরে এসব মাছ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। কিন্তু নির্বিচার আহরণ ও পরিবেশগত কারণে প্রাকৃতিক জলাশয়ে এসব মাছের প্রাপ্যতা ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে সামুদ্রিক গুরুত্বপূর্ণ এসব মাছের সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রণোদিত প্রজনন ও চাষাবাদের পদ্ধতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা বাস্তবায়ন করা হবে।

৮. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন

সমুদ্র বিজয়ের ফলে ১ লক্ষ ১৮ হাজার বর্গ কিমি সমুদ্র সীমানায় বাংলাদেশে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিস্তীর্ণ জলাশয়ে মাছের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ সম্পদের সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি গবেষণা জাহাজ ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গবেষণা মাধ্যমে এ বিস্তীর্ণ জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কাজ পরিচালনা করা হবে।

৯. সামুদ্রিক শেওলা ও মাছ হতে বহুবিধ মূল্য সংযোজন দ্রব্য ও উপদ্রব্য তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সেন্টমার্টিন দ্বীপে কয়েক প্রকার সামুদ্রিক শেওলা জন্মায়। ইতোমধ্যে ২৮ প্রজাতির শেওলা শনাক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৬ প্রজাতি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে এসব শেওলা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত না হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এসবের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। এছাড়া এসব শেওলা হতে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য এবং সুস্বাদু খাবার তৈরি করা যায়। চাষের মাধ্যমে এসব শেওলার উৎপাদন বৃদ্ধি করে মূল্য সংযোজন দ্রব্য তৈরির মাধ্যমে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এছাড়া সামুদ্রিক বিভিন্ন মাছের পাখনা, চর্বি ও মাংস হতে বিভিন্ন উপদ্রব্য তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। উল্লিখিত গবেষণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামুদ্রিক শেওলা ও মাছ হতে বিভিন্ন মূল্য সংযোজন দ্রব্য এবং উপদ্রব্য তৈরি করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হবে।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট জাতীয় চাহিদার নিরিখে নিবিড় গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে ইতোমধ্যে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের অধিকাংশই প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কার্যক্রমের মাধ্যমে সফলভাবে সারাদেশে চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে হস্তান্তর করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ প্রযুক্তিসমূহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীসহ উদ্যোক্তা শ্রেণিকে মাছ চাষে উৎসাহী করে তোলে। তাই মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচিকে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত করতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হবে। বিএফআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মৎস্য চাষি ও উদ্যোক্তাদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, বিশেষ করে মৎস্য অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে তা অব্যাহত রাখতে হবে। গবেষণা কর্মকাণ্ড একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মৎস্য খাতের মত একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রকে অধিকতর উন্নয়নের জন্য মাছের উন্নত চাষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার ওপর আরোও নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্যোগ নেয়া হবে। মাছ চাষ উন্নয়নের জন্য উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন, উন্নতমানের পোনা উৎপাদন, উন্নতমানের খাদ্য প্রস্তুত, রোগ-বালাইয়ের মহামারী থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হবে। মাছের উন্নত জাত ও দেশীয় মাছের প্রজাতি সংরক্ষণসহ মাছের প্রজননের প্রকৃত বয়স নির্ধারণে গবেষণা কাজ চলছে। পরিবেশ বিপর্যয় ও নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে মুক্ত জলাশয়ে জীববৈচিত্র্যের যে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে তার প্রকৃত কারণ চিহ্নিতকরণপূর্বক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। হাওর-বাঁওড় ও বিলে চাষভিত্তিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

মাছ চাষ ও মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনায় জেনেটিক্স কলা-কৌশল : মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ-ভাবনা

Genetic Techniques in Aquaculture and Open Water Management : Practical Application at Field Level

ড. মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ্

Abstract

Fish production in Bangladesh is increasing at a rapid pace. This is primarily due to culture technologies dissemination and new species introduction in culture. There is an intricate relation between culture and capture. The hatchery populations are prone to genetic variation losses through inappropriate genetic management. Inbreeding, genetic drift, gene introgression and negative selection are inevitable in the hatchery. Thus we often have to depend on the natural supply of fresh genome for replenishment of the hatchery gene pools; the natural populations are thus the repository of hatchery populations. Open water populations are also liable to genetic deterioration due to both natural and anthropogenic causes; the resultant is probably the present fish biodiversity loss in the country. If the present biodiversity loss continues, the aquaculture production cannot be sustained. In the field level management there are enough scopes for applying genetic knows how conserving and protecting fish biodiversity, providing sustenance of fish production. Hatchery populations must be managed with proper genetic norms and practices for seed quality in one hand, on the other, natural populations must be conserved as continuous source of supply of fresh germplasm for the culture sector. Without a success in fish biodiversity conservation at species, population and ecosystem levels the vigor and sustenance of natural populations cannot be attained and production from capture will continue to decline. The flood plain fisheries interests have to be collaterally discussed with the rice cultivation interest. Integrated with flood forecasting and sluice gates management in the mouth of rivers/khals connecting the flood plains, early flood has to be encouraged for breeding migration of the river resident species. For conservation of local fish biodiversity perennial waters in any forms have to be conserved and managed. The different existing conservation approaches like sanctuaries and protected zones etc. must be looked seriously for their fullest efficacy; together, more such areas must be declared. For return of rice field fish diversity, together with local perennial waters conservation and breeding migration routes clearance, changes have to be brought about in selected insecticides/pesticides usage. There is no alternative of a renewed rigorous attempt for implementation of the fisheries acts and regulations for fish biodiversity conservation and sustained fish production. Capacity enhancement of the Department with regard to manpower and support services is but the clear deterrent for achieving success in the statuses so discussed.

মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করছে। বিগত ২০১৩-১৪ বছরে মাছের মোট উৎপাদন ৩৫.৪৮ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে দেশে মাছ চাষ প্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। একদিকে যেমন প্রযুক্তির উন্নয়ন হয়েছে তেমনি চাষের ক্ষেত্রে কিছু নতুন প্রজাতিরও অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। বর্তমানে মোট উৎপাদনের শতকরা ৫৫ ভাগ মাছ আসছে চাষ থেকে আর বাকি ৪৫ ভাগ আসছে মুক্ত জলাশয় ও সমুদ্রের আহরণ থেকে। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিতে মুক্ত জলাশয়ের মাছ বরাবরই মোট উৎপাদনের সিংহভাগ দখল করে ছিল, কিন্তু সেই অবদান বিগত কয়েক বছর ধরেই ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। মুক্ত জলাশয় তথা নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর, বাঁওড় এবং সমুদ্র থেকেও আহরিত মাছের উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখার জন্য সরকারিভাবে নানা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলেও তা থেকে উপযুক্ত ফললাভ হয়েছে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের মুক্ত জলাশয়ের পরিবেশ খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে জলজ- জীববৈচিত্র্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এদেশের জলজ-জীববৈচিত্র্যে মৎস্য প্রজাতি-পপুলেশনসমূহ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কোন একটি বিশেষ স্থানের জীববৈচিত্র্য তিনটি বিষয়ে বিবেচিত হয়। যথা: (১) ঐ স্থানে কোন জীবের মোট কতটি প্রজাতি জীবিত আছে; (২) ঐসব জীবের কোনো একটি প্রজাতি-পপুলেশনের জিনে জিনে বৈচিত্র্য বর্তমানে কেমন আছে এবং (৩) ঐ স্থানের প্রতিবেশিক বৈচিত্র্য কী পরিমাণ অক্ষুণ্ন আছে। এ তিনটি বিষয়ের নিরিখে বাংলাদেশের জলাভূমিসমূহের জীববৈচিত্র্য আলোচনা করলে দেখা যাবে এমন কোনো নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর, বাঁওড় এমনকি সমুদ্র এলাকাও নেই যেখানকার জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

মাছ চাষ এবং মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য প্রজাতি-পপুলেশনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কীয় জেনেটিক্স আলোচনা করতে হলে দু'টোকে একসাথেই আলোচনা করতে হবে। জেনেটিক্সের যেসব মতবাদ প্রযুক্তিতে পরিণত করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজে লাগানো হয় সে সব প্রযুক্তি চাষ কিংবা ব্যবস্থাপনার জন্য আদতে আলাদা কিছু নয়। আসলে মাছ চাষ ও মুক্ত জলাশয়ের ব্যবস্থাপনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত; একটি অপরটির পরিপূরক। যেসব প্রজাতির এখন চাষ করা হচ্ছে এদের প্রত্যেকটির পপুলেশনকে প্রকৃতিতে অবশ্যই সফলভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। হ্যাচারিতে এসব প্রজাতির

কৃত্রিমভাবে পোনা উৎপাদনে এদের পপুলেশনে আমাদের অজান্তেই এমনকি অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘটিত নানা রকম জেনেটিক সমস্যার সৃষ্টি হয় ফলে স্বাভাবিকভাবে সেসব ব্রুড মাছ পরিবর্তন করে প্রকৃতি থেকে নতুন মাছ সংগ্রহ করতে হয় এবং তখন আমাদেরকে সেই প্রাকৃতিক উৎসের ওপরেই আবার নির্ভর করতে হয়। তাই একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাষে নিয়োজিত প্রজাতিসমূহের প্রাকৃতিক পপুলেশনকে অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। তা না হলে মাছ চাষের ক্রমাগত উন্নতি সাধন কিছুতেই সম্ভব নয়; এক সময় এ চাষ কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য হবে।

জীববৈচিত্র্য ও জেনেটিক্স
(Biodiversity & Genetics)

আমাদের প্রকৃতিতে মৎস্য জীববৈচিত্র্যের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে- প্রজাতি সংখ্যা, জিন বৈচিত্র্য ও প্রতিবেশিক বৈচিত্র্য যেভাবে হ্রাস পেয়েছে তা এক কথায় লোমহর্ষক। IUCN বাংলাদেশের ৫৪ প্রজাতির মাছকে বিপদাপন্ন অথবা সংকটজনকভাবে বিপদাপন্ন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বর্তমানে ঐ একই সংস্থার অধীনে বাংলাদেশে মাছের রেড লিস্ট প্রজাতির তালিকা হালনাগাদের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। কোন প্রজাতি-পপুলেশনের বিপদাপন্ন/সংকটাপন্ন হয়ে পড়ার জৈব-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে, পরিবেশের মাঝে খাপ খাইয়ে বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে সফলভাবে টিকে থাকতে প্রজাতি-পপুলেশনে যে দরকারি জেনেটিক বৈচিত্র্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়, নির্বিচারে মৎস্য নিধন ও নানা কারণে পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয়ের ফলে পপুলেশনে সেই জেনেটিক বৈচিত্র্য (genetic variation) তেমন আর অবশিষ্ট থাকে না; তাদের বংশবৃদ্ধি স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং প্রকৃতিতে তাদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। পপুলেশনের ঐ অবস্থাকে বিজ্ঞানের ভাষায় জেনেটিক ড্রিফ্ট (genetic drift) বলা হয়। আমাদের জলজ প্রকৃতি যেভাবে তাদের চমৎকৃতি (complexity) হারিয়েছে তাতে এদেশের বিপুল সংখ্যক প্রজাতি-পপুলেশনের মধ্যে যে জেনেটিক ড্রিফ্ট ঘটেনি তা সন্দেহাতীভাবে বলা যায় না। একটি পপুলেশন ড্রিফ্টে পতিত হলে তাদের মধ্যে অন্তঃপ্রজননের (inbreeding) হার বেড়ে যায়; তাদের জিনের সমসত্ত্বতা (homozygosity) বৃদ্ধি পায়; অসমসত্ত্বতা (heterozygosity) কমে যায় ফলে ঐ প্রজাতি-পপুলেশন প্রকৃতিতে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার ক্ষমতা (adaptation) হারিয়ে ফেলে এবং বিপদাপন্ন বা সংকটাপন্ন (endangered/critically endangered) অবস্থায় পতিত হয়।

অনেকেই মনে করেন বিপদাপন্ন/সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত অর্থাৎ ড্রিফটেড অবস্থায় পতিত একটি প্রজাতিকে চাষের আওতায় এনে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। বিষয়টি আসলে জেনেটিক সিলেকশন/অভিযোজন (selection/evolution) তত্ত্বের সাথে মেলে না। কেননা চাষের আওতায় আনতে হলে শুরুতেই ঐ প্রজাতির ব্রুড স্টক তৈরিতে মাছ সংগ্রহ করতে হবে; প্রকৃতিতেই যে পপুলেশন দরকারি বৈচিত্র্যের (variation) অভাবে টিকে থাকতে পারছে না; জেনেটিক বৈচিত্র্যহীনতায় ভুগছে; অন্তঃপ্রজনন চাপে আক্রান্ত (inbreeding depression); তেমন পপুলেশন থেকে সংগৃহীত ব্রুড মাছের বংশধরও প্রকৃতিতে খাপ খাইয়ে টিকে থাকতে পারবে না এবং তাদের সংরক্ষণ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হবে। তা ছাড়া একটি বন্য প্রজাতিকে কৃত্রিম পরিবেশে মানিয়ে নিয়ে সফলভাবে তার বংশ পরম্পরা সহজে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এ ক্ষেত্রে ডমেস্টিকেশন বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে। কেননা ডমেস্টিকেশন বিষয়টি জিন অ্যাকশন দ্বারা নির্ধারিত একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। বন্য প্রাণীকে যেমন সহজে পোষ মানানো যায় না; বন্য মাছকেও তেমনি কৃত্রিম পরিবেশে সহজে বশে আনা যায় না। এ কারণেই বাংলাদেশে রুই-কাতলা জাতীয় মাছ এবং বিদেশি কিছু মাছ ছাড়া অনেক বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছের চাষ প্রতিষ্ঠা করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

মাছ চাষ ও মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা একে অপরের পরিপূরক। মুক্ত জলাশয়ের পপুলেশন যেমন চাষের পপুলেশনের রিপজিটরি (repository) হিসেবে জেনেটিক গুণাগুণ পুনর্ভরণে অবদান রাখে, মুক্ত জলাশয়ের পপুলেশনও তেমনি জেনেটিক বৈচিত্র্য হারিয়ে বিপদাপন্ন/সংকটাপন্ন হওয়ার উপক্রম হলে হ্যাচারি উৎপাদিত পোনা অবমুক্তির মাধ্যমে সেই বৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা যায়। সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যেন পোনার জেনেটিক মান/জেনেটিক বৈচিত্র্য অবশ্যই ভাল থাকে; নিম্ন জেনেটিক মানের পোনা প্রকৃতিতে অবমুক্তির দ্বারা প্রাকৃতিক পপুলেশনের প্রকৃতিতে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার বিপদ বা সংকটকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না।

মাছ চাষ ও জেনেটিক্স
(Fish Culture & Genetics)

এমনিতেই মাছ চাষ কর্মকাণ্ড (হ্যাচারিতে ব্রুড লালন-পালন এবং পোনা উৎপাদন প্রক্রিয়া) প্রজাতি-পপুলেশনের জেনেটিক বৈচিত্র্য সংকুচিত করে তোলে। ব্রুড মাছের লালন-পালন, তাদের পুষ্টি, ব্রুড পুকুরের পানি ও মাটির গুণাগুণ তথা নন-জেনেটিক নানা কারণ ছাড়াও হ্যাচারিতে সাধারণত যে সব জেনেটিক সমস্যা সৃষ্টি হয় তা হলো: (১) অন্তঃপ্রজনন; (২) ঋণাত্মক নির্বাচন এবং (৩) ব্রুড পপুলেশনে জেনেটিক ড্রিফট।

বাংলাদেশে বর্তমানে দেশি-বিদেশি প্রায় ১৮ প্রজাতির মাছের চাষ হচ্ছে এবং এসব প্রজাতির পোনার চাহিদার প্রায় সবটাই সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ৯৩৬টি হ্যাচারি-উৎপাদিত পোনা থেকে মেটানো হচ্ছে। ব্যাপারটি উৎসাহব্যঞ্জক এবং এটি একথাই নির্দেশ করে যে, পোনা উৎপাদন কলা-কৌশল চাষিদের মাঝে বিস্তৃতভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু উৎপাদিত পোনামাছের জেনেটিক গুণাগুণ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে যখন অহরহ আপত্তি শোনা যায় তখন হ্যাচারি উৎপাদন কর্মকাণ্ডে জড়িত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে হ্যাচারি-জেনেটিক্স বিষয়ক নিবিড় প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে এবং সীড কোয়ালিটি মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারের সাথে সাথে মৎস্যবীজ সার্টিফিকেশন কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এজন্য মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সেবা/সহায়তার মানও বাড়াতে হবে। হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনে উপরে বর্ণিত যে তিনটি জেনেটিক সমস্যার কথা বলা হলো; হ্যাচারি স্থাপনের শুরুতেই ব্রুড পপুলেশন সংগ্রহ এবং পরবর্তীতে প্রজনন মৌসুমে ব্রুড

নির্বাচনসহ হ্যাচারি পরিচালনায় অনুসৃত সার্বিক নীতিমালার সাথে ঐ সব সমস্যার সবগুলোই নিবিড়ভাবে জড়িত।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় ব্রুড মাছ একই পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্ট হওয়ায় তারা একই জিন ধারণ করে, ফলে ঐ রকম ব্রুডের মধ্যে প্রজনন সংঘটিত হলে অন্তঃপ্রজনন হয় এবং তা হলে সৃষ্ট সন্তানদের জিন লোসাইয়ের (gene loci) মধ্যে সমসত্ত্বতা বেড়ে যায় এবং অসমসত্ত্বতা কমে যায় অর্থাৎ জেনেটিক বৈচিত্র্য কমে যায়। চাষের জন্য গুণবাচক যে কোনো বৈশিষ্ট্যের নিরিখেই অন্তঃপ্রজনিত পোনা মাছ নিকৃষ্ট হিসেবে পরিগণিত হয়। হ্যাচারিতে অন্তঃপ্রজনন ঠেকাতে হলে ব্যবহৃত ব্রুড মাছ যাতে বংশসূত্রে ঘনিষ্ঠ না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য প্রকৃতি থেকে অধিক সংখ্যক হারে ব্রুড মাছ সংগ্রহ করতে হবে। পপুলেশন জেনেটিক্সের তত্ত্ব মতে প্রকৃতি থেকে কোনো প্রজাতির ব্রুড মাছের সংগ্রহ/নমুনায়ন আসলে ঐ প্রজাতি-পপুলেশনের জিন নমুনায়নেরই নামান্তর। প্রাকৃতিক পপুলেশন থেকে ব্রুড মাছ সংগ্রহের সময় ঐ প্রজাতির মাছ শত শত হারে সংগ্রহ করতে হবে যাতে ঐ পপুলেশনে বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যমান সব জিন নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। পপুলেশনে এমন অনেক জিন আছে যে সব জিন খুব কম হারে বিদ্যমান থাকলেও তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। তাই কম সংখ্যক মাছ নিয়ে ব্রুড স্টক গঠন করা হলে ব্রুড স্টক গঠনের শুরুতেই সেসব জিন হ্যাচারি পপুলেশন থেকে বাদ পড়ে যায়; এ অবস্থাকে জেনেটিক ড্রিফ্ট বলা হয়। একটি ড্রিফ্টেড ব্রুড স্টক থেকে উৎপাদিত পোনা অন্তঃপ্রজননিত হয়। কোনো হ্যাচারি বা অন্য কোনো উৎস থেকে সংগ্রহ করা হলে ঐ মাছের কূল ইতিহাস জেনে নিতে হবে যাতে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয়তা পরিহার করা যায়।

বাংলাদেশে কার্প হ্যাচারিগুলোতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঋণাত্মক নির্বাচন সংঘটিত হওয়ার নজির পাওয়া যায়। ক্রমাগতভাবে অনেক বংশ ধরে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ব্রুড মাছ প্রজননের জন্য নির্বাচন করা হলে ঐ বৈশিষ্ট্যের অনুকূলে জেনেটিক নির্বাচন সংঘটিত হয়। কার্প, বিশেষ করে রুই, কাতলা ও সিলভার কার্পের ব্রুডের গড় ওজন হ্রাসের অনুকূলে দৃশ্যত ঋণাত্মক নির্বাচন সংঘটিত হয়েছে। কথিত আছে যে, হ্যাচারি ব্যবস্থাপকগণ প্রজননের জন্য দরকারি হরমোনের খরচ বাঁচানোর জন্য হোক কিংবা ব্রুড মাছ নাড়াচাড়ার (handing) সুবিধার কারণেই হোক, ছোট আকারের ব্রুড মাছ প্রজনন করিয়ে থাকেন। এভাবে অনেক বংশ ধরে ছোট মাছ প্রজনন করানোর ফলে ছোট আকারের ব্রুড মাছের অনুকূলে ব্যবস্থাপকদের অজান্তেই জেনেটিক নির্বাচন সংঘটিত হয়ে পড়েছে। এটি কিছুতেই কাম্য হতে পারে না; ছোট ব্রুড মাছ থেকে উৎপাদিত পোনার বর্ধন ও উন্নয়ন কম হয় যা হ্যাচারি উৎপাদিত পোনার জন্য আপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রুডের গড় ওজন কমে যাওয়া ছাড়াও সম্ভবত আগাম প্রজনন মৌসুমের অনুকূলেও রুইজাতীয় মাছে ঋণাত্মক নির্বাচন সংঘটিত হয়েছে। ব্যাপারটি যেভাবে ঘটে তা হলো- প্রজনন মৌসুমের শুরুতে মার্চ-এপ্রিল মাসে যখন নতুন বর্ষা নামে সে সময় বাজারে রেণু পোনার চাহিদা ও মূল্য বেশি থাকায় হ্যাচারি মালিকগণ ব্যবসায়িক কারণে কেবল আগাম মৌসুমেই প্রজনন কাজ পরিচালনা করে থাকেন এবং অনেক সময়ই ব্যবসায় ভাল লাভ হলে বাকি সময় আর হ্যাচারি পরিচালনা করেন না। ফলে অনেক হ্যাচারিতে সারা মৌসুম জুড়ে প্রজনন করার মত পরিপক্ব ব্রুড মাছ পাওয়া যায় না। কেবল এ দু'টো বিষয়ই নয়, আসলে যে কোনো বৈশিষ্ট্য বা বিষয়ের প্রেক্ষিতে ক্রমাগতভাবে প্রতি বংশে মাছ নির্বাচন করলে ঐ বৈশিষ্ট্য/বিষয়সমূহের অনুকূলেই ঋণাত্মক নির্বাচন সংঘটিত হবে। ঋণাত্মক নির্বাচন ঠেকাতে হলে non selection পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্যের মাছই বংশ পরম্পরায় প্রজননের জন্য নির্বাচন না করে হ্যাচারি পরিচালনা করতে হবে; অর্থাৎ সারা প্রজনন মৌসুম জুড়ে সব আকার আকৃতির ব্রুড মাছ প্রজনন করাতে হবে।

মাছ চাষ ও মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ
(Fish Culture & Openwater Fisheries Resources)

বাংলাদেশে প্রতি বছর মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে আশান্বিত হবার সাথে সাথে শঙ্কা হয় এ কারণে যে পরিবেশ তথা মৎস্য জীববৈচিত্র্য বজায় না রাখতে পারলে কেবল চাষের মাধ্যমে অর্জিত উৎপাদন বৃদ্ধি ধরে রাখা সম্ভব হবে না কেননা বুঝতে হবে যে চাষ এবং মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা একেবারে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। মুক্ত জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের অর্থ হলো পরিবেশের সাথে পপুলেশনের খাপ খাইয়ে টিকে থাকার ক্ষমতা লোপ পাওয়া। কৃত্রিম উপায়ে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা মাছ দ্বারা দেশে এখন অনেক প্রজাতির চাষ হচ্ছে; হ্যাচারি কর্মকাণ্ডে জেনেটিক্স এর নিয়ম নীতি সঠিকভাবে অনুসৃত না হওয়ায় এসব হ্যাচারি পপুলেশনে নানা রকম বিপত্তি দেখা দেয়। তাই সময় সময়ই হ্যাচারির মাছকে প্রাকৃতিক পপুলেশনের মাছ দ্বারা আংশিক/সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মুক্ত জলাশয়ের পপুলেশনকে তাই রিপজিটরি (repository) হিসেবে গণ্য করা হয়। অথচ সেই পপুলেশনের বৈচিত্র্য যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে চাষের পপুলেশনের জেনেটিক ক্ষতি পুষিয়ে ওঠার আর কোন উপায় অবশিষ্ট থাকে না।

মৎস্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে করণীয়
(Initiatives Needed for Conservation of Fish Biodiversity)

মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য জীববৈচিত্র্যের বর্তমান ভগ্নদশার উত্তরণ ঘটাতে হলে বিষয়টিকে জনগুরুত্বসম্পন্ন বিবেচনা করে জাতীয় পর্যায়ে জরুরিভাবে টাস্ক ফোর্স গঠন করে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর, বাঁওড়, মোহনা ও সমুদ্রাঞ্চলের মৎস্য জীববৈচিত্র্যের হালনাগাদ অবস্থা সমীক্ষা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবসম্মত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিগত কয়েক বছরে মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ড এখন জোর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের আওতায় আনতে হবে। বিভিন্ন জলাভূমি/জলমহালে যেসব অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে

সেগুলোর শতভাগ সাফল্য নিশ্চিত করতে হবে। জানা যায় অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অনেক প্রজাতি-পপুলেশনের প্রাচুর্য বাড়ানো সম্ভব হয়েছে, এমনকি দেখা গেছে অনেক প্রজাতি যেগুলো একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয়েছিল, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় তারা আবার ফিরে এসেছে। যদিও এমন অল্প বিস্তর ফিরে আসা জেনেটিক্স তত্ত্বে শেষতক ঐ পপুলেশনের প্রকৃতিতে খাপ খাইয়ে চলার জন্য মঙ্গলজনক কিছু নয়।

জীববৈচিত্র্য হালনাগাদকরণে অনেক জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিস প্রযুক্তির দ্বারা পরোক্ষভাবে জিনের বৈচিত্র্য সমীক্ষা করার পদ্ধতি অনেক পুরোনো হলেও এখনও এর প্রচলন আছে। বর্তমানে পপুলেশনের DNA এর বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষভাবে সমীক্ষার জন্য নানা রকম পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে; যেমন- AFLP, RFLP, RAPD, Microsatellite (SSR, SNP) ইত্যাদি। এগুলোর যে কোনো একটি প্রযুক্তির দ্বারা প্রাকৃতিক পপুলেশনের জেনেটিক বৈচিত্র্যের অবস্থা নিরূপণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে যেসব প্রজাতি বর্তমানে চাষ হচ্ছে সেসব প্রজাতির প্রাকৃতিক পপুলেশন সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা জরুরিভাবে গ্রহণ করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ নৌ যোগাযোগের জন্য নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সাথে মৎস্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিবেচনাকে জাতীয়ভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের বিভিন্ন ছোট বড় ভরাট হয়ে যাওয়া নদী খননে জাতীয়ভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং নদীতে মৎস্য আহরণে নৌকা, জাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রজনন ঋতু ও প্রজাতিভেদে ব্যবহারে মৎস্য সংরক্ষণ আইন অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বন্যা প্রতিরোধে নদীর দু'পাড়ে বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর প্রজাতি-পপুলেশনের প্রজনন অভিপ্রয়াণ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে বড় বড় নদীর সংলগ্ন প্লাবনভূমিতে মৎস্য জীববৈচিত্র্য/প্রাপ্যতা বহুকাল ধরে ধ্বংস হয়ে গেছে। দেশের বড় বড় নদীর প্লাবনভূমির সাথে যেসব খাল ও নদীর সংযোগ রয়েছে এবং/অথবা যেসব খাল/নদী-মুখে স্লুইস গেইট রয়েছে, বন্যার সাথে সঙ্গতি রেখে নদীর মাছের প্রজনন অভিপ্রয়াণের স্বার্থে সেসব স্লুইস গেইটের ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে।

অধ্যাপক ফিসারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিন
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

ছবি: বাংলাদেশে মুক্ত জলাশয়ে (বিল) অবাধে মৎস্য আহরণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের উপর চাপ সৃষ্টির সচরাচর চিত্র

মৎস্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ছাড়াও প্রাকৃতিক জলাভূমির মৎস্যসম্পদের স্বার্থ, বিশেষ করে বিল/হাওর/বাঁওড়ের মৎস্যসম্পদের সাথে কৃষির স্বার্থের যে সংঘাত রয়েছে তার একটি যৌক্তিক নিষ্পত্তির জন্য জোরদার জাতীয় আলোচনার বিষয়ে আর সময় ক্ষেপণের কোনো সুযোগ নেই। ধান চাষের কারণে বিল এলাকা সংকোচন ও ভরাট হয়ে যাওয়ার যে সম্পর্ক তা নিরূপণ করে খাল/বিলের গভীর অংশ অবশ্যই মাছের উন্নতির জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত একটি শক্ত বিল ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতাধীনে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কৃষি ও মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মীদের যৌথ প্রচেষ্টায় এ কাজ সহজেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

দেশের গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে নির্মিত রাস্তা-ঘাট, কল-কারখানা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের জন্য স্থানীয়ভাবে মাছের প্রজনন অভিপ্রয়াণ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। এ অভিপ্রয়াণ সম্ভাব্য পর্যায়ে ফিরিয়ে আনার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাৎসরিক জলাভূমিসমূহের ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনতে হবে। ধানক্ষেতে মাছের অবাধ বিচরণ/প্রজনন ও বর্ধনের জন্য ধান মাছ দু'টোরই স্বার্থ বিবেচনায় সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ে মৎস্য জেনেটিক কলা-কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য যেমন প্রয়োজন প্রশিক্ষিত জনবল তেমনি প্রয়োজন উন্নত সহায়তা/সেবা। জেনেটিক্সের নিরিখে মাছ চাষ ও মুক্ত জলাশয়ের ব্যবস্থাপনাকে আলাদাভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই; মুক্ত জলাশয়ের প্রজাতি-পপুলেশনের সতেজতাকে বাঁচাতে না পারলে মাছ চাষের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়; দু'টোই একে অপরের পরিপূরক। এদেশের মুক্ত জলাশয়ের মাছের জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাছ চাষ উন্নয়নের সাথে সাথে মুক্ত জলাশয়ের জেনেটিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণে জোরদার জাতীয় কর্মসূচি অনতিবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে।

বাণিজ্যিক চিংড়ি ট্রলারের ক্যাচ লগ ব্যবহার করে চিংড়ি মাছের মজুদ নিরূপণ

Assessment of Shrimp Stocks by Using Industrial Shrimp Trawl Catch Log

নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন[১] ও সুমন বড়ুয়া[২]

Abstract

Catch Per Unit Effort (CPUE) data of shrimp stock through industrial shrimping vessels from Bangladesh marine waters were used as tuning series for a stock production model (SPM) fitted using two different software platforms. The two software namely MS Excel and R statistical program, all fitted the data in a similar fashion and gave roughly the same parameter estimates. The intrinsic growth rate, *r* was estimated in the range of 0.701048 to 0.7334317, the catchability coefficient, *q* ranged from 0.000065 to 0.000071 and the carrying capacity, *K* ranged from 18915 MT to 18953 MT. It is observed that many of the model assumptions in the SPM are violated in this analysis. Apart from various limitations and violation of assumptions, the most important violations are the assumption that there are no species interactions that affect the abundance and productivity of the shrimp stock and the assumption of constant catchability. Though model assumptions are not met with the Bangladesh shrimp fishery due to nature of multispecies tropical fisheries, this stock assessment study using CPUE is roughly elucidate more reliable information of shrimp stock for industrial shrimping fleet until and unless to have information produced from survey vessel. It was found that the average estimation of *MSY*, *BMSY* and *FMSY* were 3395 MT, 9466 MT and 0.35 respectively. The standing stock biomass of shrimp for industrial shrimping fleet was 10,381 MT at the end of the year of 2013.

বঙ্গোপসাগরে মাছ ও চিংড়ির মজুদ নিরূপণের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশে সত্তর ও আশির দশকে বেশ কয়েকটি জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। FAO-এর মৎস্য বিশেষজ্ঞ Dr. WQB West ১৯৭৩ সালে প্রথম জরিপ শুরু করেন। এর মাধ্যমে তলদেশীয় ট্রলিং শিল্পের সূচনা যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFDC)-এর মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। পরবর্তীতে বিদেশি মৎস্যবিজ্ঞানী এবং দেশীয় বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে একাধিক মজুদ নিরূপণ করা হয়েছিল। তন্মধ্যে মৎস্যবিজ্ঞানী West ১৯৭৩ সালে এক জরিপের মাধ্যমে ২,৬৪,০০০-৩,৭৩,০০০ মে.টন তলদেশীয় সাদামাছ এবং ১১০০০ মে.টন চিংড়ি মজুদ উল্লেখ করেন। রশীদ ১৯৭৬-৭৭ সালে মিতা-জাভা জাহাজের মাধ্যমে ২০০০-৪০০০ মে.টন চিংড়ি মজুদের উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে ১৯৮১-৮৩ সালে গবেষণা জাহাজ RV অনুসন্ধানী কর্তৃক পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে ১৯৮৫ সালে White & Khan ৩০০০-৩৬০০ মে.টন চিংড়ি মজুদ উল্লেখ করেন। এসব জরিপ ও নির্ণায়িত মজুদের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ট্রলার শিল্পের বিকাশ ঘটে। যার ধারাবাহিকতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারের সংখ্যা ছিলো ১৯৯টি, যেখানে ৩০টি চিংড়ি ট্রলার। চিংড়ি ট্রলারের প্রধান আহরিত প্রজাতি হলো চিংড়ি। আহরিত চিংড়ি প্রজাতির মধ্যে টাইগার চিংড়ি *(Penaeus monodon)*, সাদা চিংড়ি *(P. indicus)*, বাদামী চিংড়ি *(Metapenaeus monoceros, M. brevicornis, M. spinulatus)* ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কমদামী চিংড়ি প্রজাতির সমাহার *(Parapenaeopsis sculptilis, P. stylifera, Acetes indicus)* উল্লেখযোগ্য।

স্টক প্রোডাকশন মডেলস্ (SPM) এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ (MSY) নির্ণয় একটি গ্রহণযোগ্য মৎস্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; যদিও এর প্রয়োগ অনেক সময় প্রশ্নের সম্মুখীন হয় (Hilborn & Walters, ১৯৯২; Quinn & Deriso, ১৯৯৯)। এ মডেল বায়োমাস ডাইনামিক মডেল বা সারপ্লাস প্রোডাকশন মডেল (SPM) নামেও পরিচিত। এটি খুবই সরল এবং বহুল ব্যবহৃত একটি মজুদ নির্ণয় পদ্ধতি যা দ্বারা কোনো মজুদের অতিরিক্ত জীবভর বা বায়োমাস আহরণকে বুঝায়। সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে মজুদ এর আকার প্রজনন ও দৈহিক বৃদ্ধির মাধ্যমে বাড়তে থাকে। সাথে সাথে স্বাভাবিক মৃত্যু ও মৎস্য আহরণের ফলে মৎস্য মজুদের আকার হ্রাস পেতে থাকে। মজুদের এরূপ ক্রিয়াশীলতা ১৯৩১ সালে প্রথম ব্যাখ্যা করেন জনাব রাসেল। কোনো মজুদের পূর্বের বছরের জীবভর পরবর্তী বছরের জীব ভরের সমান হবে যদি প্রবেশন ও দৈহিক বৃদ্ধি থেকে স্বাভাবিক মৃত্যু ও আহরণজনিত মৃত্যু বাদ দেওয়া হয়। উৎপাদন বলতে প্রবেশন ও দৈহিক বৃদ্ধিকে বুঝায়, সেহেতু এ রাশিদ্বয়ের যোগফল যদি মৃত্যুহার থেকে বেশি হয় তাহলে জীবভর বৃদ্ধি পেতে থাকে। জীবভরের এ বৃদ্ধিকে অতিরিক্ত উৎপাদন বলে। কোনো মজুদ থেকে যার সমপরিমাণ আহরণে মজুদ এর কোনো ক্ষতি হয় না। এক্ষেত্রে, সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ বলতে কোনো মজুদের সর্বোচ্চ অতিরিক্ত উৎপাদনকে বুঝায় (King, ১৯৯৫)। SPM হলো সহজ মজুদ নিরূপণ পদ্ধতি যেখানে শুধুমাত্র ২-৩ ধরনের ডাটা প্রয়োজন হয়। মজুদ নির্ণয়ের এ মডেলের নমনীয়তা হলো এটি পরিবেশের সাম্য কিংবা অসাম্য অবস্থায় এবং একটি প্রজাতি কিংবা বহু প্রজাতির বিন্যাসে ব্যবহার করা যায়। সিফার, ফক্স ও পেলা টমলিনসন মডেল উল্লেখযোগ্য (Jennings *et al.*, ২০০১)। তন্মধ্যে, প্রথম SPM হচ্ছে সিফার সারপ্লাস প্রোডাকশন মডেল (১৯৫৪)। স্টক প্রোডাকশন মডেলে প্রবেশন, দৈহিক বৃদ্ধি এবং মৃত্যুহার একত্রে একটি উৎপাদন রাশি (production function) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এ মডেল ট্রপিক্যাল ফিসারিজে বেশি ব্যবহৃত হয়, যেখানে মাছের বয়স নির্ণয় করাটা কঠিন এবং অনেকটা অসম্ভবও (Haddon, ২০১১)।

বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ জলসীমায় বিগত ৩ দশকে কোনো মৎস্য ও চিংড়ি মজুদ নিরূপণ না হওয়ায় হালনাগাদ কোনো তথ্য নেই। এটি হচ্ছে প্রথম উদ্যোগ যেখানে বাণিজ্যিক চিংড়ি ট্রলার বহরের ডাটা MS Excel ও R Statistical Program সফটওয়্যার প্লাটফরম দ্বারা SPM মডেলের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চিংড়ি ট্রলার কর্তৃক আহরিত চিংড়ির সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ নিরূপণের লক্ষ্যে মোট জীবভর, আহরণজনিত মৃত্যুহার এবং ক্যাচ ট্রেন্ড বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে এ নিবন্ধের অবতারণা।

কার্যপ্রণালি (Methodology)

ডাটা উৎস

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ জলসীমায় বাণিজ্যিক চিংড়ি ট্রলার বহর কর্তৃক ১৯৮৬ থেকে ২০১৩-এর ক্যাচ ও এফোর্ট ডাটা এ মডেলে ব্যবহার করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও তদাধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী, বাণিজ্যিক মৎস্য ও চিংড়ি ট্রলার উপকূল থেকে ৪০ মিটার গভীরতার বাইরে মৎস্য ও চিংড়ি আহরণে অনুমতিপ্রাপ্ত।

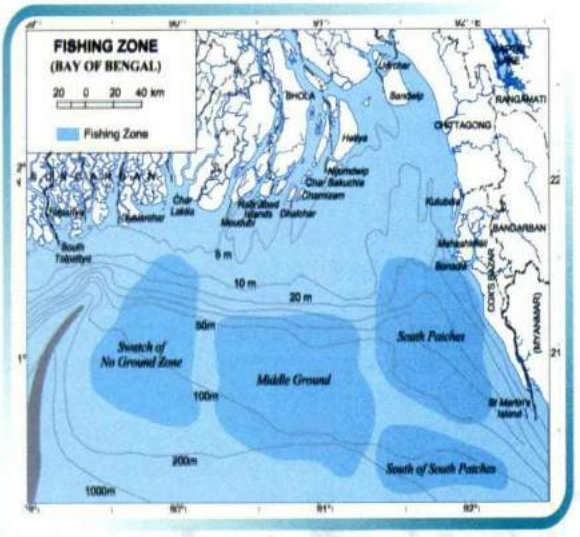

চিত্র: বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় বাণিজ্যিক ট্রলার বহর দ্বারা মৎস্য আহরণের এলাকা (৪০ মিটার গভীরতা ও তদূর্ধ্ব)

বাংলাদেশ EEZ এ মৎস্য আহরণে নিয়োজিত চিংড়ি ট্রলার সাধারণত ১৫০-২৫০ মে.টন গ্রস টনেজ সমৃদ্ধ এবং প্রধান ইঞ্জিনের ক্ষমতা ৫০০-৯০০ বিএইচপি এর মধ্যে হয়ে থাকে। এই ট্রলার প্রতিবার সমুদ্র যাত্রায় ৩০ দিনের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত। প্রতিদিন প্রায় ৫-৬ টা ট্রল করে এবং প্রতি ট্রল প্রায় ৩-৪ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। কিন্তু মৎস্য আহরণ দিবস ও ট্রল সংখ্যা পুরোপুরি আবহাওয়া ও জাহাজের সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। আহরণ মে.টনে এবং এফোর্ট ফিসিং দিবস দ্বারা বুঝানো হয়েছে

স্টক প্রোডাকশন মডেল

এখানে সিফার সারপ্লাস প্রোডাকশন মডেল ব্যবহার করা

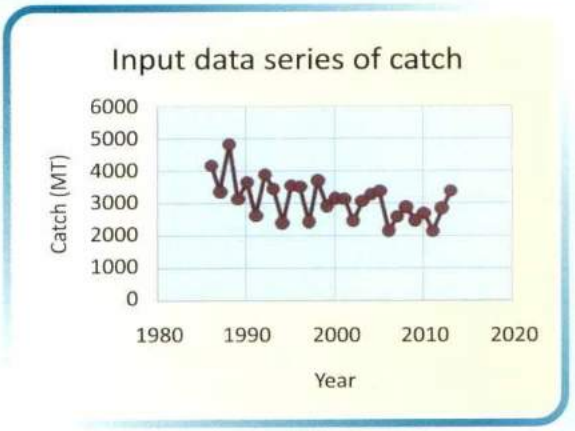

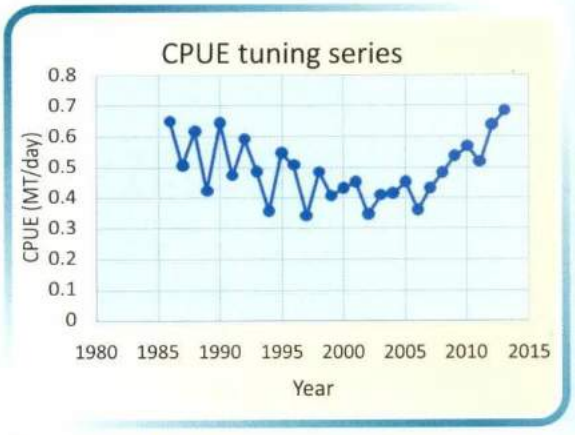

চিত্র: বাণিজ্যিক চিংড়ি ট্রলার বহরের ক্যাচ ও CPUE ডাটা সিরিজ

হয়েছে। এটি লজিস্টিক পপুলেশন গ্রোথ মডেলের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত; যেখানে

$$B_{t+1} = B_t + rB_t\left(1-\frac{B_t}{K}\right) - C_t \quad \text{.....(i)}$$

যেখানে, B হলো জীবভর (বায়োমাস), t হলো সময় (বছর), K হলো ধারণক্ষমতা, C হলো ক্যাচ, r হলো পপুলেশন বৃদ্ধির ইন্ট্রিনসিক হার। কোনো পপুলেশনের প্রতিবন্ধকতাবিহীন বৃদ্ধিকে পপুলেশন বৃদ্ধির ইন্ট্রিনসিক হার বলে। প্রজনন, প্রবেশন, দৈহিক বৃদ্ধি, মৃত্যুহার প্রভৃতি এক সাথে কেবল এ রাশি দ্বারা প্রকাশ করা যায়, যাকে উৎপাদন বা বৃদ্ধির ইন্ট্রিনসিক রেট বলে। সর্বনিম্ন পপুলেশন লেবেলে r এর মান শূন্য এবং পপুলেশন বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ হয় যখন K এর মান অর্ধেকে থাকে (Schaefer, ১৯৫৪)।

যেখানে জীবভর সম্বন্ধে পর্যাপ্ত তথ্য থাকে না সে ক্ষেত্রে CPUE হচ্ছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। CPUE হলো জীবভর এর সমানুপাতিক, যা নিম্নরূপ-

$$CPUE = qB_t \quad \text{.....(ii)}$$

এখানে, q হলো ক্যাচাবিলিটি কো-এফিসিয়েন্ট, যা কোনো মজুদে কোনো একটি স্বতন্ত্র মাছের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট গিয়ার দ্বারা ধরা পড়ার সম্ভাব্য হার বুঝায়।

নির্ণীত r, q ও K এর মান ম্যানেজমেন্ট রেফারেন্স পয়েন্ট যেমন সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ (MSY), যে জীবভর MSY দেয় (B_{MSY}) এবং MSY লেভেলে এ আহরণজনিত মৃত্যুহার (F_{MSY}) নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয় -

$MSY = (\frac{rK}{4})$ .....(iii)

$B_{MSY} = (\frac{K}{2})$ .....(iv)

$F_{MSY} = (\frac{r}{2})$ or $(\frac{MSY}{B_{MSY}})$ .....(v)

ফলাফল (Results)

প্যারামিটার নির্ণয়

SPM মডেলের প্রধান প্যারামিটারগুলো বিভিন্ন সফটওয়্যার প্লাটফরমে প্রায় একই। প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি: বিভিন্ন সফটওয়্যার প্লাটফরমে SPM মডেল দ্বারা নির্ণীত প্যারামিটারসমূহ

প্যারামিটার	MS Excel	R
r	০.৭০১০৪	০.৭৩৩৪৩
K	১৮৯৫৩	১৮৯১৫
q	০.০০০০৬৫১৯	০.০০০০৭১৬৬
B_{init}	১০০৩১	৮৯৭৭
MSY	৩৩২২	৩৪৬৮
B_{MSY}	৯৪৭৬	৯৪৫৭
F_{MSY}	০.৩৫	০.৩৬

ডাটা সিরিজের সাথে মডেল ফিটিং

বাণিজ্যিক চিংড়ি ট্রলার বহরের আহরিত এবং নির্ণীত CPUE পারস্পরিক সন্নিবেশ এর মাধ্যমে SPM মডেল সর্বোত্তম টিউনিং করা হয়েছে। মডেল এর ভুলের বর্গ এর সমাহার (RSS) ছিল ০.৩৪। নেগেটিভ লগ লাইকলিহুড (neglogL) দুই সফটওয়্যার প্লাটফরমে একই ছিল (-২১.৯৮), যা আহরিত ও নির্ণীত CPUE এর সর্বোত্তম সন্নিবেশ প্রকাশ করে।

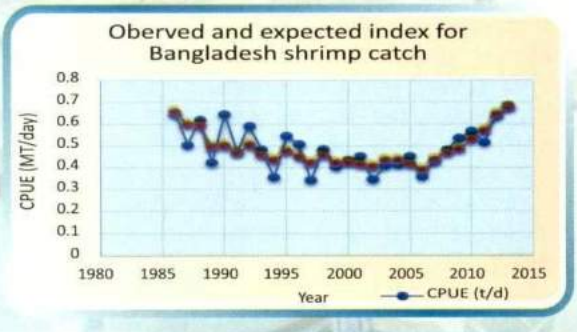

চিত্র: ডাটা সিরিজের সাথে SPM মডেল ফিটিং

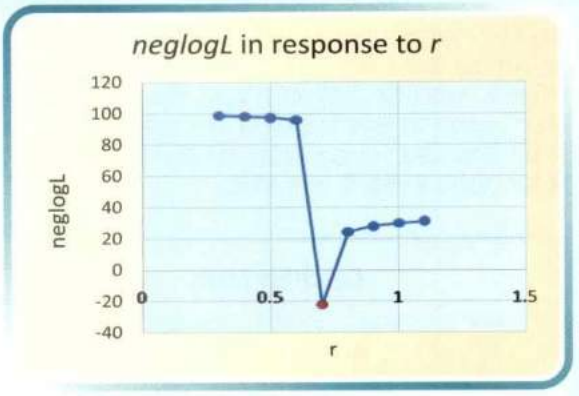

চিত্র: মডেল ফিটিং এর লাইকলিহুড প্রিসিশন

পপুলেশন ট্রেন্ড ও রেফারেন্স পয়েন্ট নির্ণয়

১৯৮৬ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত আহরণজনিত মৃত্যুহার রেফারেন্স পয়েন্ট (০.৩৫) এর ওপরে একাধারে উঠা-নামা (০.৩-০.৫২) এর মধ্যে ছিল। অতঃপর আহরণজনিত মৃত্যুহার ২০১১ এ ০.২৪ এ নেমে যায় এবং পরবর্তীতে আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত মজুদ জীবভর বায়োমাস রেফারেন্স পয়েন্ট (৯৪৫ মে.টন) এর বেশ নিচে ছিল। জীবভর ১৯৮৮ সালে ৯১২১ মে.টন ছিলো এবং পরবর্তী বছরে খুব দ্রুত অবনমিত হয়ে ৭৬০৮ মে.টন এ নেমে আসে এবং তা ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্রমাবনতি ধারা প্রদর্শন করে। ২০০৭ সাল থেকে বায়োমাস আবার বাড়তে থাকে। ২০০৭ সালে যেখানে জীবভর ছিল ৬৭২৮ মে.টন, ২০১৩ তে বৃদ্ধি পেয়ে তা ১০,৩৮১ মে.টন হয়।

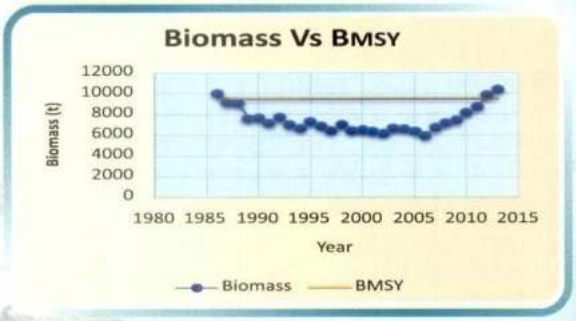

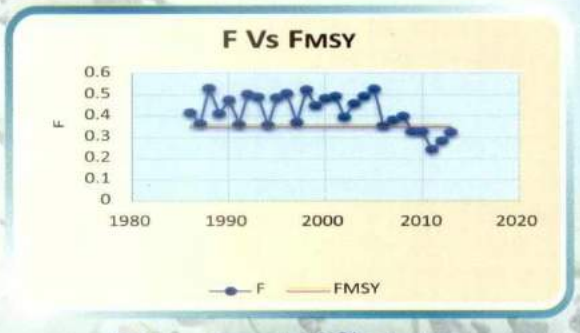

চিত্র: SPM মডেল দ্বারা নির্ণীত বায়োমাস এবং আহরণজনিত মৃত্যুহার

১৯৮৬-১৯৮৮ সালের দিকে সর্বমোট আহরণ সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ (MSY) রেফারেন্স পয়েন্ট (১৩,৩২১ মে.টন) এর উপরে ছিল এবং ২০০৫ সাল পর্যন্ত রেফারেন্স পয়েন্টের কাছাকাছি উঠানামা'র মধ্যে ছিল। ২০০৬ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সর্বমোট আহরণ রেফারেন্স পয়েন্টের কিছুটা নিচে ছিল। ২০১৩ সালে চিংড়ির সর্বমোট আহরণ আবার রেফারেন্স পয়েন্ট স্পর্শ করেছে।

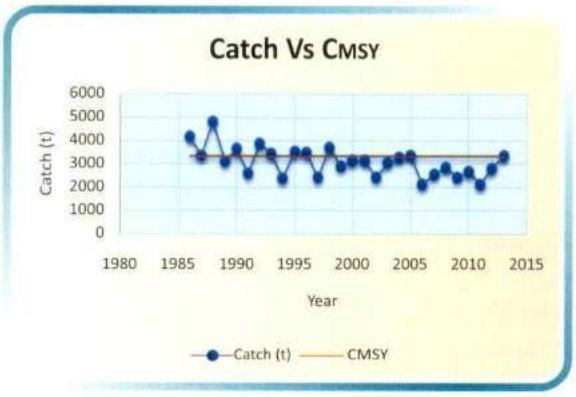

চিত্র: নির্ণীত আহরণযোগ্য বায়োমাস

আলোচনা (Discussion)

মৎস্যবিজ্ঞানীদের একটা প্রধান কাজ হচ্ছে মজুদ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট সময় পরপর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুমিত ধারণা প্রদান করা (Punt & Hilborn, ১৯৭৯)। মজুদ সম্বন্ধে ধারণার মধ্যে সহনশীল উপায়ে সর্বোচ্চ আহরণকে বুঝায়, যাতে পরবর্তী বছরে মজুদের ওপর কোনো প্রভাব না পড়ে। মজুদ নিরূপণ বা মজুদ সম্বন্ধে ধারণা কোনো চূড়ান্ত বিষয় নয়, কারণ মজুদ ঘনত্ব প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল, পপুলেশন-এর হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এবং ফিসিং এফোর্ট এর প্রকৃতি ও সংখ্যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল (King, ১৯৯৫)। বাণিজ্যিক চিংড়ি ট্রলারের ক্যাচ লগের প্রাপ্ত তথ্যের ওপর SPM মডেল ব্যবহারে যে ফলাফল পাওয়া গেছে, তা এ মডেলের দুর্বলতা এবং CPUE ইনপুট ডেটার ওপর ভিত্তি করে প্রকাশ করা যায়। সারপ্লাস প্রোডাকশন মডেল সম্বন্ধে নিম্নরূপ ধারণা পোষণ করা হয়:

- আন্তঃপ্রজাতি প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত;
- পারিবেশিক নিয়ামক পপুলেশনের ওপর ক্রিয়াশীল নয়;
- ইন্ট্রেন্সিক বৃদ্ধির হার, r পপুলেশন বায়োমাস পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকতাবিহীনভাবে ক্রিয়াশীল;
- ক্যাচাবিলিটি কো-এফিসিয়েন্ট, q অপরিবর্তনীয়;
- একটি মাত্র প্রজাতির ওপর মজুদ প্রতিষ্ঠিত;
- আহরণজনিত মৃত্যুহার ও স্বাভাবিক মৃত্যুহার একই সাথে ঘটে;
- গিয়ার বা ট্রলারের এফিসিয়েন্সি অপরিবর্তনীয়; এবং
- ব্যবহৃত ক্যাচ ও এফোর্টের পরিসংখ্যান সঠিক।

যদিও উপযুক্ত অনেকগুলো ধারণাই বাস্তবে আলোচিত মজুদের সাথে মিলে না, তবুও এ মডেল ব্যবহার করা যাবে না তা বলা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যায় ততক্ষণ এ মডেল মজুদ নিরূপণের জন্য একটি উপযোগী মডেল (Musick & Bonfil, ২০০৪), যদিও ইকোসিস্টেমের সাম্যাবস্থা অনেক সময় বজায় থাকে না (Haddon, ২০১০)। স্বতন্ত্র প্রজাতি কোনো খালি পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে না। তারা খাদ্য ও আবাসস্থলের জন্য একে অন্যের ওপর ওপর নির্ভরশীল। বহু প্রজাতি ক্রিয়াশীল পরিবেশে মজুদ নিরূপণের জন্য SPM একটি সর্বোত্তম পন্থা, যেখানে বহু প্রজাতির আহরণকে একত্র করে একটি প্রজাতি হিসেবে ধরা হয় (Jennings *et al.*, ২০০১)। এ বহু প্রজাতি আহরণকে ব্যবহৃত এফোর্টের সাথে বিভাজিত করা হয় (FAO, ১৯৭৮)। কিন্তু প্রজাতির নিজস্ব জৈবিক ক্রিয়াকলাপকে বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। অনেকগুলো ফিসারিজের মতো ট্রপিক্যাল ফিসারিজের ক্যাচে অনেকগুলো প্রজাতির বিন্যাস দেখা যায় (King, ১৯৯৫; Mennard, ২০০২)। এ ক্ষেত্রে ফিসিং এফোর্ট এমনভাবে আরোপ করতে হবে যাতে আহরণ MEY লেভেল এ থাকবে কিন্তু MSY লেভেল অতিক্রম করবে না। এর ফলে স্বল্প বৃদ্ধির প্রজাতি এবং অতিরিক্ত বৃদ্ধির প্রজাতির মধ্যে পরিবেশে একটা সাম্যাবস্থা বজায় রাখা যায় (King, ১৯৯৫)। এটা সুপারিশ করা যায় যে, বহু প্রজাতির ফিসারিজে SPM ব্যবহারের জন্য ক্যাচ ও এফোর্ট ডেটা বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে সংগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত যেখানে ফিসিং প্রেসারের ভিন্নতা রয়েছে।

কোনো মজুদ নিরূপণ কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষকে মজুদ সম্বন্ধে বাস্তবভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করা যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। এক্ষেত্রে SPM এর বেসিক প্যারামিটারগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, যা *MSY*, B_{MSY}, F_{MSY} প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা দেয়। যেকোনো মজুদে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে একট গড়মান যা দীর্ঘ সময় ধরে সম্ভাব্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ধরা হয়। *MSY* রেফারেন্স পয়েন্ট বা লক্ষমাত্রা হিসেবে B_{MSY} এবং F_{MSY} সাধারণত আদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হয় (Jacobson, ২০০২)।

SPM মডেল এর উভয় সফট্ওয়্যার প্লাটফরম দ্বারা নির্ণিত গড় B_{MSY} হচ্ছে ৯৪৬৬ মে.টন, যা দুটি বহুল আলোচিত জরিপ ফলাফলের মধ্যে অবস্থিত। বহুল ব্যবহৃত জরিপ ফলাফলদ্বয় হচ্ছে West (1979) কর্তৃক নির্ণিত ১১,০০০ মে.টন এবং White & Khan (1985) কর্তৃক ৩,৬০০ মে.টন। SPM মডেল দ্বারা নির্ণিত বছরভিত্তিক জীবভরে দেখা যায় ১৯৮৯-২০০৯ পর্যন্ত তা রেফারেন্স পয়েন্টের অনেকটা নিচে অবস্থান করছে, যেখানে ২০০২ সালে ছিল সর্বনিম্ন জীবভরে (৬২০৩ মে. টন)। পরবর্তীতে মজুদ জীবভর ক্রমঃউর্ধ্বগতি লাভ করে যা ২০১২ সালে রেফারেন্স পয়েন্ট স্পর্শ করেছে। এ বৃদ্ধিরেখা যেকোনো মজুদের জন্য অবশ্য ভাল দিক। অন্যান্য প্যারামিটার যেমন ক্যাচ ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত গড় রেফারেন্স পয়েন্ট (৩৩৯৫ মে.টন) এর মধ্যে উঠানামা করছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০১২ সাল পর্যন্ত চিংড়ি ক্যাচ সর্বদাই MSY লেভেল এর নিচে ছিল। অবশ্য ২০১৩ সালে তা MSY রেফারেন্স পয়েন্ট স্পর্শ করে। আহরণজণিত মৃত্যুহার ২০০৮ সাল পর্যন্ত সর্বদাই রেফারেন্স পয়েন্ট (০.৩৫) এর ওপরে ছিল। উপর্যুক্ত ম্যানেজমেন্ট রেফারেন্স পয়েন্টের নির্দেশকগুলো একটা তথ্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে। তা হলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাণিজ্যিক চিংড়ি ট্রলার বহরের ফিসিং প্রেসার কমানোর কারণে মজুদ জীবভর ক্রমশ উর্ধ্বগতি লাভ করছে এবং তা ২০১৩ সাল শেষে ১০,৩৮১ মে.টন হয়। একই সময়ে, ২০১৩-১৪ সালে চিংড়ি ট্রলারের আহরণ দিবস বাড়ালে চিংড়ি আহরণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, চিংড়ি ট্রলার বহরের ফিসিং এফোর্ট আর না বাড়িয়ে বিদ্যমান অবস্থা বজায় রাখাই হবে সমুচিত সিদ্ধান্ত।

[১]পরিচালক (সামুদ্রিক), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[২]পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ইলিশ উৎপাদনে নদীর পরিবেশ, জাটকা সংরক্ষণ ও অভয়াশ্রমের প্রভাব

Impact of Riverine Environment, Jatka Conservation and Sanctuary on Hilsa Production

ড. মোঃ আনিছুর রহমান[১] ও মোহাম্মদ জাহের[২]

Abstract

To increase hilsa *(Tenualosa ilisha)* production and to keep the production sustainable a study was undertaken through a project entitled 'Jatka Conservation, Alternate Income Generation for Jatka Fishers and Research'. Conservation of jatka (juveniles of hilsa) and protection of brood hilsa through declaring fish sanctuaries in the major nursery and spawning grounds of river and estuarine ecosystem for a certain period were the most fruitful and important initiatives. In addition, other interventions for protecting gravid hilsa (protection of gravid brood for mass breeding) are being implemented. During the experimental cruise (2013-2014) gradually relatively larger size (2 year plus) hilsa were found in the fishers catch and in all landing stations. Comparative percentage of spent hilsa (38.79%) observed in the spawning areas which were found 77.58% higher than base year 2003 (0.5%) indicating successful breeding of hilsa in the spawning grounds. In the year 2014 abundance of jatka was found higher (CPUE 3.04 kg/100m net/hour) than previous years and it was 223% higher than base year 2005. Complete fishing ban for 11 days in the spawning grounds showed that availability of plenty of spent fish (38.79%) in 2014 and huge number of fries and juveniles of hilsa in and around spawning grounds were indicating a positive impact on successful reproduction of hilsa. The potential new area of jatka sanctuary (ban period March-April) was found in the lower Meghna river in the Hizla-Mehendigonj area of the district Barisal. It was found that the populations are still being overexploited, although total production has been increased 75.00% in the year 2014 in comparison to the base year 2003 also indicating very positive impact of jatka and brood conservation. Larger size and higher percentage of mature fishes (maturity stage V to VI) were also found in the identified spawning grounds which indicate almost no changes of the spawning grounds. These jatka and brood hilsa protection is helping to improve the biodiversity in the estuary, coastal belt and in the Bay of Bengal region. It would be better if the ban period for hilsa could be extended up to 15 days in place of 11 days of peak breeding time of hilsa.

জাতীয় মাছ ইলিশ আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। অনাদিকাল থেকেই আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও আমিষজাতীয় খাদ্য সরবরাহে এ মাছ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় ১১% এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৩.৮৫ লক্ষ মে.টন (২০১৩-১৪) যার বাজারমূল্য প্রায় ১৭,০০০ কোটি টাকার (৪৫০ টাকা প্রতি কেজি) উর্ধ্বে। জিডিপিতে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় ১%। বিগত কয়েক দশকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে (নদ-নদীর নাব্য হ্রাস, পরিবেশ বিপর্যয়, নির্বিচারে জাটকা নিধন ও অধিকমাত্রায় ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ) ইলিশের উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পায়। এ মাছের উৎপাদন সহনশীল পর্যায়ে বজায় রাখতে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কৌশল যেমন- জাটকা সংরক্ষণ, সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ আহরণ নিষিদ্ধ, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইলিশ মাছ সারা বছরই কম-বেশি প্রজনন করলেও সবচেয়ে বেশি প্রজনন করে অক্টোবর মাসের (আশ্বিন/কার্তিক) বড় পূর্ণিমার সময়। এ সময় শতকরা প্রায় ৬০-৭০ ভাগ ইলিশ মাছই পরিপক্ব ও ডিম ছাড়ার উপযোগী অবস্থায় থাকে। আর এ সময়েই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ (মোট ধৃত মাছের ৫০-৬০%) মাছ ধরা পড়ে। একই সাথে বছরের বেশির ভাগ সময়ে নির্বিচারে প্রচুর পরিমাণে জাটকা ধরা হয়। ফলে ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও নতুন প্রজন্মের প্রবেশন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। তাই ইলিশ মাছের অবাধ প্রবেশন নিশ্চিতকরণের জন্য ৫টি নির্দিষ্ট এলাকা অভয়াশ্রম ঘোষণা করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, তেমনি অবাধ প্রজনন ও প্রাকৃতিকভাবে অধিক ডিম ও পোনা উৎপাদনের জন্য 'মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০-এর অধীনে সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে প্রধান প্রজনন এলাকায় ১১ দিন ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইলিশ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, জাটকার বিচরণক্ষেত্র ও ইলিশের প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ এবং ইলিশের আবাসস্থল নদী-মোহনার ইকোলজি বিষয়ে বিএফআরআই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উক্ত গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে নদীর পরিবেশ, জাটকা সংরক্ষণ ও অভয়াশ্রম বাস্তবায়নের প্রভাব এ প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইলিশের প্রধান প্রজননক্ষেত্র ও আহরণ নিষিদ্ধ এলাকা ও সময় (Major hilsa breeding grounds and its banned area & time)

ইলিশের প্রধান চারটি প্রজননক্ষেত্র (ঢালচর, মনপুরা, মৌলভীরচর ও কালিরচর দ্বীপ) সমন্বিতভাবে প্রায় ৭০০০ বর্গ কিমি এলাকায় প্রতি বৎসর ইলিশের প্রজনন মৌসুমে আশ্বিনের বড় পূর্ণিমার সময় মোট ১১ দিন ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জাটকার প্রধান বিচরণক্ষেত্র ও আহরণ নিষিদ্ধ এলাকা ও সময় (Major Jatka nursing grounds and its banned area & time)

প্রতি বছর নভেম্বর হতে জুন মাস পর্যন্ত জাটকা ধরার মৌসুম হলেও মার্চ ও এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ পরিমাণে (৬০-৭০%) জাটকা ধরা পড়ে। তাই নভেম্বর হতে জুন মাস পর্যন্ত অভয়াশ্রম ঘোষণার প্রয়োজন হলেও জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থা, বিকল্প কর্মসংস্থান ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে ঘোষিত ৫টি অভয়াশ্রমে নিম্নলিখিত সময়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়।

সারণি: অভয়াশ্রম এলাকা ও মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়

অভয়াশ্রমের নাম	মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়
১. নিম্ন মেঘনা নদী	মার্চ ও এপ্রিল (মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য বৈশাখ)
২. শাহবাজপুর চ্যানেল	ঐ
৩. তেঁতুলিয়া নদী	ঐ
৪. আন্ধার মানিক নদী	নভেম্বর -জানুয়ারি (মধ্য কার্তিক হতে মধ্য মাঘ)
৫. পদ্মা নদীর নিম্নাংশ	মার্চ ও এপ্রিল (মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য বৈশাখ)

ফলাফল (Results)

প্রজননোত্তর ইলিশ মাছের সংখ্যা, শতকরা হার এবং পরীক্ষামূলকভাবে ধৃত লার্ভি ও রেণু পোনা এবং জাটকার প্রাচুর্য ইত্যাদি নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রজনন সাফল্যের মাত্রা নিরূপণ করা হয়েছে। ফলাফল নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজনন সাফল্য

ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজনন সাফল্য নিরূপণ সমীক্ষায় ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে যথাক্রমে প্রায় ৩৮.৭২%, ১৭.৬২%, ৩৩.৬৯%, ৩৬.২৭%, ৩৫.৭৯%, ৪১.০২% ও ৩৮.৭৯% প্রজননোত্তর বা spent ইলিশ মাছ পাওয়া গেছে। অনুরূপ সমীক্ষায় ২০০২ ও ২০০৩ সালে যথাক্রমে ০.৫০% ও ১.৪০% প্রজননোত্তর মাছ পাওয়া গেছে। বিগত ২০০২ সালের তুলনায় ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে প্রাকৃতিক প্রজনন সাফল্যের হার যথাক্রমে প্রায় ১১%, ৭৭%, ৩৫%, ৬৭%, ৭৩%, ৭২%, ৮২.০৪% ও ৭৭.৫৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিম ও জাটকা উৎপাদনে সাফল্য

প্রজনন মৌসুমে ২০১৪ সালে ১১ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ থাকায় প্রায় ১.৬৩ কোটি ইলিশ মাছ আহরণ হতে রক্ষা পেয়েছে। আহরণরহিত ইলিশ হতে প্রায় ৪,১৭,৭৬৫ কেজি ডিম প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত ডিমের পরিস্ফুটনের হার ৫০% হিসেবে প্রায় ২,৬১,১০৩ কোটি রেণু উৎপাদিত হয়েছে এবং উক্ত রেণুর বাঁচার হার ১০% হিসেবে প্রায় ২৬,১০০ কোটি পোনা/জাটকা চলতি বছর ইলিশ জনতায় নতুনভাবে সংযুক্ত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

জাটকার তুলনামূলক প্রাচুর্য

নিম্ন মেঘনা অববাহিকায় কারেন্ট জাল ব্যবহার করে পরীক্ষামূলকভাবে জাটকা ধরা হয়। সমীক্ষায় ২০১৪ সালে প্রতি ১০০ মিটার কারেন্ট জালে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৩.০৪ কেজি জাটকা পাওয়া গেছে, যা ২০০৫ সালের তুলনায় ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে যথাক্রমে ১৬৩%, ১৪৫%, ১৬০%, ১৮৯%, ১৯১%, ১৯৫% ও ২২৩% বেশি। ইলিশ সংরক্ষণের জন্য ২০০৫ ও ২০০৬ সালে অভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (জাটকার অভয়াশ্রম) বলবৎ ছিল। কিন্তু ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে জাটকার অভয়াশ্রম ও প্রধান প্রজনন এলাকায় ১০-১১ দিন মাছ আহরণ নিষিদ্ধ থাকায় জাটকার প্রাচুর্য পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। জাটকার প্রাচুর্যের সাথে ইলিশের প্রাচুর্য সরাসরি নির্ভরশীল। জাটকা সংরক্ষণ জোরদার, অভয়াশ্রম ঘোষণা, ১১ দিন মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের ফলে ইলিশ মাছের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইলিশ উৎপাদনের সংগে বৃষ্টিপাত, পানি প্রবাহ ও তলানী পতনের সম্পর্ক

ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃষ্টিপাত, পানি প্রবাহ ও তলানী পতনের (sediment) সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। ১৯৭৮ সালের পর থেকে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে পদ্মা নদীতে পানি প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় ইলিশের চলাচল ও আবাসস্থল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৃষ্টিপাতের পরেই ইলিশের প্রাপ্যতার সাথে তলানী পতনের জোরালো ($r = ০.৭২$) সম্পর্ক পাওয়া যায়। FCD, FCDI, Land reclamation ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণসহ নানাবিধ মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পদ্মা-মেঘনাসহ অনেক নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় ইলিশের প্রজননক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সেই সাথে পরিবর্তিত হয়েছে এর বিচরণক্ষেত্র ও পরিভ্রমণ পথ। সহনশীল ইলিশ উৎপাদন বজায় রাখতে হলে অভিপ্রয়াণশীল ইলিশ মাছের চলাচল, খাদ্যগ্রহণ, প্রজনন ইত্যাদি কার্যকলাপ সংঘটিত হয় যে সংবেদনশীল জলজ পরিবেশে, সেই পরিবেশের ভৌত রাসায়নিক গুণাবলির সাথে ইলিশের প্রাপ্যতার যে নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে সেই বিষয়ে সঠিক ধারণা নিয়ে ব্যবস্থাপনা কৌশলে কাজে লাগানো আবশ্যক।

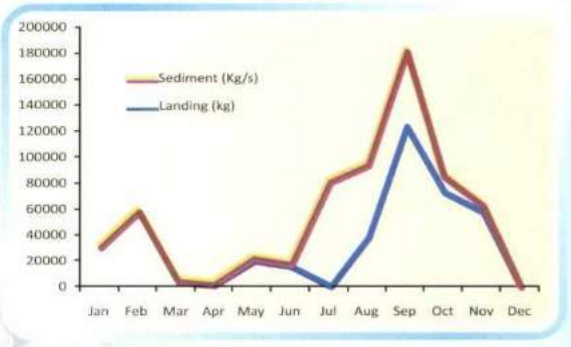

চিত্র: তলানী পতনের সঙ্গে ইলিশ প্র্যাপ্যতার সম্পর্ক

ইলিশ মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ

বাংলাদেশের প্রায় সব প্রধান নদ-নদীতেই এক সময় ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। বর্তমানে দেশের বাইরে এবং ভেতরে নানাবিধ

বাঁধ নির্মাণের ফলে পানি প্রবাহ হ্রাস, পলি ভরাট, জলজ পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি কারণে ইলিশ মাছের বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত এবং অভিপ্রয়াণ পথে বাঁধার সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যাসহ বিভিন্ন নদীতে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস হয়ে গেছে। মিরসরাই, সীতাকুণ্ড অঞ্চলে জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য, বিদেশি জহাজ কর্তৃক উপকূলীয় দূষণ ইত্যাদি দ্বারাও ইলিশ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শুধু অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না, তার যথাযথ সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রতি বছর কৃষি জমি হতে প্রায় ২,৫০০-৩,০০০ মে.টন কীটনাশক ধৌত হয়ে বিভিন্ন জলাশয়ে পতিত হচ্ছে। কয়েক সহস্রাধিক শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বিষাক্ত বর্জ্য, গৃহস্থালি ও পয়ঃনিষ্কাশনের বর্জ্য সরাসরি বিভিন্ন নদ-নদী এবং উপকূলীয় এলাকায় ফেলা হয়। পানি প্রবাহের কমতির কারণে পলিভরাট হয়ে নদীর গভীরতা কমে গিয়ে জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ প্রেক্ষাপটে, ইলিশসহ উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদকে রক্ষা করার জন্য জলজ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। ইলিশ মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্যও বিষয়টি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, নৌ-চলাচল, সেচ কার্যক্রমের জন্য নদী শাসন ও পানি ব্যবহার সম্পর্কিত জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়ন করা, পলিভরাট নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশব্যাপী বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা এবং দূষণ মাত্রা বিশ্লেষণ এবং যথাযথ বর্জ্য শোধন প্রক্রিয়া ছাড়া নতুন কলকারখানা স্থাপন বা নিবন্ধন নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। পরিবেশগত পরিবর্তন যেমন- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, জলজ দূষণ, নদীর নাব্যতা হ্রাস ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ইলিশের জীবনযাপনের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে, ডিম ধারণক্ষমতা কমে গেছে। সম্প্রতি ইলিশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অভয়াশ্রমের উত্তর প্রান্তে মেঘনার ষাটনল অঞ্চলে বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যার মিলনস্থলের অনতিদূরে এ এলাকায় মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য ঘাটতি, দ্রবীভূত অক্সিজেনের স্বল্পতা, ক্ষারকত্বের অস্বাভাবিক নিম্নমাত্রা সর্বোপরি ক্ষতিকর অ্যামোনিয়ার উপস্থিতি এবং একই সঙ্গে হীনস্বাস্থ্যের দুর্বল কিশোর ইলিশের (জাটকার) উপস্থিতি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় ইলিশ উৎপাদনের লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ, প্রজনক্ষম ইলিশ সংরক্ষণ ও অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ এ পরিভ্রমণশীল মাছের চলাচলের ও বসবাসের তথা নদী-মোহনার পরিবেশ সংরক্ষণ অতীব জরুরি।

চিত্র: সীতাকুন্ডু অঞ্চলে জাহাজ ভাঙ্গায় বর্জ্যের দূষণ

নতুন ও প্রস্তাবিত অভয়াশ্রমের সীমানা ও মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়

ইলিশ উৎপাদনে অভয়াশ্রমের প্রভাব ও জাটকার প্রাচুর্য নির্ণয়ের জন্য নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর হতে নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। পূর্বে নিম্ন পদ্মা নদীতে জাটকার প্রাচুর্য না থাকলেও পরবর্তীকালে জাটকার তুলনামূলক প্রাচুর্য বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে পদ্মা ও মেঘনা নদীর কিছু এলাকায় গবেষণা সমীক্ষায় জাটকার বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্ন মেঘনা নদীতে নিম্ন পদ্মা নদীর তুলনায় জাটকার প্রাচুর্য বেশি। সাম্প্রতিককালে পরিচালিত সমীক্ষায় নিম্ন পদ্মায়ও প্রচুর জাটকা পাওয়া যায়। এ প্রেক্ষাপটে শরীয়তপুর জেলার পদ্মা নদীর নিম্ন অংশে ২০ কিমি এলাকায় জাটকা ইলিশের অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়। উক্ত অভয়াশ্রম মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এটি বর্তমানে ৫ম অভয়াশ্রম হিসেবে পরিচিত। অব্যাহত গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে জাটকার প্রাচুর্য পর্যবেক্ষণ এবং পানির গুণাগুণ পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে জাটকার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত হয়ে বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার নাছাকাটি পয়েন্ট, হরিনাথপুর পয়েন্ট ও ধুলখোলা পয়েন্ট এবং মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার ভাষানচর পয়েন্ট অঞ্চলে মেঘনার শাখা নদী হিজলা উপজেলার ধর্মগঞ্জ ও নয়াভাঙ্গানী নদী এবং মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার লতা নদীর ৬০ কিলোমিটার এলাকায় ইলিশ/জাটকার নতুন (৬ষ্ঠ) অভয়াশ্রম ঘোষণার প্রস্তাব পেশ করা হয়। বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন, যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নতুন ঘোষণাযোগ্য এলাকার জিপিএস পয়েন্ট ও সীমানা নির্ধারণ করা হয়। নিম্নের সারণিতে এ নতুন প্রস্তাবিত অভয়াশ্রমের জিপিএস পয়েন্ট ও সীমানা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বিগত তিন বছরের পর্যবেক্ষণে ধারাবাহিকভাবে জাটকার প্রাচুর্য এবং পানির গুণাগুণসহ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার সকল বৈশিষ্ট্য পূরণ হওয়ায় এ অঞ্চলকে অভয়াশ্রম ঘোষণার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, প্রস্তাব গৃহীত হলে এটি ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম হিসেবে পরিচিত হবে।

সারণি: প্রস্তাবিত ষষ্ঠ ইলিশ অভায়শ্রমের সীমানা ও আহরণ নিষিদ্ধ এলাকা ও সময়

সীমানা		জিপিএস পয়েন্ট	মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়
উত্তর-পূর্ব	মায়ানী, মীরসরাই	উ. অ. ২২°৪২.৫৯' পূ. দ্রা. ৯১°৩২.১৫'	আশ্বিনের বড় পূর্ণিমার ৩ দিন পূর্বে ও ৭ দিন পরে মোট ১১ দিন ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ
উত্তর-পশ্চিম	পশ্চিম সৈয়দ আউলিয়া, তজুমুদ্দিন	উ. অ. ২২°৩১.১৬' পূ. দ্রা. ৯০°৪০.৫৮'	
দক্ষিণ-পূর্ব	গন্ডামারা, বাঁশখালী	উ. অ. ২১°৫৬.০৪' পূ. দ্রা. ৯১°.৫৩.০৫'	
দক্ষিণ-পশ্চিম	লতা চাপালী, কলাপাড়া	উ. অ. ২১°৪৭.৫৬' পূ. দ্রা. ৯০°১২.৫৯'	

ইলিশ মাছের সর্বোচ্চ প্রজনন সময় নির্ধারণ

গবেষণা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রতি বছর ইংরেজি মাসের (১৫ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর) পরিবর্তে আশ্বিনের প্রথম উদিত চাঁদের বড় পূর্ণিমার পূর্বের ৫ দিন, পরের ৫ দিন ও পূর্ণিমার দিনসহ মোট ১১ দিন ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজননকাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং উক্ত সময়ে প্রজননক্ষম ইলিশ ধরা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। ইতোপূর্বেও তা বাস্তবায়িত হয়ে আসছিল। কিন্তু ২০১২ সালে আশ্বিনের বড় পূর্ণিমা হয় ৩০ সেপ্টেম্বর (১৫ আশ্বিন) এবং এর পরবর্তী পূর্ণিমা হয় ২৯ অক্টোবর (১৪ কার্তিক)। তখন ইলিশের প্রধান প্রধান প্রজনন এলাকায় (মনপুরা, মৌলভীরচর, কালিরচর, ঢালচর) গবেষণা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ৩০ সেপ্টেম্বরের পূর্ণিমাতে প্রাপ্ত spent বা প্রজননত্তোর ইলিশের শতকরা হার ছিল ৩৫.৭৯% এবং ২৯ অক্টোবরের পূর্ণিমাতে ছিল ৩২.১৯%। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইলিশ মাছ আশ্বিন মাসের বড় পূর্ণিমাতে অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক ডিম ছাড়লেও পূর্ণিমার অব্যবহিত পরেও ডিম ছাড়া বহুলাংশে অব্যাহত থাকে। তাই আশ্বিনের বড় পূর্ণিমার অব্যবহিত পরের সময়কেও ডিম ছাড়ার ২য় সর্বোচ্চ সময় হিসেবে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, ২০১১ সালেও আশ্বিনের বড় পূর্ণিমা ছিল ১১ অক্টোবর (২৬ আশ্বিন) এবং তখন প্রাপ্ত spent ইলিশের হার ছিল ৩৬.২৭%। ফলে ২০১৩ সালে প্রজনক্ষম ইলিশের ডিম ছাড়ার (৪১.০২%) সময় নির্ধারণ সঠিক ছিল বলে প্রতীয়মান হয় এবং ২০১৪ সালে প্রজনক্ষম ইলিশের ডিম ছাড়ার (৩৮.৭৯%) সময় নির্ধারণও সঠিক ছিল। গবেষণায় আরও লক্ষ্য করা গেছে যে, পূর্ণিমার অব্যবহিত পূর্বের দিনগুলোর চেয়ে পূর্ণিমার অব্যবহিত পরের দিনগুলোতে ইলিশের ডিম ছাড়ার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। এ প্রেক্ষিতে ২০১১ ও ২০১২ সালে ইলিশের ডিম ছাড়ার প্রবণতা, প্রজনন হার, প্রজননক্ষেত্রে spent বা প্রজননোত্তর ইলিশের প্রাচুর্য ইত্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক ইলিশের সর্বোচ্চ ডিম ছাড়ার মৌসুম এবং প্রজননক্ষম ইলিশ ধরা নিষিদ্ধকরণের সময় পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। এ ক্ষেত্রে ইলিশের ডিম ছাড়ার সময় নির্ধারণের বিষয়টি নিম্নরূপ বিবেচনা করা যেতে পারে-

১. আশ্বিনের প্রথম উদিত চাঁদের বড় পূর্ণিমার পূর্বের ৫ দিন, পরের ৯ দিন ও পূর্ণিমার দিনসহ মোট ১৫ দিন প্রজননক্ষম ইলিশ ধরা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে। অথবা,

২. আশ্বিনের প্রথম উদিত চাঁদের বড় পূর্ণিমার পূর্বের ৩ দিন, পরের ৪ দিন ও পূর্ণিমার দিনসহ মোট ৮ দিন এবং অনুরূপভাবে ২য় পূর্ণিমার পূর্বের ৩ দিন, পরের ৪ দিন ও পূর্ণিমার দিনসহ মোট ৮ দিন অর্থাৎ ২ ধাপে সর্বমোট ১৬ দিন প্রজননক্ষম ইলিশ ধরা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে।

উল্লেখ্য, বর্তমান আইনের আওতায় প্রচলিত ১১ দিনের সঙ্গে প্রস্তাবিত আরও ৪ থেকে ৫ দিন যুক্ত করা হলে ইলিশের প্রজনন সফলতা আরো বাড়বে এবং এতে প্রতি বছর প্রায় ২৬ হাজার কোটি জাটকা ইলিশ জনতায় যুক্ত হবে। এতে করে সামগ্রিকভাবে দেশে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

ইলিশ ব্যবস্থাপনা ও সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি

বাংলাদেশে ১৯৮৩-৮৪ সাল হতে ইলিশ মাছের উৎপাদন বিষয়ক তথ্য মৎস্য অধিদপ্তরের ফিসারিজ রিসোর্স সার্ভে সিস্টেম (FRSS) কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উক্ত সূত্রের তথ্য অনুযায়ী বিগত ২০০১-০২ সালে ইলিশ আহরণের পরিমাণ ছিল ২,২০,৫৯৩ মে.টন। ২০০১-০২ সালের তুলনায় বর্তমানে (২০১৩-১৪) বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৮৫,০০০ মে.টন অর্থাৎ প্রায় ৭৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপসংহার (Conclusion)

বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন তথা- জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও প্রজননক্ষেত্রে প্রজননক্ষম ইলিশ ধরা নিষিদ্ধকরণের ফলে ইলিশের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রতি বছরই বিভিন্ন নদ-নদীতে জাটকার আধিক্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকলে অচিরেই ইলিশের মোট উৎপাদন বেড়ে গিয়ে প্রায় ৪.০ লক্ষ মে.টনে সহনশীল পর্যায়ে দাঁড়াতে পারে। ইলিশের প্রজননক্ষেত্র ও জাটকার বিচরণক্ষেত্রের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে অব্যাহত গবেষণা প্রয়োজন। নতুন প্রজননক্ষেত্র ও বিচরণক্ষেত্র শনাক্তকরণের জন্যও গবেষণা অব্যাহত রাখতে হবে। ইলিশের মাইগ্রেশন, মাইগ্রেটরি রুটের ওপর শুধু নদী নয় বঙ্গোপসাগরেও গবেষণা সম্প্রসারণ করা দরকার। বঙ্গোপসাগরে গবেষণার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের নির্মাণাধীন জাহাজের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সুদূর প্রসারী গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণ এবং আরো উন্নত ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। বঙ্গোপসাগর, উপকূলীয় এলাকা, ইলিশ সম্পর্কিত সকল নদ-নদীতে ইলিশের ব্যাপক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি জনবলের দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণও প্রয়োজন। বঙ্গোপসাগর এবং দেশের ইলিশ সমৃদ্ধ নদ-নদীতে একই সাথে ইলিশের মজুদ নিরূপণে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। ইলিশের আবাসস্থল নদ-নদী ও মোহনার পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে সহনশীল মাত্রায় ইলিশের উৎপাদন বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট আকারের বড় ইলিশ ধরার জন্যে জালের ফাঁসের আকার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। ইলিশ ধরার জন্য বিভিন্ন প্রকার জাল, নৌকা ও ইলিশ উৎপাদনে নির্ভরশীল পরিসংখ্যান নিরূপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইলিশ বিষয়ক গবেষণায় আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি আবশ্যক। জাটকা সংরক্ষণের সফল বাস্তবায়নের জন্য জেলেদের খাদ্য সহায়তা ও বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রম উপকূলের ইলিশ সম্পর্কিত সকল জেলা এবং উপজেলায় সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে প্রজননক্ষম ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইলিশ সম্পর্কিত সকল নদ-নদীর সাথে বঙ্গোপসাগরকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সেই সাথে উপকূল ও সমুদ্র এলাকায় ইলিশ সংরক্ষণজনিত আইন বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও সার্ভিলেন্স জোরদার করা প্রয়োজন।

[২]প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান ইলিশ গবেষক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর
[৩]মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

ডিজিটাল বাংলাদেশ : প্রেক্ষিত সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা

Digital Bangladesh : Marine Fisheries Survey Management Perspective

এবি এম আনোয়ারুল ইসলাম[১], মোঃ শফিকুল ইসলাম[২] ও মোহাঃ আতিয়ার রহমান[৩]

Abstract

Digitalization in marine fisheries survey management practice in Bangladesh is ongoing with some historic achievements. Procurement of a modern survey and research vessel named `RV Meen Shandhani' under IDB and GOM funded `Bangladesh Marine Fisheries Capacity Building Project of Department of Fisheries (DoF) is almost completed in Malaysia and will be delivered soon after completion of Sea Acceptance Trial (SAT). Different modern digital equipments are likely to be assembled in the vessel to operate the vessel and to conduct stock assessment survey in the Bay of Bengal. Officials of DoF will be trained for handling the equipments. Some equipments with digital features like top loading balance, slide calipers and GPS are using for conducting land based survey for biological data collection of marine fishes. A database is established by the project. Fishing craft and gear survey data are digitalized and incorporated in the Database, as well as, linked to the departmental website for mass use. Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) already established for the first time in Bangladesh for monitoring the commercial trawler fleet. Hopeful for future incorporation of digital fishing log, catch monitoring and e-catch data format in marine fisheries MCS in near future.

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, সহস্রাব্দ লক্ষ্য অর্জন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'ভিশন ২০২১' ও অধুনা 'ভিশন ২০৪১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ মৎস্য উপখাতের অর্জন উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক সময়ে অভ্যন্তরীণ মৎস্যচাষে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪র্থ স্থান ও মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে ৫ম স্থানে পৌঁছানো এর প্রমাণ। ইতোমধ্যে প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারতের সাথে বঙ্গোপসাগরের সীমা নির্ধারণী আন্তর্জাতিক আদালতের (ITLOS) যুগান্তকারী রায়ে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সদাশয় সরকার নীল অর্থনীতির (blue economy) নীতি গ্রহণ করেছেন। সমুদ্রের জলজ সম্পদের মধ্যে মাছ, চিংড়ি, লবস্টারসহ গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্যের সমাহার রয়েছে, যেগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিমূলে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনা জরুরি। সে লক্ষ্যে নীরব বিপ্লবের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ জরিপ কার্যক্রম। এ ক্ষেত্রে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ও মালয়েশিয়া সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প' ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহারে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ডিজিটাল কার্যক্রম (Digital activities)

জরিপ জাহাজ ক্রয়

'বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প' এ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের বর্তমান মজুদ (standing stock) ও সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রায় আহরণ (maximum sustainable yield) নির্ণয় করার নিমিত্ত একটি জরিপ ও গবেষণা জাহাজ ক্রয় করার সংস্থান রয়েছে। মালয়েশিয়ায় নির্মাণাধীন উক্ত আধুনিক গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আরভি মীন সন্ধানী' অতিসত্ত্বর Sea Acceptance Trial (SAT) সম্পন্ন করে বাংলাদেশে হস্তান্তর হবে বলে আশা করা যায়। অতঃপর জাহাজটির সমুদ্রে অভিযাত্রার (survey cruise) মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জরিপ কাজ শুরু করা যাবে। এ জাহাজটিতে সোনার (sonar), ফিসফাইন্ডার, রাডার, ডিপ সী ভিডিও মনিটরিং সিস্টেম, ইকোসাউন্ডারসহ উপরিতলের (pelagic) টুনা জাতীয় মাছের মজুদ নির্ণয়ের অ্যাকুস্টিক সার্ভের (acoustic survey) জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক ডিজিটাল যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করা হচ্ছে। দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উল্লিখিত ডিজিটাল যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

চিত্র: গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আরভি মীন সন্ধানী'

ল্যান্ড বেইজড সার্ভে

ভূমি হতে পরিচালিত (land based) জৈবতাত্ত্বিক জরিপের মাধ্যমে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মাছের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে মৎস্য মজুদ নির্ণয় এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। বিগত ২০১২ সাল থেকে প্রতি মাসে নির্ধারিত ৩৫টি উপকূলীয় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র হতে ২৮টি মাছ ও ৩টি চিংড়ি প্রজাতির দৈর্ঘ্য, ওজন ও পরিপক্বতার তথ্যাদিসহ জৈবতাত্ত্বিক জরিপের তথ্য-উপাত্ত

সংগ্রহকল্পে মাঠ-পর্যায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব তথ্য সংগ্রহকালে ডিজিটাল টপলোডিং ব্যালান্স, ডিজিটাল স্লাইড ক্যালিপার্স ও জিপিএস ব্যবহার করা হচ্ছে।

চিত্র: মাঠ পর্যায়ে জৈবতাত্ত্বিক জরিপের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

মৎস্য নৌযান ও জাল-সরঞ্জামাদির জরিপ

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রায় আহরণের প্রয়োজনে এবং সরকারি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার নিমিত্ত বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নৌযান ও জাল/মৎস্য-আহরণ উপকরণাদির পরিসংখ্যান জরুরি। বিগত ২০০২ সালে সমাপ্ত মৎস্য অধিদপ্তরাধীন 'উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প'-এর আওতায় সর্বশেষ জরিপ কাজ সম্পাদন করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে মৎস্য নৌযান ও জাল-সরঞ্জামাদির পরিসংখ্যানে গুণগত পরিবর্তন এসেছে বিধায় ল্যান্ডবেইজড্ জরিপের আওতায় প্রকল্পের এলাকাধীন উপকূলীয় ১৪টি জেলার ৪৯টি উপজেলা এবং চট্টগ্রাম ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৪টি মেট্রো থানায় মৎস্য নৌযান ও জাল-সরঞ্জামাদির জরিপ কাজটি জানুয়ারি ২০০৯ খ্রি. মাসে শুরু করে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত হয় এবং পরবর্তীতে হালনাগাদকরণের কাজ চলমান রয়েছে। বিগত ৩১ মার্চ ২০১৫ খ্রি. মাস পর্যন্ত হালনাগাদকৃত তথ্য মোতাবেক ১,২১১টি উপকূলীয় মৎস্যজীবী/জেলে গ্রামে মোট মৎস্য নৌযানের সংখ্যা ৬৭,৬৬৯টি। তন্মধ্যে ৩২,৮৫৯টি যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান ও ৩৪,৮১০টি অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান রয়েছে। মোট জাল-সরঞ্জামাদির সংখ্যা ১,৮৮,৭০৭টি। জাল-সরঞ্জামাদির মধ্যে নানা আকারের ফাঁস জাল, বেহুন্দি জাল, টানা জাল, বড়শি ও নানা ধরনের 'চাঁই' বা 'ফাঁদ' রয়েছে। উক্ত তথ্যাদি প্রকল্পের ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হওয়ার পরে মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.fisheries.gov.bd) প্রকল্পের অংশে সংযুক্ত করা হয়েছে। এভাবে প্রতি বছরই হালনাগাদকৃত তথ্য-উপাত্ত সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

ভ্যাসেল ট্র্যাকিং মনিটরিং সিস্টেম

সমুদ্রে মৎস্য আহরণকালে বাণিজ্যিক ট্রলার বহরের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতি ভিটিএমএস (Vessel Tracking Monitoring System) বাংলাদেশে প্রথমবারের জন্য চালু করা হচ্ছে। ভিটিএমএস হলো স্যাটেলাইটনির্ভর স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে সমুদ্রে অবস্থানকারী নৌযানের সাথে ভূমিতে অবস্থিত কন্ট্রোল রুম থেকে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপন করা যায় এবং কন্ট্রোল রুমের পর্দায় উক্ত নৌযানের অবস্থান চিহ্নিত করা যায় এবং পরবর্তীতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা যায়। বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ১০০টি ট্রলারে ভিটিএমএস সরঞ্জামাদি সংযোজন করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের চট্টগ্রামের পতেঙ্গাস্থ 'মেরিন ফিসারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট'-এ মনিটরিং-এর যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করা হয়েছে। সেখান থেকে সমুদ্রে অবস্থানরত ট্রলার বহরের গতিবিধি নজরদারী করা যাবে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ট্রলার বহরও ভিটিএমএস-এর আওতায় আনা হবে। এতে করে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকী (এমসিএস) কার্যক্রম ডিজিটাল রূপ পেলো।

ডাটাবেইজ স্থাপন

বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জরিপ কাজের যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের নিমিত্ত একটি ডিজিটাল ডাটাবেইজ স্থাপন করা হয়েছে। এ ডাটাবেইজ ব্যবহার করে ভবিষ্যতে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করা যাবে।

উপসংহার (Conclusion)

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার এ যাত্রাপথে পিছিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অদূর ভবিষ্যতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল ফিসিং লগ, ডিজিটাল ক্যাচ মনিটরিং, ই-ক্যাচ ডাটা ফর্মসহ আধুনিক ডিজিটাল যন্ত্রপাতির ব্যবহার করে বাংলাদেশে বিশ্বমানের টেকসই আহরণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ এ শুভযাত্রার লক্ষ্যে পৌঁছানোকে ত্বরান্বিত করবে।

[১]জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[২]সহকারীপরিচালক, বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[৩]সহকারীপরিচালক, বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

সামুদ্রিক মাছের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের ওপর ভোক্তারচাপ হ্রাস এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

Popularization of Marine Fish in Reducing Pressure on Inland Open Water Fishery and Conserving Biodiversity

মোঃ কদর আহমদ

Abstract

Bangladesh is blessed with both fresh and vast marine water resources. Diverse fresh water resources dwindled gradually due to various man made interventions resulting a significant number of fishes are threatened and endangered. Our Bay water is in abundance with a wide variety of fishes (475 species), except coastal people most of the Bangladeshi are not favoring to purchase or consume marine fish to mitigate the protein requirement of their family. Epidemiological studies indicated that marine fish eating populations have a lower risk for dreadful diseases like coronary heart disease (CHD), hypertension, cancer and others. Clinical studies have shown that serving oily fish rich in eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) or increasing the amount of fish in diet decrease the death rate in persons who already had one episode of myocardial infarction which suggest the protective role of fish in the secondary prevention of CHD. Marine fish is essential for normal cerebral and visual function of the premature and possibly for all age group. Unfortunately, no remarkable publicity made in Bangladesh about immense health benefit of marine fish. The unfamiliar shape, color, flavor could not be a barrier if both print and electronic media could play active role of demonstrating cooking recipe of different marine fishes. To become a healthy and talent nation like Japan as well as to conserve our fresh water biodiversity effort needed to popularize marine fish among teeming millions. This article also highlighted the mismanagement in post harvest chain and pointed out the active role are to be paid by the concerned stakeholders.

বাংলাদেশ এক সময় মিঠা পানির মৎস্যসম্পদে ভরপুর ছিল। বাঙ্গালিদের খাবারের পছন্দের তালিকায় মাছ থাকবেই এ বিচারে 'মাছে ভাতে বাঙালি' প্রবাদটির প্রচলন হয়। ছোট দেশটির মিঠা পানির মৎস্যসম্পদের ওপর অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ, উজানের দেশসমূহে এবং আমাদের পাহাড়ের গাছ নিধনের ফলে খোলা পাহাড়ের মাটি সূর্যের তাপ, বৃষ্টির পানি ও বায়ু প্রবাহের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বালু ও পলি মাটি নদীর প্রবাহে বাহিত হয়ে ভাটির দেশ বাংলাদেশে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ভরাট হয়ে মাছের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট অন্যবিধ কারণে হাওর-বাঁওড়, নদী-নালা, খাল-বিলের প্রাকৃতিক মৎস্য উৎপাদন ধীরে ধীরে কমতে থাকে। অভ্যন্তরীণ মাছের চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর পরই সামুদ্রিক মৎস্য ভাণ্ডার হতে মাছ ধরার সূত্রপাত হয়। ক্রেতা দেশের নিয়ম-নীতি এবং হ্যাসাপ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করে তাঁদের চাহিদা মোতাবেক নিরাপদ ও গুণগতমান সম্পন্ন মাছ রপ্তানি করা হয়। আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের হিমায়িত মৎস্যের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। কিন্তু আমাদের স্থানীয় বাজারে সরবরাহকৃত মাছের ল্যান্ডিং, বরফজাত, প্যাকিং, সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাছের মাননিয়ন্ত্রণ করার নিয়ম-নীতি যথাযভাবে না মানার কারণে নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে হ্যান্ডলিং করে অত্যন্ত নিম্নমানের মাছ ভোক্তার কাছে পৌঁছে। আহরণোত্তর এ অব্যবস্থাপনাও সামুদ্রিক মাছের জনপ্রিয়তা কম হওয়ার জন্য দায়ী। এ কথা মানতে হবে যে, প্রয়োজনীয় জনবল এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে স্থানীয় বাজারে সরবরাহকৃত মাছের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটেনি। তবে স্থানীয় বাজারে সরবরাহকৃত মৎস্যের মাননিয়ন্ত্রণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে এবং উন্নয়নের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা খাতে রোগ নির্ণয়, রোগ নিরাময়, হাসপাতাল এবং ঔষধ শিল্পে লক্ষণীয় উন্নয়ন হয়েছে। মাঝারি বা বড় ধরনের রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের জন্য এখন আর বিদেশে যেতে হয় না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এত রোগবালাই হওয়ার কারণ কী? অসংখ্য ঔষধের দোকান, রোগ নিরাময় ক্লিনিক, ডায়োগনস্টিক সেন্টার বা হাসপাতালে রোগীর সারি কেন এত দীর্ঘ হচ্ছে? একটু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে খোঁজ করলেই উত্তর পাওয়া যাবে- অনিরাপদ বা ভেজাল খাবার গ্রহণ এবং রোগ প্রতিরোধক ও শরীরের অত্যাবশ্যকীয় ক্ষয়পূরণের জন্য সহজলভ্য পথ্য না খাওয়াই এ জন্য দায়ী। এ নিবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে সহজলভ্য ও অবহেলিত খাবারের ওপর এখানে আলোচনা করা হয়েছে। আর সহজলভ্য এবং অবহেলিত খাবারটি হলো সামুদ্রিক মাছ।

উৎস অনুযায়ী বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন
(Sourcewise Fish Production)

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৩৯,২৫,০০০ হেক্টর, বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৭,৭৪,০০০ হেক্টর এবং সামুদ্রিক জলাশয়ের পরিমাণ ১,৬৬,০০,০০০ হেক্টর। মুদ্রিত তথ্যানুযায়ী এ তিন ধরনের জলাশয় হতে ১৯৮৩-৮৪ সালে মাছের উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মে.টন এবং তিন দশক পর ২০১১-১২ সালে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩২.৬২ লক্ষ মে.টন। নিম্নে উপরের পাই চার্টের মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের বিশাল সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ থাকা সত্ত্বেও আহরণের পরিমাণ একই বা তুলনামূলকভাবে কমছে।

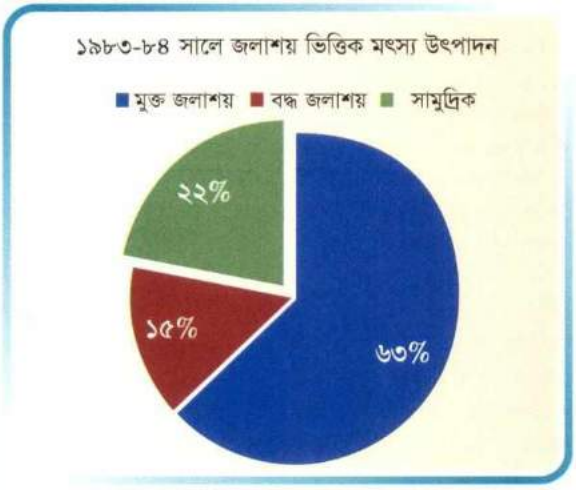

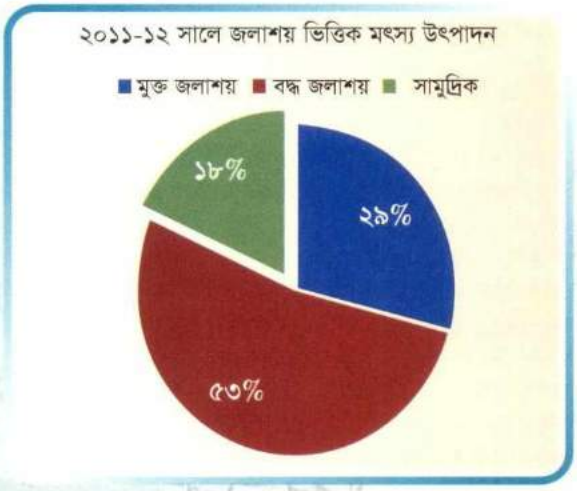

উৎস: জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ সংকলন ২০১৩

সামুদ্রিক মাছের জনপ্রিয়তা কম হওয়ার কারণ
(Reasons of marine fish non-popularization)

বর্তমানে হাওর-বাঁওড়, খাল-বিল ও নদী-নালার মিঠা পানির ছোট, বড় বা মাঝারি আকারের মাছ সাধারণ ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতার নাগালের বাইরে। এমতাবস্থায় অসচ্ছল ভোক্তাগণ তাঁদের পরিবারের সদস্যগণের আমিষের ঘাটতি হবে জেনেও প্রয়োজনের অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ মাছ ক্রয় করেন অথচ একই বাজারে সস্তায় প্রচুর পুষ্টিগুণ সম্পন্ন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় ভরপুর সামুদ্রিক মাছ কেনা হতে বিরত থাকেন। সামুদ্রিক মাছের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ আয়োজন, র‍্যালি, সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, লিফলেট, পুস্তিকা প্রণয়ন, এমনকি টিভি চ্যানেলসমূহে তেমন কোনো অনুষ্ঠান প্রচার হতে দেখা যায় না। উপকূলবর্তী লোকজন ব্যতীত অধিকাংশ জনসাধারণের কাছে সামুদ্রিক মাছ অপরিচিত এবং সে সব মাছের আকৃতি-প্রকৃতি, ঘ্রাণ, দৈহিক গঠন ও চেহারা মিঠা পানির মাছের ঘ্রাণ, আকৃতি ও চেহারা হতে ভিন্ন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা বিদঘুটেও বটে। তাই অধিকাংশ ভোক্তা সামুদ্রিক মাছ ক্রয় করতে চান না। এছাড়া সামুদ্রিক মাছের রন্ধন প্রণালিও অধিকাংশ গৃহিণীর কাছে রয়েছে অজানা।

রোগ প্রতিরোধ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সামুদ্রিক মাছের পুষ্টিগুণ
(The Nutritive quality of marine fish in health issues)

সামুদ্রিক মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও পুষ্টিমানের বিচারে জনহিতকর তথ্য বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণের কাছে আজও পৌঁছেনি। সামুদ্রিক মাছে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অতি প্রয়োজনীয় রোগ প্রতিরোধক 'ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড' রয়েছে যা মানুষের শরীর স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপাদন করতে পারে না। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে ইকোসা-পেন্টায়নিক এসিড (ইপিএ) এবং ডকোসা-হেক্সায়নিক অ্যাসিড (ডিএইচএ) বিভিন্ন রোগ যেমন- হৃদরোগ, গিট ব্যথা, মানসিক অবসন্নতা, বহুমূত্র, আত্মহত্যার প্রবণতা, পার্কিনসন্স, উচ্চ রক্তচাপ কমানোসহ রক্তে কোলেস্টেরল প্রতিরোধক হিসেবে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও রক্তনালীতে রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিহত করে, হৃৎপেশী এবং রক্তনালীর প্রাচীরের কোষকে উজ্জীবিত রাখে। বয়স্কদের হৃৎপিণ্ডের সুস্থতা, স্তন, বৃহদান্ত্র ও প্রস্টেট গ্রন্থির ক্যান্সার প্রতিরোধ, এমনকি মানসিক সুস্থতা বিধানে সামুদ্রিক মাছ ও সামুদ্রিক মাছের তৈল অত্যন্ত কার্যকর। পাশ্চাত্যের অনেক গবেষণা হতে দেখা যায় যে, সামুদ্রিক মাছের তৈল বা মাছ খেলে ছোট বাচ্চাদের মেধা এবং চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। আমেরিকার হার্ট অ্যাসোসিয়েশন হৃদরোগীদের ব্যবস্থাপত্রে এক গ্রাম ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডস্ থাকে এমন পরিমাণের সামুদ্রিক মৎস্য খাওয়ার পরামর্শ দেন। এছাড়াও স্বাস্থ্যবানদের সপ্তাহে অন্তত ২ বার সামুদ্রিক মৎস্য খাওয়ার সুপারিশ করেন। আমরা প্রতিনিয়ত উদ্ভিদজাত ভোজ্য তেলে ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড (আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড) ২:১ হতে ৪:১ অনুপাতে খাচ্ছি; অতিরিক্ত ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড অর্থাৎ বেশি বেশি উদ্ভিদজাত ভোজ্য তেল খেলে রক্তনালীতে রক্ত জমাট বাঁধাসহ বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জিজনিত প্রদাহ এবং ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ছোট বাচ্চাদের মেধা ও চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি, বয়স্কদের বিভিন্ন গ্রন্থির ক্ষরণ কম হওয়াজনিত বিভিন্ন

ধরনের শারীরিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখাসহ স্বাস্থ্যবানদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সামুদ্রিক মাছের বিকল্প নেই। কিন্তু প্রচারণার অভাবে ইলিশ ও রূপচান্দা মাছ ব্যতীত অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ আজও আপামর জনসাধারণের কাছে অবহেলিত। এশিয়ার মধ্যে জাপানিরাই সবচেয়ে বেশি সামুদ্রিক মাছ খায়; ফলে ঐ দেশের জনসাধারণের রোগবালাই কম এবং মেধা ও মননে তারা উন্নত ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। সর্বোপরি তাদের জনগণের গড় আয়ু বেশি বা শতায়ু জনগণের সংখ্যা অন্যান্য উন্নত বিশ্বের তুলনায় বেশি। সুতরাং সুস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের সকলেরই কম বেশি সামুদ্রিক মাছ খাওয়া উচিত।

চিত্র: সমুদ্র হতে ট্রলারে আহরিত সামুদ্রিক মাছ ডেকে আনলোড ও বাছাই কার্যক্রম

সামুদ্রিক মাছ আহরণ ও সংরক্ষণ
(Marine fish harvest and preservation)

আমাদের দেশে সামুদ্রিক মাছ ধরা হয় সাধারণত গভীর সমুদ্রে অর্থাৎ উপকূল হতে অনেক দূরে। এ ধৃত মাছের পুষ্টিমান বজায় রাখতে বরফজাত বা হিমায়িত করা হয়। বেশি মাছ আমাদের দেশের ভোক্তাসাধারণ প্রচলিত ভুল ধারণা থেকে এ ধরনের কালচে বা লালচে দাগযুক্ত সামুদ্রিক মাছের ব্লক কিনতে অনাগ্রহী। যদিও ব্লকের এ কালচে ও লালচে দাগগুলো বরফ গলানোর পর আর থাকে না। সামুদ্রিক মাছ ল্যান্ডিং-এর সুব্যবস্থা না থাকায় এ মাছ প্রথমে ট্রলার হতে নৌকায় আবার নৌকা হতে উপকূলে উঠিয়ে হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়। এ দীর্ঘ সময় ধরে লোডিং ও আনলোডিং কার্যক্রমে মাছের তাপমাত্রা বেড়ে মাছের গঠন, আকার ও চেহারাতে বেশ পরিবর্তন আসে। এছাড়া দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে এক সাথে যখন অনেক জাহাজ/ট্রলার কূলে ভিড়ে তখন মাছ সংরক্ষণের হিমাগার অপ্রতুল হয়ে পড়ে। ট্রলারের ধৃত মাছের তুলনায় উপকূলে হিমাগারের স্থান কম হওয়ায় স্থানীয় বাজারে সরবরাহকৃত মাছ অত্যন্ত অবহেলিত ও অপরিষ্কার পরিবেশে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করতে দেখা যায়। এ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত অব্যবস্থাপনার জন্য সামুদ্রিক মাছের সার্বিক পুষ্টিমান, চেহারা ও গঠনে বেশ পরিবর্তন ঘটে এবং ক্রেতাকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়।

চিত্র: বরফজাত এবং হিমায়িতকরণ ট্রলারে আহরিত মাছের বাজারজাত করার পূর্বের অব্যবস্থাপনার দৃশ্য

অল্প স্থানে সংরক্ষণের জন্য বড় বড় ব্লকে হিমায়ন করা হয়। এসব বড় বড় ব্লক হিমায়িত হতে ৮ ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে। এমতাবস্থায় হিমায়নকালে মাছের ফুলকার নরম কোষ ফেঁটে রক্ত বের হয়। এ রক্ত হিমায়ন প্রক্রিয়ায় পানির সাথে জমাট বেঁধে গোটা মাছের ব্লককে কালচে বা লালচে করে ফেলে। এ বাহ্যিক পরিবর্তন হিমায়ন প্রক্রিয়ার অংশ। কিন্তু

সামুদ্রিক মাছের আহরণোত্তর অব্যবস্থাপনা উত্তরণের উপায়
(Probable ways of uplifting post-harvest care)

মাছের খাদ্যমান বা পুষ্টি ধরে রাখা এবং রোগ প্রতিরোধক গুণাবলি কার্যকর রাখার জন্য উন্নত ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত হিমাগারের প্রয়োজন। পোতাশ্রয়ের কাছে মাছ সংরক্ষণের হিমাগার প্রতিষ্ঠা একটি লাভজনক ব্যবসা।

এ জনহিতকর ও লাভজনক ব্যবসায় শিল্পপতিদের এগিয়ে আসা উচিত। সরকার ভবিষ্যতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের জন্য ট্রলারের লাইসেন্স বরাদ্দকালে উদ্যোক্তা কর্তৃক ট্রলারে ধৃত মাছ উপকূলে নিজস্ব হিমাগারে সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতাই উক্ত মাছের আহরণোত্তর অব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য সহায়ক হবে। এছাড়া বরফজাত বা হিমায়িত সামুদ্রিক মৎস্য বাজারজাত করার জন্য তাপনিরোধক কেবিনেট ব্যবস্থা সামুদ্রিক মাছের স্বাদ, আকার, প্রাকৃতিক আস্বাদ সংরক্ষণ করে গ্রহণযোগ্যতা বা জনপ্রিয়তা বাড়াতে সহায়ক হবে।

চিত্র: জাপানের বাজারে বাজারজাত বরফায়িত ও হিমায়িত বিভিন্ন প্রজাতীয় সামুদ্রিক মাছ

সামুদ্রিক মাছের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লাভ
(The direct and indirect benefits of popularizing marine fish)

সামুদ্রিক মাছের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে মৎস্য উৎপাদন ও জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কতিপয় লাভ যেমন- (১) মিঠা পানির মাছের উপর ভোক্তার চাপ কমবে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে; (২) দাম কমা জনিত কারণে অতি কষ্টে আহরিত অপরিণত বয়সের মাছ ধরা হতে জেলেরা বিরত থাকবে; (৩) মিঠা পানির জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে; (৪) সামুদ্রিক মাছে ভোক্তার রোগ প্রতিরোধ, মেধাশক্তি বৃদ্ধি তথা জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে; (৫) মিঠা পানির মাছে ফরমালিন বা অন্যবিধ প্রিজারভেটিভ ব্যবহার হ্রাস পাবে; (৬) সামুদ্রিক মাছ আমদানি কমার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে; (৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালত (ITLOS)-এর মাধ্যমে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গোপসাগরে ১,১৮৩ লক্ষ বর্গ কিমি এলাকার মৎস্য আহরণের অপার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; (৮) জনপ্রতি মাছের প্রাপ্যতা ৪৫ গ্রাম থেকে ৫৬ গ্রামে উন্নীতকরণ সহজ হবে; (৯) স্বাদু পানির অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত মাছ বেশি মূল্যে রপ্তানি করে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং (১০) আবাদী জমিতে মৎস্য চাষের পুকুর তৈরির প্রবণতা হ্রাস পাবে।

সামুদ্রিক মাছের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করণীয়
(The do's of popularizing marine fish)

জনসাধারণের মধ্যে সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও আধুনিক মৎস্য ট্রলার মালিকদের যৌথ পরিচালনায় একটি প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে Seafish Gril Corner, Seafish Evening, Fried Sardine, Seafish Packora ইত্যাদি অনুষ্ঠান জেলা সদরে আয়োজন করা যেতে পারে। ট্রলার মালিকগণ তাঁদের আহরিত মৎস্যপণ্য ভোক্তাশ্রেণির জন্য Consumer pack এ সঠিকভাবে হিমায়িত করে বাজারজাত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার প্রবণতা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

চিত্র: ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডস্ সমৃদ্ধ সামুদ্রিক মাছ - সুস্বাদু ইলিশ এবং সার্ডিন

মিঠা পানির মাছ ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী রান্না করার কৌশল সকল রাঁধুনীর জানা আছে কিন্তু সামুদ্রিক মাছ সুস্বাদু করে রান্নার কৌশল অধিকাংশ মহিলা বা পাচকের জানা নেই। আজকাল দু'একটি টিভি চ্যানেলে ধনিক শ্রেণির ভোজন বিলাসীদের চিতল মাছের কোপ্তা, ইলিশ মাছের সরষে বাটা, লবস্টার বা গলদা চিংড়ির কারী ইত্যাদি রান্না করার কৌশল সম্প্রচার করতে দেখা যায়। এ লেখার মাধ্যমে সকল টিভি চ্যানেল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে চাই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক ছোট মাছ সার্ডিন বা চাপিলা, কলম্ব, চিরিং, পোয়া, কালচান্দা, দাতিনা, ছুরি, চইখ্যা, কাঁটা, কামিল্যা, রূপবান, রাঙ্গা চইখ্যা, নিলাম্বরি, লাল মাছ, মাইট্টা, লইট্টা, আইল্যা, হাঙ্গর, কাঁকড়া ও স্কুইড এর রান্না কৌশল বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে সম্প্রচার করলে বাংলাদেশে সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার প্রবণতা বাড়বে, একই সাথে ভোক্তার স্বাস্থ্যের সার্বিক পুষ্টি বিধান, অন্যদিকে মলদ্বার, প্রস্টেট গ্রন্থি ও স্তন ক্যানসার, হৃদরোগ, গিট ব্যথা, বিষন্নতা, আত্মহত্যার প্রবণতা, পারকিনসন্স, অ্যাজমা, কিডনি রোগ, বহুমূত্র, উচ্চ রক্তচাপ জাতীয় বহুবিধ রোগের প্রকোপ কমবে। অপরদিকে সন্তান সম্ভবা মায়ের উদরজাত বাচ্চা এমনকি ছোট বাচ্চাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি এবং মেধা বা স্মরণ শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কর্মঠ ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাতি গঠনে সামুদ্রিক মাছ অনেক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

অনেকে হয়তো বলতে পারেন 'সামুদ্রিক মাছ' কি সর্বরোগের মহৌষধ? সর্বরোগের মহৌষধ না হলেও বার্ধক্যের কারণে শরীরের অধিকাংশ গ্রন্থির নিঃসরণ কমে আসা এবং বার্ধক্যজনিত উদ্ভূত অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রশমনে সামুদ্রিক মাছ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। প্রসূতি মায়েরা সামুদ্রিক মাছ খেলে তাঁদের গর্ভস্থ সন্তান ও ছোট বাচ্চাদের মেধা এবং স্মরণ শক্তি বাড়ে। এক সমীক্ষায় দেখা যায় দ্বীপদেশ সমূহে ছেলে বাচ্চার সংখ্যা বেশি অর্থাৎ সামুদ্রিক মাছ খেলে এ আকাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়। বাচ্চাদের মেধা বিকাশের জন্য উন্নত বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও বিভিন্ন নামে ওমেগা-৩ ক্যাপসুল পাওয়া যায়। যার প্রতিটি ক্যাপসুলের দাম ২০-২৫ টাকা। সামুদ্রিক মাছের পুষ্টিমান এবং রোগ প্রতিরোধক গুণাবলি উন্নত বিশ্বের গবেষণাগারে পরীক্ষিত এবং সে সব দেশের স্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রতিপালিত হচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকার হাসপাতালসমূহে ভোজ্য তেল সমৃদ্ধ ফুড খাওয়াজনিত মুটিয়ে যাওয়া হতে পরিত্রাণের জন্য হাসপাতালসমূহে রোগীদের প্রতিনিয়ত সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে।

চিত্রঃ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছের গ্রিল দেশীয় পর্যটকদের রসনা বিলাসের যোগান দিচ্ছে

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছের পুষ্টিমান এবং রোগ প্রতিরোধক গুণাবলি সম্বলিত প্রচারপত্র জনসাধারণের মধ্যে বিলি এবং টিভি চ্যানেল সমূহে সেসব মাছের রন্ধন প্রণালি সম্প্রচার সামুদ্রিক মাছের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি তথা জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখবে। বাচ্চাদের মেধা ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি এবং বয়স্কদের হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, অত্যধিক কোলেস্টেরলজনিত সমস্যা ও অন্যান্য রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধে খাবার তালিকায় সামুদ্রিক মাছ রাখার পরামর্শ প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহায়তা চাওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশ সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার মালিক সমিতিকে তাঁদের ট্রলারে ধৃত মাছের যথাযথ হিমায়ন, ভোক্তা সাধারণের উপযোগী প্যাকিংসহ সামুদ্রিক মাছের সার্বিক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে এগিয়ে আসা উচিত। সামুদ্রিক মাছের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটবে, অভ্যন্তরীণ মিঠা পানির মাছের ওপর চাপ কমবে এবং স্বাদু পানির মাছের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়ক হবে।

মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কৌশল

Agro-Fish Friendly Sluice Gate Management Technique for Biodiversity Conservation

মোঃ আবুল হাশেম[১] ও মোঃ তৌহিদুর রহমান[২]

Abstract

Bangladesh is a delta land full of rivers, canals, beels, baors, haors, floodplain etc. To grow more food the flood protected dams and embankments have been made by Bangladesh Water Development Board along with the main rivers. Sluice gate has been built in these embankments to control the water flow between the rivers and floodplains. Agricultural production has been increased due to the flood protection through the sluice gates. Meanwhile, fish breeding and nursing have been hampered due to blocking the fish migration within beels and rivers. So, wetland biodiversity has been seriously deteriorated in all over the country. To ensure the wetland biodiversity the sluice gates should be operated through agro-fish friendly management.

বাংলাদেশ ছোট-বড় অসংখ্য নদী বিধৌত ও পলিবাহিত একটি দেশ। এদেশে রয়েছে হাজারো উন্মুক্ত জলাশয় যেগুলো নদী, বিল, বাঁওড়, হাওর, প্লাবনভূমি, খাল, ইত্যাদি নামে পরিচিত। এক সময় বিস্তৃত জলাভূমিসমূহ জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ ছিল এবং জলাভূমিসমূহে মিঠা পানির বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, বৈচিত্র্যময় জলজ বৃক্ষ ও আগাছা এবং জলজ প্রাণী অনেক পাওয়া যেত। পদ্মা-যমুনার সংগমস্থলসহ পদ্মার উজানে ইলিশের প্রাচুর্য ছিল। যমুনা নদীর পুরো বিস্তৃতি জুড়েই প্রজনন মৌসুমে রুইজাতীয় এবং দেশীয় মাছের ডিম, রেণু পোনা প্রাকৃতিকভাবেই পাওয়া যেত। যমুনায় এক সময় মিঠা পানির একমাত্র কুমির জাতীয় প্রাণী ঘড়িয়াল (*Gavialis gangeticus*) দেখা যেত। এছাড়া মিঠাপানির ডলফিন তথা শুশুক (*Platenista gangetica*)-এর বিস্তৃতি ছিল পুরো যমুনা ও পদ্মা জুড়ে।

প্লাবনভূমির অন্তর্গত বিল, দহ, কোল ও কুয়ায় অবাধে বিচরণ করত দেশীয় প্রজাতির মাছসহ নানাবিধ জলজ প্রাণী। পরিযায়ী পাখিসহ দেশীয় প্রজাতি পাখির অভয়ারণ্য ছিল এ অঞ্চলের জলাভূমিগুলো। জলজ বন (swamp forest) ও গাছপালায় সমৃদ্ধ ছিল জলাভূমি ও প্লাবনভূমি অঞ্চলগুলো। কিন্তু আজ সেই সমৃদ্ধ জলজ এলাকা (water areas) ও জীববৈচিত্র্য মৃতপ্রায় অতীত।

নদী শাসন ও নিয়ন্ত্রিত পানি ব্যবস্থাপনার কারণে এ এলাকার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ এখন বাধাগ্রস্ত। স্লুইস গেইটের মাধ্যমে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় জলাভূমির অন্তর্গত বিল ও খালগুলোর স্বাভাবিক পানি প্রবাহ থাকে না। ফলে পলি ভরাট, বিলের গভীরতা হ্রাস, নদীর সাথে সংযোগ খাল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, ইত্যাদি পরিবর্তন ঘটছে। পাশাপাশি কৃষিজ জমির বিস্তারের কারণে জলায়তন ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। মৎস্য ও জলজ জীববৈচিত্র্য আশঙ্কাজনকভাবে কমে আসছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক দেশব্যাপী ৫৬৩টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের আওতায় ১,৩০০ কিমি বাঁধ ও ৪,১৯০টি স্লুইস গেইট বা রেগুলেটর তৈরি করা হয়েছে। ফলে প্রায় ৫.৫ মিলিয়ন হেক্টর জমি সরাসরি চাষাবাদের আওতায় এসেছে। এ সব স্লুইস গেইট মৎস্য উৎপাদন ও প্রজাতি বৈচিত্র্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সে কারণে কৃষি ও মৎস্যবান্ধব উপায়ে এ সব স্লুইস গেইট ও রেগুলেটর ব্যবস্থাপনা খুবই জরুরি। গবেষণা থেকে দেখা যায়, মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা একই সঙ্গে মাছের উৎপাদন ও প্রজাতি বৈচিত্র্য বাড়াতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

চিত্র: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত স্লুইস গেইট

জলাভূমিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের নিমিত্ত কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কৌশল নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

শুষ্ক মৌসুমে বিল/জলাভূমিতে পানি রাখা
(Retain water in wetlands during dry season)

রবি শস্য আবাদের জন্য আশ্বিন মাসের প্রথমভাগ হতে স্লুইস গেইট খুলে বিল জলাভূমির প্রায় সম্পূর্ণ পানি বের করে দেয়া হয়। অনেক সময় নদী, খাল, বিল/জলাভূমি সেচ দিয়ে পানি শুকিয়ে রবিশস্য আবাদ করা হয়। ফলে মাছসহ সকল জলজ প্রাণী এবং গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হয়। মাছসহ সকল জলজ সম্পদের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখার জন্য খাল/বিল/জলাভূমির নিচের অংশে পানি রাখা প্রয়োজন। খাল-বিলের নিচু অংশে পানি থাকলে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের পরিবর্তে এখান হতে অল্প খরচে রবি শস্যে সেচও প্রদান করা যেতে পারে।

বোরো ধান চাষে সেচের পানি সাশ্রয় (Water saving in boro paddy culture)

আমাদের দেশে কৃষকদের ধারণা ইরি-বোরো ধান রোপণের পর হতে ধানে ফুল আসা পর্যন্ত ক্ষেতে অল্প পরিমাণ পানি ধরে রাখলে ফসল বেশি হবে। এজন্য কৃষকগণ ক্ষেতে ০.৫-১ ইঞ্চি পানি ধরে রাখার চেষ্টা করে। ফলে বোরো ধান চাষে অধিক পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয় (১ কেজি ধান উৎপাদনের জন্য প্রায় ১০-১২ লিটার)। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে ইরি-বোরো ধান পর্যায় ক্রমিক 'শুকানো এবং ভিজানো পদ্ধতি (Wet and dry method)'-এ চাষ করলে ফলন প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে বৃদ্ধি পায়, পানি খরচ প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে, পানির ব্যাপক সাশ্রয় হয় এবং একই পরিমাণ পানি দিয়ে সেচ সুবিধা প্রায় দ্বিগুণ করা সম্ভব হয়।

কম পানির প্রয়োজন এরূপ শস্যের আবাদ বৃদ্ধি (Less water absorbing crop pattern)

আমাদের দেশে শুষ্ক মৌসুমে বোরো ধান চাষে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। গবেষণায় দেখা যায় ১ কেজি বোরো ধান উৎপাদনের জন্য ১০-১২ লিটার পানির প্রয়োজন হয়। বোরো ধান চাষে সেচ, সার ও কীটনাশকের খরচ অনেক বেশি। অপরদিকে পেঁয়াজ, রসুন, কলাই, ইত্যাদি ফসল চাষের জন্য সেচ, সার ও কীটনাশকের খরচ তুলনামূলক কম। এসব ফসল চাষে, বোরো ধানের চেয়ে অনেক কম পরিমাণ পানির প্রয়োজন এবং লাভ বেশি। তাই সম্ভাব্য স্থানে বোরো ধান চাষের পরিবর্তে এসব শস্যের আবাদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

মাছের প্রজনন মৌসুমে বিল/জলাভূমিতে পানি রাখা (Ensure water in wetlands during fish breeding season)

আমাদের দেশের প্রায় সব ধরনের মাছ, শামুক-ঝিনুক ইত্যাদির প্রজনন বা ডিম ছাড়ার মৌসুম হচ্ছে বৈশাখ হতে শ্রাবণ মাস। আমাদের দেশীয় মাছ কৈ, শিং, পুঁটি, চেলা-মলা, গুলশা, টেংরা, শোল, বোয়াল বদ্ধ পানিতে ডিম দেয়। এসব মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিলে/জলাভূমির নিচু অংশে পানি রাখা প্রয়োজন। ফসল বিন্যাস পর্যালোচনা করে এ সময় স্লুইস গেইট খুলে সহনশীল পর্যায়ে পানি প্রবেশ করানো আবশ্যক।

প্রাকৃতিক উৎসের রেণু-পোনা এবং 'মা' মাছ প্লাবনভূমিতে প্রবেশের সুযোগ প্রদান (Easy access of natural fish fry and brood in flood plain)

আমাদের দেশের রুইজাতীয় মাছ (রুই, কাতলা, মৃগেল, ঘনিয়া ইত্যাদি) এবং অনেক প্রজাতির ছোট মাছ প্রবাহমান পানিতে (নদ-নদীতে) ডিম ছাড়ে। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ হতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত পদ্মা-যমুনা নদীতে এসব মাছের প্রচুর পরিমাণ রেণু পোনা পাওয়া যায়। সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এসব রেণু পোনা বিভিন্ন খাল-নদী দিয়ে প্রকল্প এলাকায় প্রবেশ করত এবং প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন স্বাদের রকমারী মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে এসব মাছ বিলুপ্তপ্রায়। এছাড়া বর্ষা মৌসুমে নতুন পানির সাথে বিভিন্ন প্রজাতির 'মা' বা ডিমওয়ালা মাছ সেচ প্রকল্প এলাকার জলাভূমিতে প্রবেশ করে ডিম দিত। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্প এলাকায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মাঠের ফসল বিন্যাস বিবেচনা করে স্লুইস গেইট খুলে পানি প্রবেশ করানো প্রয়োজন।

চিত্র: স্লুইস গেইট দিয়ে পানি প্রবাহমান

ফসল বিন্যাস, মাছের প্রজনন ও প্রবেশন (Cropping pattern, fish breeding and recruitment)

প্রকল্প এলাকার কৃষি/শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্যান্য সকল প্রকার জলজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়ে স্লুইস গেইট খোলা ও বন্ধ করা প্রয়োজন। মাছের প্রজাতিভেদে প্রজনন মৌসুম বা সময়ের কিছু ভিন্নতা রয়েছে। তবে আমাদের অধিকাংশ দেশীয় মাছ আবহাওয়া এবং বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে সাধারণত বৈশাখ হতে ডিম দেয়া শুরু করে এবং আষাঢ়-শ্রাবণ মাস পর্যন্ত ডিম দেয়। কয়েকটি প্রজাতির মাছ বছরে একবার ডিম ছাড়ে আবার অনেক প্রজাতির মাছ বিশেষভাবে ছোট আকারের মলা, চেলা, চাপিলা, পুঁটি ইত্যাদি বছরে একাধিকবার ডিম ছাড়ে। কয়েকটি প্রজাতির মাছ আবদ্ধ জলাশয় বা বদ্ধ পানিতে ডিম ছাড়ে আবার কিছু প্রজাতি বিশেষভাবে রুইজাতীয় মাছ প্রবাহমান পানিতে ডিম ছাড়ে। আবদ্ধ জলাশয়ে রুইজাতীয় মাছের পেটে ডিম হলেও এরা এসব স্থানে ডিম ছাড়ে না। তাই হরমোন ইনজেকশন দিয়ে ট্যাংক বা পানির আধারে স্রোতের সৃষ্টি করে প্রণোদিতভাবে এ সকল মাছের ডিম সংগ্রহ করে পোনা উৎপাদন করা হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে রুই জাতীয় মাছ আঁকাবাঁকা প্রবাহমান নদীতে ডিম ছাড়ে। চট্টগ্রাম জেলার হালদা নদী ছাড়া আমাদের দেশের অভ্যন্তরে রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন বা ডিম ছাড়ার ক্ষেত্র নেই। সাধারণত মে মাসের ২য় অর্ধে (জ্যৈষ্ঠ মাস) অমাবশ্যা বা পূর্ণিমার সময় বজ্রপাতসহ মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলে রুই জাতীয় মাছ প্রজনন করে থাকে। পদ্মা ও যমুনা নদীতে রুই জাতীয় মাছের যেসব রেণু/পোনা সংগ্রহ করা হয় তা ভারত হতে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর পানির স্রোতের সাথে আমাদের দেশের নদ-নদীতে আসে। পরের পৃষ্ঠার সারণিতে মাছের প্রজনন মৌসুম পদ্মা এবং যমুনা নদী হতে রুইজাতীয় মাছের প্রাকৃতিক পোনা সংগ্রহের সময়সূচি দেয়া হলো:

সারণি: দেশীয় মাছের প্রজনন মৌসুম ও পদ্মা-যমুনা নদী হতে পোনা সংগ্রহের সময়

মাছের নাম	প্রজনন মৌসুম	প্রজননের স্থান	মন্তব্য
কই, শিং, টেংরা, আইড়, গুজি ইত্যাদি	চৈত্র-বৈশাখ	বদ্ধ/উন্মুক্ত জলাশয়	চৈত্র-বৈশাখে ভারী বৃষ্টিপাত হলে প্রজনন করে
মলা, ঢেলা, পুঁটি, শোল, গজার, বোয়াল ইত্যাদি	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	ঐ	ঐ
রুইজাতীয় মাছের প্রজনন	জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ	প্রবাহমান নদী/ খাল	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বজ্রপাত সহ মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলে রুইজাতীয় মাছ অমাবশ্যা বা পূর্ণিমার সময় প্রজনন করে
যমুনা নদীতে রুইজাতীয় মাছের পোনা সংগ্রহ	ঐ	ঐ	
পদ্মা নদীতে রুইজাতীয় মাছের পোনা সংগ্রহ	আষাঢ়-শ্রাবণ	ঐ	

চিত্র: যমুনা নদীতে প্রাকৃতিক রেণুপোনা সংগ্রহের দৃশ্য

মাছের প্রবেশনের সময়
(Time of fish recruitment)

মাছের প্রবেশন বলতে নতুন প্রজন্মের মাছ কোনো জলাশয়ে প্রবেশ বা পুরাতন প্রজন্মের সাথে সংযুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বুঝায়। আবার ডিমওয়ালা বা মা মাছ ডিম ছাড়ার জন্য যে কোনো জলাশয়ে প্রবেশ করলেও মা মাছ প্রবেশন বলা হয়। পোনা মাছ ও মা মাছ সাধারণত নতুন পানির স্রোতের সাথে নদ-নদী হতে বিল-বাঁওড়ে প্রবেশ করে। মাছের প্রজনন মৌসুম এবং প্রবেশনের সময় বিবেচনায় জ্যৈষ্ঠ হতে শ্রাবণ মাস স্লুইস গেইট খোলা রাখার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় বলে একটি পঞ্জিকা তৈরি করে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যে সমন্বয়
(Coordination between water management committee and sluice gate management committee)

সেচ প্রকল্প এলাকার কৃষি জমিতে সেচের পানি সরবরাহের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং স্লুইস গেইট খোলা-বন্ধ করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে একটি করে স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। এলাকাভেদে মাঠের ফসল বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে একই সময়ে বিভিন্ন পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি স্লুইস গেইট খোলা-বন্ধ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাবি করে থাকে। ফলে সকলের দাবি একসাথে পূরণ করে স্লুইস গেইট খোলা-বন্ধ করা সম্ভব হয় না এবং কার্যকর সমন্বয় হয় না। এছাড়া পরিবেশের ওপর স্লুইস গেইটের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পূর্বে ছিল না। তাই অধিকাংশের দাবি পূরণের জন্য উভয় কমিটির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং পরিবেশবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রধান প্রধান স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনার জন্য স্লুইস গেইট সংলগ্ন সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় গণ্যমান্য/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

চিত্র: কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা

স্লুইস গেইট কার্যক্ষম করা
(Functionalization of sluice gate)

স্লুইস গেইটসমূহ প্রায় ৩০-৪০ বছর পূর্বে নির্মাণ করা হয়েছে। পুরাতন হওয়ায় অনেক স্লুইস গেইটের পাল্লা নষ্ট হয়ে পড়েছে। হুইল গার্ড ঠিকমত কাজ করে না। কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনার জন্য গেইটসমূহ কার্যকর রাখা অতীব জরুরি বিধায় গেইটসমূহ মেরামত ও নবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। স্লুইস গেইটসমূহ বছরের অধিকাংশ সময়ে বন্ধ রাখার জন্য গেইট সংলগ্ন সংযোগ নদী এবং খালে পলি জমে ভরাট হয়ে নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে একদিকে যেমন বর্ষা মৌসুমের শুরুতে প্রকল্প এলাকায় পানি প্রবেশ করানো সম্ভব হয় না। অপরদিকে বর্ষা শেষে পানি বের করে দেয়াও ব্যাহত হয়। এ প্রেক্ষাপটে স্লুইস গেইট সংলগ্ন খাল ও নদীর অংশবিশেষ খনন করা প্রয়োজন।

কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনার জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টি
(Awareness raising for agro-fish friendly sluice gate management)

পরিবেশের ওপর স্লুইস গেইটের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পূর্বে ব্যাপক ধারণা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা ৩৫°-৩৬° সেন্টিগ্রেড এর বেশি হলে অধিকাংশ শস্যজাতীয় উদ্ভিদের মেটাবলিজম হ্রাস পাবে। ফলে ধান গাছ জন্মালেও ধানে চিটা হবে। ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, বন্যা বৃদ্ধি পাবে। একইভাবে পানির তাপমাত্রা ৩০°-৩২° সে. এর বেশি হলে মাছ সফলভাবে প্রজনন করে না। পানির তাপমাত্রা ৩৫° সে. এর বেশি হলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস পায় এবং অক্সিজেনের অভাবে ডিম হতে পোনা পরিস্ফুটিত হয় না বা ডিম ফেটে যায় এবং উদ্ভিদ কণা উৎপাদন হ্রাস পায়। উদ্ভিদ কণা পানিতে অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং পানির অতিরিক্ত/অদ্রবীভূত অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে আসে। এ সকল বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

স্লুইস গেইট ফিসিং এর বিরূপ প্রভাব
(Adverse impact of sluice gate fishing)

স্লুইস গেইট ফিসিং বলতে যে সকল খাল বা নদীর ওপর স্লুইস গেইট স্থাপন করা হয় ঐ সব খালে মাছ ধরাকে বলা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে বর্ষা মৌসুমের শুরুতে স্লুইস গেইট স্থাপিত খাল যে সব প্রধান নদী বা খালের সাথে সংযুক্ত থাকে ঐ সব প্রধান নদ-নদী হতে 'মা' মাছ, রেণু/পোনা মাছ প্রচুর পরিমাণে বিল বা প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করে। মা মাছ বিল/প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করে ডিম দেয়। ফলে এলাকায় মাছের উৎপাদন ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বিল বা প্লাবনভূমি এলাকায় মাছের প্রচুর প্রাকৃতিক খাদ্য থাকে। ফলে ছোট মাছ প্লাবনভূমিতে বিদ্যমান খাদ্য খেয়ে দ্রুত বড় হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এছাড়া নদ-নদীতে অনেক প্রজাতির মাছ থাকে। এ সব মাছ বিল এলাকায় প্রবেশের ফলে বিল এলাকার মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। স্লুইস গেইটের সংযোগ খাল/নদীতে মাছ ধরার ক্ষতিকর দিকসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নরূপ ঃ

- ডিমওয়ালা বা মা মাছ বিল/প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন কম হয় এবং উৎপাদন বাড়ে না
- পোনা বা ছোট আকারের মাছ বিল/প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করতে পারে না ফলে উৎপাদন কম হয়
- প্রাকৃতিক পোনার বৃদ্ধির হার বেশি। ফলে বিল এলাকায় পোনা মাছ প্রবেশ করতে না পারার কারণে উৎপাদন হ্রাস পায়
- অনেক প্রজাতির মাছ প্রাকৃতিক পোনার সাথে থাকে। এ সকল মাছ বিলে প্রবেশ করতে না পারলে বিলের মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র্য হ্রাস পায়।

বিল/প্লাবনভূমিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক পোনা এবং ডিমওয়ালা মাছ প্রবেশ করা অতীব জরুরি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আইন অনুযায়ী স্লুইস গেইটের ৫০০ মি উপরে এবং নিচে মাছ ধরা নিষেধ। বিল/প্লাবনভূমি এলাকার মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় এ আইন বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরি।

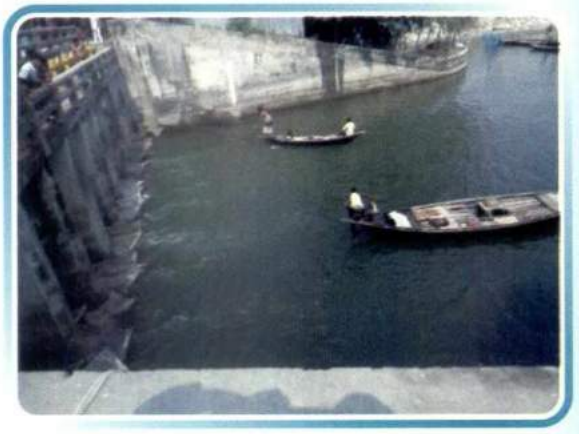

চিত্র: স্লুইস গেইটের খালে মাছ ধরার দৃশ্য

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশে মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে পদ্মা ও যমুনা অববাহিকা এলাকার জলাভূমিতে জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও জার্মান সরকারের যৌথ আর্থিক সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহ্যাবিলিটেশন প্রকল্প-এর মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত জলাভূমিতে কৃষি ও মৎস্যবান্ধব স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন-এর খসড়া সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত এ গাইডলাইনস্ চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে পাবনা সেচ প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ নদী ও খালের সাথে সংযুক্ত পদ্মা-যমুনা নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপিত প্রধান ৪টি স্লুইস গেইট যথাক্রমে কৈতোলা, বাউলাখোলা, তালিমনগর এবং খলিলপুর ২০১১ সাল থেকে কৃষি ও মৎস্য বান্ধব ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা হচ্ছে। খোলা রাখার ফলে প্রধান নদীসমূহ হতে প্রাকৃতিক উৎসের রেণু ও পোনা মাছ স্লুইস গেইটের ভেতর দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রকল্প এলাকার জলাসমূহে প্রবেশ করে। স্লুইস গেইট খোলা রাখার পাশাপাশি এলাকার জেলেগণ জুন-জুলাই দুই মাস মাছ আহরণ বন্ধ রাখে। ফলে পোনাসমূহ বড় হওয়ার সুযোগ পায় এবং মাছের উৎপাদন এলাকাভেদে ২০-২৫% বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর প্রস্তাবিত গাইডলাইনটি অনুসরণের মাধ্যমে দেশের সম্ভাব্য সকল অভ্যন্তরীণ জলাভূমিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।

[১]প্রকল্প পরিচালক, ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহেবিলিটেশন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[২]সহকারী প্রকল্প পরিচালক, ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহেবিলিটেশন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মাছের আহরণ-পরবর্তী ক্ষতি কমানোর জন্য সঠিক পরিচর্যা
Adequate Fish Handling for the Reduction of Post-harvest Loss

প্রফেসর ড. এ কে এম নওশাদ আলম

Abstract

Low quality fish and fish products are not only a great concern of food security and public health but also of serious economic loss that the small-scale processors and fish traders suffer year after year. Fisheries sector in Bangladesh suffers from serious post-harvest loss every year due to ignorance and negligence of the people involved in different stages from the harvest to retail distribution. Preliminary research revealed a dearth of qualitative and quantitative data on post-harvest fish losses in Bangladesh. This is seen as a constraint to planning for the post-harvest sector at country level. Studies revealed a very high level of post-harvest loss during pre-processing, processing, storage and transportation of fishery products, accounting 30-50%. Loss incurred only during post-harvest handling of wet fish accounts a 12-19 % in different forms.

আহরণ থেকে শুরু করে ভোক্তার হাতে পৌছানো পর্যন্ত প্রতি বছর বাংলাদেশে মাছের গুণগতমানের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। এক্ষতি শুধু খাদ্য নিরাপত্তা বা জনস্বাস্থ্যের জন্যই হুমকি নয়, উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং মাছ ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক লোকসানেরও অন্যতম প্রধান কারণ।

বিগত দেড় দশকে বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৯৩ সনে যেখানে মোট মৎস্য উৎপাদন ছিল প্রায় ৮ লক্ষ মে.টন, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ লক্ষ মে.টনেরও বেশি। উৎপাদন আশানুরূপ বাড়লেও এর সুফল থেকে অনেক ক্ষেত্রেই জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে। উৎপাদিত মাছ সঠিক গুণগতমান বজায় রেখে ভোক্তার হাতে পৌছতে ব্যর্থ হচ্ছে। মাছ বা চিংড়ি দ্রুত পচনশীল পণ্য। সঠিকভাবে পরিচর্যা ও সংরক্ষণ করা না হলে ধরার কয়েক ঘন্টার মধ্যে মাছ পচে নষ্ট হয়ে যায়। তিনটি প্রধান কারণে মাছ পচে নষ্ট হয়: (ক) ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ; (খ) মাছের দেহ বা আক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়া থেকে নিঃসৃত পাচকরসের ক্রিয়াকলাপ এবং (গ) মাছের চর্বির জারণ। এজন্য উপযোগী তাপমাত্রা হচ্ছে ২০-৪০° সে.। মাছের দেহের তাপমাত্রা উল্লিখিত উপযোগী তাপমাত্রার নিচে বা উপরে সরিয়ে আনলে মাছে পচন বন্ধ হয় বা ধীর গতিতে ঘটে। আর যদি ধরার পর পচন উপযোগী পরিবেশে মাছকে ফেলে রাখা হয় তবে মাছের পচন ত্বরান্বিত হয়। সচেতনতা ও সঠিক জ্ঞানের অভাবে এবং অহেলার কারণে বাংলাদেশে আহরণকৃত মাছের উল্লেখযোগ্য অংশ পচে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সঠিক পরিচর্যা ও বাজারজাতকরণের অভাবে এখনও দেশে আহরণকৃত মাছের শতকরা ১২-১৯ ভাগ কোনো না কোনো পর্যায় পর্যন্ত পচে ভোক্তার হাতে পৌছে (নওশাদ, ২০১৪)। প্রাক-প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ ও পরিবহণের সময়ও মাছের গুণগতমানের অনেক ক্ষতি হয়। দেশে উৎপাদিত শুটকির শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ মাছির লার্ভার আক্রমণে নষ্ট হয়। গুদামজাত শুটকির শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগ কাইস্‌সা পোকার দ্বারা নষ্ট হয়। এসব পোকার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রায়শই মারাত্মক ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যাহার করা হয়। এতে বর্তমানে দেশে উৎপাদিত শুটকির শতকরা ৮০ ভাগ কীটনাশকযুক্ত হয়ে খাওয়ার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। আবার ইলিশের ভরা মৌসুমে বরফের পর্যাপ্ত যোগান না থাকায় অনেক ইলিশ পচে যায়। সাধারণত অধিক পচা ইলিশ, যা কোনোভাবেই কাঁচা খাওয়ার যোগ্য নয়, লবণজাত করা হয়। যথাযথ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিচর্যার অভাবে এবং খোলা বাঁশের ঝুড়িতে সংরক্ষণ করে পরিবহন ও বাজারে বিক্রি করার ফলে লবণজাত ইলিশ আরো নষ্ট হয়। ধুমায়িত চিংড়ি, সিঁদল বা চ্যাপা ও নাপ্পি মারাত্মক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি হয়, মানসম্মত কাঁচামালের ব্যবহার ও সঠিক প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয় না এবং এগুলোয় মারাত্মক পচন ও সংক্রমণ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে করে প্রায় সব ধরনের মাছের পণ্যে বিস্তর ক্ষতি সাধিত হয়। এ বিপুল পরিমাণ ক্ষতি কমিয়ে ভোক্তার হাতে উন্নত গুণগতমানসম্পন্ন মাছ বা মাছের পণ্য তুলে দেয়ার জন্য ধরার পর থেকে মাছকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করে যথাযথ প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার।

অবতরণ কেন্দ্রে মাছ খালাসকালে ও যানবাহনে পরিবহণের সময় মাছের পরিচর্যা (Handling of fish during loading, transportation and unloading)

অবতরণ কেন্দ্র হতে মাছ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পাইকারি ও খুচরা বাজারে নিয়ে যাওয়া হয় অথবা প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এ কাজে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখতে হবে-

ব্যবহৃত ট্রাক, লরী, ভ্যান, রিক্সা ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

- দূরত্ব বেশি হলে তাপ-অপরিবাহী কাভার্ড ভ্যান বা ট্রাকে পরিবহন উপযোগী বড় বরফ-বাক্স ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- খালাসকালে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে মাছ ক্ষত না হয়।
- খালাস করার সময় খোলের ভেতর মাছের ওপর দাঁড়ানো যাবে না।
- ফিসিং বোট থেকে ঝুড়িতে মাছ ছুড়ে মারা যাবে না।
- খালাসের পর মাছকে পরিষ্কার স্থান বা পাত্রে রাখতে হবে।
- পুনরায় বরফ দেয়ার প্রয়োজন হলে দ্রুত বরফ দিতে হবে।

- খুব দ্রুত এবং সাবধানে মাছ পরিবহন করতে হবে।
- দূরে মাছ পরিবহনের জন্য শীতলীকৃত ভ্যান উত্তম।
- যে কোন ধরণের মাছ পরিবহনের জন্য তাপ-প্রতিরোধী বরফ-বাক্স ব্যবহার করা উচিত।
- ঢাকনাওয়ালা ও তলায় ছিদ্রযুক্ত ধাতব পাত্রে যথাযথভাবে বরফ দিয়ে মাছ পরিবহন করা যেতে পারে ।
- পরিবহনের জন্য দ্রুতগামী যান ব্যবহার করা উচিত।

বাজারজাতকালে মাছের পরিচর্যা
(Handling of fish during marketing)

- মাছকে বরফে রক্ষিত অবস্থায় পরিবহন করে বাজারে আনতে হবে।
- অকশন বা ডাক ও খুচরা বিক্রয়ের সময় মাছ বরফে আচ্ছাদিত থাকতে হবে।
- সূর্যের আলোতে রেখে মাছ বিক্রয় করা যাবে না।
- মাছের দোকানে ভাল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিক্রির শেষে প্রতিদিনের ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করতে হবে।
- বিক্রির শেষে ব্যবহৃত পাত্র-ভান্ড, ঝুড়ি, দা-বটি ইত্যাদি ৫০ পিপিএম ক্লোরিনযুক্ত পানি দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে রাখতে হবে। টিউবওয়েলের পানিতে ১.২৫% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট মিশালে ৫০ পিপিএম ক্লোরিনযুক্ত পানি পাওয়া যাবে।
- লটের মধ্যে পচা মাছ থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে।
- খুচরা বিক্রেতার নিকট বরফের খন্ড ও বরফ দেয়া মাছ মজুদ রাখার জন্য অতিরিক্ত বরফ বাক্স অথবা প্রয়োজন বিশেষে কমিউনিটি আইস বক্স থাকতে হবে।
- মাছকে ভিজিয়ে রাখার জন্য টিউবওয়েলের জীবাণুমুক্ত পানি ব্যবহার করতে হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে পরিচর্যা
(Handling at fish processing plants)

প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে পরিচর্যাগুলো নিম্নরূপ:

- ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, লোকবল, প্রক্রিয়াজাতকরণ স্থান জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে।
- সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা।
- চিংড়ি সংরক্ষণে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে।

রান্নার সময় পরিচর্যা
(Handling of fish during cooking)

- মাছের অপ্রয়োজনীয় অংশ অপসারণ করে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে।
- স্বাদ, গন্ধ ও রুচিসম্মত করার জন্য ভাল মসলা ব্যবহার করতে হয়।
- উপযুক্ত তাপমাত্রায় ভালভাবে রান্না করতে হবে।

মাছের পরিচর্যা সংকটকাল ও সংকট উত্তরণে করণীয়
(Critical Control Point during Handling of Fish and Measures to be taken for Mitigation)

পণ্যের ধরন	পরিচর্যার স্তর	অতি সংকটময় মুহূর্ত (CCP)	সংকট উত্তরণে করণীয়
জীবিত মাছ	আহরণকালে পরিচর্যা	জাল বা আহরণ সরঞ্জামে মাছ বেশি সময় থাকা	যথাযথ জাল/ সরঞ্জাম ব্যবহার করে মাছ ধরা
আহরিত মাছ	প্রাথমিক পরিচর্যা (ঢেকে রাখা, ঠান্ডায় রাখা, বরফে রাখা, তাড়াতাড়ি বাজারজাত করা)	আহরণজনিত ক্ষত, রৌদ্রে, গরমে ও বাতাসে খোলা অবস্থায় ফেলে রাখা, মাছের গা শুকিয়ে উঠা, স্তূপাকার রাখার কারণে চাপের মধ্যে পড়া	রৌদ্র, গরম, বাতাস থেকে রক্ষা করা, বরফে শীতলরাখা, বরফ-বাক্সে রাখা, স্তূপাকারে না রাখা
অবতরণ কেন্দ্রে মাছ	মাথা ছাড়ানো, নাড়ি ভুঁড়ি ছাড়ানো	অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে মাথা/খোলস ছাড়ানো ভোঁতা যন্ত্র দিয়ে নাড়িভুঁড়ি ছড়ানো, ভালভাবে ধৌত না করা।	উন্নত প্রশিক্ষণ, সঠিক যন্ত্রপাতি, কড়া পরিদর্শন
প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্রে মাছ	ধৌতকরণ, বরফজাতকরণ শীতলীকরণ	মাছের তাপমাত্রার বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতে বিলম্ব, যান্ত্রিক ত্রুটি	উন্নত ধৌতকরণ, উন্নত প্রশিক্ষণ, সঠিক যন্ত্রপাতি বেশি বরফ
শীতলীকৃত মাছ	বরফ সময়মতো পাল্টিয়ে তাপমাত্রা সঠিক রাখা	হস্তান্তরের সময় তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া	অতিরিক্ত পর্যাপ্ত বরফের ব্যবস্থা থাকতে হবে ।
বাজারে বিপণন	ছোট বরফ-বাক্সে রেখে মাছ বিক্রয়	বরফের অভাবে দিনশেষে মাছ পচে যাওয়া	বড় কমিউনিটি বরফ বা বরফের ব্লক সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

উপসংহার (Conclusion)

রপ্তানিযোগ্য মৎস্য পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিতকরণের জন্য মৎস্য উৎপাদনকারী ও আহরণকারী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, পরিবহনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক এবং মৎস্য বিভাগ সকলেই যথেষ্ট যত্নবান- এতে কোন সন্দেহ নাই। তবে দেশব্যাপী সঠিক মানসম্পন্ন পুষ্টি-চাহিদা যোগান, জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য সরবারহকৃত মাছ ও মৎস্যপণ্যের মান নিশ্চিতকরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়াও একান্ত জরুরি। এখানে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মৎস্যজীবী ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের অজ্ঞতা ও সংশ্লিষ্ট সকল মহলের অবহেলার কারণে সরবরাহকৃত নিম্নমানের মাছ খেয়ে অসুস্থ হওয়ার পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত অন্যান্য সুফল লাভ থেকেও জনগণ প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে। মাছ দ্রুত পচনশীল হওয়ায় প্রাথমিক স্তরের পচন বা আমিষের গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার বিষয়টি মাছের বাহ্যিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের দ্বারা সঠিকভাবে বুঝা যায় না। কাঁচা মাছ শতকরা ৩০-৪০ ভাগ পচে নষ্ট হলেও প্রায়শই এর চোখ, ফুলকা, মাংসপেশী, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদি দেখে তা বুঝার উপায় নেই। মানুষ আমিষজাতীয় খাদ্য খায় দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন এবং বাচ্চাদের দৈহিক বিকাশ ও মস্তিষ্ক গঠনের জন্য। একই সমান মূল্যে আপাত দৃষ্টিতে ভাল (যেহেতু বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় না) অথচ শতকরা ৩০-৪০ ভাগ পচা মাছ কিনে রান্না করে খাওয়ার পর ভোক্তাগণ শতকরা ৩০-৪০ ভাগ কম সুফল পায়। সচেতন ও সামান্য যত্নবান হলে মাছের গুণগতমান সঠিক রেখে শতকরা একশভাগ সুফল পাওয়া যেতে পারে। তাই জনস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহকৃত মাছকেও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মতো একই পদ্ধতিতে পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা দরকার। বিষয়টি অধুনা বহুল আলোচিত খাদ্য নিরাপত্তার আলোকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মাছের বিপুল পরিমাণ আহরণ পরবর্তী ক্ষতি কমাতে পারলে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদার অনেকটাই পূরণ হবে। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপও কমবে।

অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ফিশারি পোষ্ট-হারভেষ্ট বিশেষজ্ঞ

আধানিবিড় পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ
Semi-intensive Shrimp Culture

প্রফুল্ল কুমার সরকার

Abstract

Peneus monodon always has higher prices in world market. Initially extensive culture system was unable to produce more from small areas. That's why intensification began in many countries as an established sustainable shrimp culture system since last 15-20 years. In Bangladesh semi-intensive shrimp farming was started in 1994 but not sustained. Later, it was started in 2003 with an area of 10 hectares. Very slow expansion rate raised it up to only 500 hectares since 2014. But in this year with initiative from Khulna DoF, producers get big production and higher profit. As a result, new entrepreneurs were interested to start semi-intensive farming. About 800 hectares farms came under this system in 2015. Actually, Semi-intensive system is a planned approach of shrimp culture. It requires infrastructures like well designed ponds with proper embankment, outlet & inlet, steady power supply, store, office, landing sites etc. Initially ponds are filled with brackish water & properly disinfected. Then initiative is taken for primary productivity of the pond. Aeration is essential in semi-intensive farming, so aerators are required in each pond. Then ponds are stocked with PCR negative high quality PL in required densities which is followed by regular feeding with quality feed & regular observation of the ponds for expected water quality. Growth and health of shrimps are checked regularly. Final harvest is as per GAP instructions after 115-125 days, provided with proper record keeping.

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অর্ধলবণাক্ত পানিতে চাষকৃত বাগদা চিংড়ির বৈজ্ঞানিক নাম *Peneus monodon*, ইংরেজি নাম ব্ল্যাক টাইগার এবং সাধারণ নাম ডোরাকাটা চিংড়ি। থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, চীন, আমেরিকা, ভারতসহ অন্যান্য দেশেও এর চাষ হয়। এসব দেশে এক সময় বাগদা চিংড়ি চাষের সম্প্রসারিত পদ্ধতির ব্যাপক বিস্তার ঘটলেও হেক্টর প্রতি উৎপাদন অত্যন্ত কম হওয়ায় চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন ও নিবিড়করণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাগদা চিংড়ির আধানিবিড় চাষ এ উন্নয়ন ধারার একটি পর্যায়। এ চাষে পরিকল্পিত অবকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, প্রত্যাশিত গুণাগুণ সম্পন্ন পর্যাপ্ত পানি, রোগমুক্ত সবল পোনা, মানসম্পন্ন খাবার এবং সর্বোপরি ভাল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। এ পদ্ধতিতে মজুদ ঘনত্ব যেমন বেশি, উৎপাদনও তেমন অনেক বেশি। ১৫-২০ বছর আগে এ পদ্ধতির চাষের যাত্রা শুরু। বিভিন্ন দেশে এ পদ্ধতির চাষে হেক্টর প্রতি গড়ে ১০-১২ মে.টন উৎপাদন পাওয়া গেছে। কালের ক্রমধারায় চিংড়ি চাষে রোগবালাইয়ের প্রকোপ ও নানা দেশের বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারণে উৎপাদনে বিপর্যয় ঘটার ফলে সেসব দেশে নানা মাত্রায় বাগদা চিংড়ির উৎপাদন সংকুচিত হয়ে আসলেও এখনও বিভিন্ন দেশে নানা মাত্রায় আধানিবিড় বাগদা চিংড়ি চাষ টিকে আছে। এ অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশও আজ আর পিছিয়ে নেই। চলতি মৌসুমে দেশে প্রায় ৭৫০ হেক্টর জমিতে আধানিবিড় বাগদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশে সম্প্রসারিত বাগদা চিংড়ি চাষের প্রচলন পঞ্চাশের দশক থেকে। ষাটের দশকে প্রথম চিংড়ি রপ্তানি শুরু হয়। সত্তরের দশকে স্বাধীনতার পর চিংড়ির রপ্তানি বাণিজ্যে প্রসার ঘটে। আশির দশকে দেশের উপকূলীয় খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও কক্সবাজার অঞ্চলে অর্ধলবণাক্ত পানিতে বাগদা চিংড়ি চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। মৎস্য অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে প্রায় ২.৬৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে বাগদা চিংড়ির চাষ হয়। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে উপকূলীয় অঞ্চলের ব্যাপক এলাকায় এ চাষ সম্প্রসারিত হলেও মূলত অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং আগ্রহী উদ্যোক্তার অভাবে এর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও নিবিড়করণ তেমন একটা হয়নি। ফলে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ২০০-৩৫০ কেজির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ৯০ দশকের প্রথমার্ধে বিসিক ও শিল্প ব্যাংকের উদ্যোগে কক্সবাজার অঞ্চলে সীমিত পর্যায়ে আধানিবিড় বাগদা চিংড়ির চাষ শুরু হলেও মানসম্পন্ন পোনা, উপকরণ ও প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতার কারণে স্থায়িত্বের পরীক্ষায় তা উত্তীর্ণ হতে পারেনি। উন্নয়নের ক্রমধারায় ২০০৩ সালে মাত্র ১০ হেক্টর জমিতে খুলনার প্রান্তি এ্যাকুয়াকালচারের উদ্যোগে আধানিবিড় বাগদা চিংড়ি চাষের অগ্রযাত্রা পুনরায় শুরু হয়, যা বিগত বছরে প্রায় ৫০০ হেক্টরে পৌঁছে। ২০১৪ সালে আধানিবিড় বাগদা চিংড়ি চাষে ব্যাপক সাফল্য আসে। উল্লেখযোগ্য কোনো বিপর্যয় ছাড়াই হেক্টর প্রতি সর্বোচ্চ ১২ মে.টন এবং সর্বনিম্ন ৩ মে.টন উৎপাদন পাওয়া যায়। জেলা মৎস্য দপ্তর, খুলনার উদ্যোগে বাছাই করা ৪০ জন উদ্যোক্তাকে নিয়ে চিংড়ি আহরণ উৎসব ও ফলাফল প্রদর্শন মেলার আয়োজন করা হলে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এ ফলাফল প্রদর্শন ব্যাপকভাবে প্রচার পায়। উল্লেখযোগ্য সাড়া মেলে ২০১৫ সালের উৎপাদন মৌসুমে। এ বছর আধানিবিড় খামার বেড়েছে প্রায় ২৫০-৩০০ হেক্টর। সব মিলিয়ে এবছর খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলে প্রায় ৭৫০-৮০০ হেক্টর খামারে আধানিবিড় পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে।

আধানিবিড় পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ (Semi-intensive shrimp culture)

অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা (Infrastructure facilities)

আধানিবিড় চিংড়ি চাষে সফলতার জন্য জীবাণুমুক্ত পানি, ভাইরাসমুক্ত সুস্থ ও সবল পোনা, মানসম্পন্ন উপকরণ ও খাদ্য এবং পানির উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

এর জন্য পরিকল্পিত পুকুর, কাছাকাছি লবণাক্ত পানির উৎস, পানি প্রবেশ এবং নির্গমনের জন্য পৃথক পাকা নর্দমা অথবা পাইপ লাইন, কমপক্ষে একটি রিজার্ভ পুকুরসহ একাধিক চাষের পুকুর, ইটিপি ইত্যাদি আবশ্যক। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ লাইন, বিকল্প বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা (জেনারেটর), এ্যারেটর, স্থায়ী বা অস্থায়ী বেষ্টনী, পাম্প মেশিন, খাদ্য, অন্যান্য উপকরণ ও জ্বালানী সংরক্ষণের জন্য পৃথক স্টোর রুম ইত্যাদি থাকতে হবে। এছাড়া পানি পরীক্ষার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য পৃথক কক্ষ, কর্মচারীদের জন্য পৃথক আবাসিক ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসম্মত বাথরুম, অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদিও আধানিবিড় বাগদা চিংড়ি খামারের বৈশিষ্ট্য।

চিত্র ঃ একটি আধানিবিড় বাগদা চিংড়ি খামার

পরিকল্পিত পুকুর (Well designed pond)

উন্নত চিংড়ি চাষে পরিকল্পিত পুকুর অপরিহার্য। ৫-৬ ফুট পানি ধরে রাখা যায় এমন পুকুর উত্তম। পুকুরের পাড় ৬ ফুট চওড়া ও বন্যামুক্ত, পাড়ের ঢাল ১ঃ২, তলা নির্গমন-নালার দিকে সামান্য ঢালু, আয়তাকার, বর্গাকার বা উপবৃত্তাকার হতে পারে। আয়তন ৬০-১০০ শতক ভাল। পাড় যথেষ্ট মজবুত হতে হবে যেন পানি চুইয়ে প্রবেশ করতে না পারে। পাড়ের টপ ও ঢাল মজবুত করার জন্য ভাইব্রেটর যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। নির্ভরযোগ্য লবণাক্ত পানির উৎসের কাছাকাছি পুকুরের অবস্থান এবং মাটি দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ বা এটেল-দোআঁশ ভাল। এক জায়গায় একাধিক পুকুর হলে ভাল হয়।

জীবাণুমুক্ত উপযুক্ত পানি (Pathogen free suitable water)

এ চাষে জীবাণুমুক্ত উপযুক্ত পানির বিশেষ প্রয়োজন। পুকুরের পানিতে চিংড়ির ক্ষতি বা রোগাক্রান্ত করতে সক্ষম জলজ জীব বা জীবাণুবাহক প্রাণির অনুপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য উৎস থেকে তিন পর্দা মিহি জালে পাম্প করে পানি ছেঁকে তুলতে হবে। পুকুরের চারদিকে পানির স্তরের সামান্য উপরে আংগুল-ফাঁসের কারেন্ট জাল দ্বারা পানির দিকে একটুখানি কাত করে ঘিরে দিতে হবে। পানিকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য ৬০ পিপিএম মাত্রায় উন্নতমানের ব্লিচিং পাউডার রাতের বেলা প্রয়োগ করতে হবে। উপযুক্ত পানি বলতে বাগদা চিংড়ির বাঁচা ও বড় হওয়ার জন্য পানির অনুকূল গুণাগুণ যেমন লবণাক্ততা ৫-২৫ পিপিটি, স্বচ্ছতা ২৫-৩৫ সেমি, পিএইচ ৭.৫-৮.৫, অ্যালকালিনিটি ১২০-১৫০ পিপিএম, অ্যামোনিয়া ০.১ ইত্যাদি পুরো মৌসুম ধরে বজায় রাখতে হবে। প্রতিদিন পানির পিএইচ এবং প্রতি সপ্তাহে অন্যান্য গুণাগুণ পরিমাপ করে রেকর্ড বইয়ে লিখে রাখতে হবে। কোনো গুণাগুণ অস্বাভাবিক পাওয়া গেলে সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জীবাণুমুক্ত পরিবেশ (Pathogen free suitable environment)

প্রতিকূল পরিবেশে রোগাক্রান্ত হয়ে চিংড়ি মারা যাওয়ার প্রবণতা বাগদা চিংড়ি চাষের বড় সমস্যা। উন্নত চিংড়ি চাষে এ সমস্যা সমাধানে বায়োসিকিউরিটি বা জৈবনিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে খামার ও প্রতিটি পুকুরের চারপাশ এবং প্রবেশ পথের দরজা সবুজ নেটজাল দিয়ে বেশ উঁচু করে ভালভাবে ঘিরে দিতে হবে যাতে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, ইদুর, ছুঁচো, সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া, কুচে ইত্যাদি ক্ষতিকর ও জীবাণুবাহক প্রাণী খামারে ঢুকতে না পারে। এমনকি খামারে লোকজনের প্রবেশ ও চলাফেরা সীমিত করতে হবে। প্রবেশ পথে স্থাপিত ফুটবাথে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত পানি ও জীবাণুনাশক স্প্রে দ্বারা সকলকে জীবাণুমুক্ত হয়ে খামারে প্রবেশ করতে হবে। খামারের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম, পাত্র, জাল, দড়ি, উপকরণের বহিরাগত ব্যাগ ইত্যাদি সব কিছুই জীবাণুমুক্ত করে খামারে প্রবেশ করাতে হবে। এভাবে পুরো মৌসুমব্যাপী সার্বক্ষণিকভাবে জৈবনিরাপত্তার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

চিত্রঃ আধানিবিড় বাগদা চিংড়ি খামারের অবকাঠামো

চিত্রঃ খামারের চতুর্দিকে নেটজালের ঘেরা

চিত্র: খামারের প্রবেশপথে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা

চিত্র: সম্পূরক খাবার প্রয়োগের দৃশ্য

ভাইরাসমুক্ত, সুস্থ ও সবল পিএল (Virus free healthy PL)

উন্নত চিংড়ি চাষে জীবাণুমুক্ত সুস্থ ও সবল পিএল-এর গুরুত্ব অপরিসীম। পিএল-এর সাথে ভাইরাস বা অন্যান্য রোগজীবাণু আসার সম্ভাবনা খুবই বেশি। সেজন্য বিশ্বস্ত হ্যাচারি থেকে ভাইরাসমুক্ত (পিসিআর নেগেটিভ) অথবা এসপিএফ পিএল সংগ্রহ করতে হবে। প্যাকিং ও পরিবহনে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে যাতে মজুদযোগ্য পিএল-এ কোনোরূপ পীড়ন না হয়। পর্যাপ্ত সময় পানি অদল-বদল করে পরিবহন ব্যাগের লবণাক্ততা, পিএইচ ও তাপমাত্রাকে খামারের পানির গুণাগুণের সাথে খাপ খাইয়ে পিএল মজুদ করতে হবে।

মানসম্পন্ন খাবার (Quality feed)

চিংড়িকে সুস্থ ও সবল রাখা, এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্য নিয়মিত ও পরিমিত পরিমাণে মানসম্পন্ন খাবার সরবরাহ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক খাবারের গুরুত্ব কম নয়। ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের পর পানিতে সাধারণত কোনো প্রাকৃতিক খাবার থাকে না। তাই পানিতে পরিমিত পরিমাণ প্রাকৃতিক খাবার জন্মানোর জন্য প্রতি একরে ১০ কেজি অটো রাইস পলিস, ১০ কেজি চিটাগুড় ও ১০০ গ্রাম ঈস্ট ৩ গুণ পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে তার নির্যাস পানিতে কয়েক দিন ব্যবহার করতে হবে। পানির স্বচ্ছতা ৩০-৩৫ সেমি হলে নির্যাস দেয়া বন্ধ করতে হবে। প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি পুকুরে স্থাপিত ফিডিং ট্রেতে মানসম্পন্ন সম্পূরক খাবার নিয়মিত এবং পরিমিত পরিমাণে প্রয়োগ করতে হবে। খাবার পিলেটেড বা দানাদার হবে এবং চিংড়ির বয়স অনুযায়ী দানার আকার ঠিক করতে হবে। চিংড়ির ওজন অনুযায়ী দৈনিক খাবার প্রয়োগের পরিমাণ ঠিক করতে হবে। প্রতিবার খাবার প্রয়োগের পর ফিডিং ট্রে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

চিত্র: এ্যারেটারের সাহায্যে বায়ুসঞ্চালন

প্রতিপালন ব্যবস্থাপনা (Rearing management)

চাষের সময় পানি ও তলার মাটির গুণাগুণ প্রত্যাশিত মাত্রায় বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পানির গুণাগুণ প্রত্যাশিত মাত্রায় বজায় রাখা এ চাষে সাফল্য অর্জনের চাবিকাঠি। তাই পিএল মজুদের পর নিয়মিত পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ ও পরিচর্যা করতে হবে। পর্যবেক্ষণের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো:

পানির স্বচ্ছতা: পানির রং হালকা সবুজ বা বাদামি কিনা তা নিয়মিত সেক্কিডিস্ক এর সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ সময় পানির স্বচ্ছতা ২৫-৩৫ সেমি থাকা ভাল। স্বচ্ছতা বেড়ে গেলে ইতঃপূর্বে বর্ণিত নিয়মে রাইস পলিশ, চিটাগুড় ও ঈস্টের নির্যাস ব্যবহার করতে হবে।

পিএইচ: পিএইচ পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। পিএইচ মানের সাথে পানির অন্যান্য গুণাগুণেরও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। দিনে দুবার (সকাল ৬ টায় এবং বিকাল ৩ টায়) নিয়মিত পিএইচ পর্যবেক্ষণ করে ৭.৫ থেকে ৮.৫ এর মধ্যে আছে কিনা তা দেখতে হবে। পিএইচ কমে গেলে পানিতে হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা বেড়ে গিয়ে অম্লত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে যা চিংড়ির জন্য খুবই ক্ষতিকর। এ অবস্থায় ডলোমাইট ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার মাত্রাতিরিক্ত অ্যামোনিয়ার উপস্থিতির কারণে পিএইচ বৃদ্ধি পেয়ে পানির ক্ষারকত্ব বেড়ে যেতে পারে। পিএইচ ঠিক রাখার জন্য পানিতে পিএইচ-বাফার ব্যবহার করা যায়। মাত্রাতিরিক্ত অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত প্রোবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্ষারত্ব: সপ্তাহে কমপক্ষে একবার পানির অ্যালকালিনিটি পর্যবেক্ষণ করে রেকর্ড করতে হবে। এর মান ১২০-১৫০ পিপিএম এর মধ্যে থাকা উত্তম। কোনো কারণে ক্ষারত্ব বৃদ্ধি পেলে ব্যাসিলাস, রডো ব্যাকটার ও অন্যান্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া সমৃদ্ধ প্রোবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে।

অক্সিজেন: জীবনের জন্য অক্সিজেন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ ৫ মিগ্রা/লিটার এর উপরে আছে কিনা তা ডিও মিটারের মাধ্যমে নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে পিএল মজুদের সংখ্যা ১৫-২০ টি হলে

পানিতে সার্বক্ষণিক পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন অক্সিজেন সরবরাহের জন্য আধানিবিড় চিংড়ি চাষে অ্যারেটর ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে এক একরের পুকুরে সাধারণত চারটি অ্যারেটর ব্যবহার করতে হবে। মজুদ ঘনত্ব ২০-২৫টি হলে ৬টি অ্যারেটরের প্রয়োজন হবে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে অ্যারেটর চালু রাখতে হবে। সাধারণত প্রথম মাসে দৈনিক ৮ ঘণ্টা, দ্বিতীয় মাসে ১০ ঘণ্টা, তৃতীয় মাসে ১২ ঘণ্টা এবং চতুর্থ মাসে ১৪ ঘণ্টা অ্যারেটর চালানো যেতে পারে।

স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ: সপ্তাহে অন্তত একদিন নমুনায়ন করে চিংড়ির স্বাস্থ্য ও দৈহিক বৃদ্ধির গতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চিংড়ি যথেষ্ট চটপটে কিনা, খোলসের রং চকচকে বা উজ্জ্বল কিনা, খাদ্যনালী ভরাট কিনা, বৃদ্ধির গতি গ্রোথ চার্ট অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নমুনায়ন করে চিংড়ির গড় ওজন এবং মোট ওজন রেকর্ড করতে হবে।

আহরণ ও আহরণোত্তর পরিচর্যা: আধানিবিড় চাষে সাধারণত ১১৫-১২৫ দিনে চিংড়ি আহরণযোগ্য হয়। আহরণযোগ্য চিংড়ি প্রতি কেজিতে ২০-৩০টি হলে লাভজনক হয়। সাধারণত একই পুকুরে একই স্টকের পিএল মজুদ এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কারণে চিংড়ির বৃদ্ধির তারতম্য

চিত্র: আধানিবিড় খামারে বাগদা চিংড়ি আহরণ

তেমন একটা ঘটে না। ফলে এক সাথে এক বা একাধিক পুকরের প্রায় সব চিংড়ি আহরণ করা যায়। আহরণের আগে অবশ্যই প্রক্রিয়াকরণ কারখানা অথবা এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ করে দরদাম ঠিক করে নিতে হবে। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসম্মত বরফ, উপকরণ ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করে রাখতে হবে। আহরিত চিংড়ির মান বজায় রাখার জন্য বরফগলা পানিতে আহরিত চিংড়ির মৃত্যু নিশ্চিত করতে হবে। পর্যাপ্ত বরফ দিয়ে চিংড়ি দ্রুত এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় পৌছাতে হবে।

আধানিবিড় চিংড়ি চাষের অর্থনীতি (Economics of semi-intensive shrimp farming)

আধানিবিড় চিংড়ি চাষের জন্য পর্যাপ্ত পুঁজির প্রয়োজন হয়। এ ধরনের একটি পরিকল্পিত নতুন খামার গড়তে পুকুর খনন, পাড় বাঁধানো, বেষ্টনী নির্মাণ, পানি প্রবেশ ও নির্গমন পাইপ এবং বিদ্যুৎ সংযোগ ও লাইন স্থাপন, পাম্প মেশিন, জেনারেটর, গুদাম, আবাসন ইত্যাদি স্থায়ী বিনিয়োগ হেক্টর প্রতি প্রায় ২৮-৩০ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি ব্লিচিং পাউডার, পুকুর প্রস্তুতির অন্যান্য উপকরণ, পিএল, খাবার, প্রোবায়োটিক, শ্রমিক ইত্যাদি পরিচালনা-ব্যয় হেক্টর প্রতি প্রায় ২০-২২ লক্ষ টাকা। স্থায়ী ব্যয় ১০ বছরের জন্য ধরা হলে প্রতি বছরের পরিচালনা-ব্যয়ের সাথে আরও তিন লক্ষ টাকা যোগ হয়। অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ব্যয় দাঁড়ায় ২৩-২৫ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৫.০ মে.টন হলে এর বাজার মুল্য ৪৩-৫০ লক্ষ টাকা হিসেবে হেক্টর প্রতি নীট লাভ প্রায় ২০-২৫ লক্ষ টাকা। বিগত বছরের সমীক্ষায় দেখা গেছে এ পদ্ধতিতে প্রতি কেজি চিংড়ি উৎপাদনে ব্যয় ৩৬০-৪০০ টাকা এবং বিক্রয় মূল্য ৯০০-১,০০০ টাকা ছিল।

চিত্র: সম্পূরক খাবার প্রয়োগের দৃশ্য

উপসংহার (Conclusion)

আধানিবিড় বাগদা চিংড়ি চাষ একটি বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পিত চাষ ব্যবস্থা। এতে সনাতনী পদ্ধতির মড়কের ঝুঁকি ও নানাবিধ সামাজিক সমস্যা এড়িয়ে অল্প জায়গায় অধিক উৎপাদন সম্ভব। মাত্র ২০ হাজার হেক্টর খামারে আধানিবিড় বাগদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ করা হলে অতিরিক্ত ১.২০ লক্ষ মে.টন চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব যা সম্প্রতি রপ্তানিযোগ্য চিংড়ির প্রায় দ্বিগুণ। এর ফলে রপ্তানি আয় বেড়ে ১২ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াবে এবং অতিরিক্ত ৬ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়া এ পদ্ধতিতে জিএপি অনুসরণ, যথাযথ আহরণোত্তর পরিচর্যা নিশ্চিতকরণ, ট্রেসেবিলিটির জন্য তথ্য সংরক্ষণ ও কাঁচামালের সঠিক গুণগত মান সংরক্ষণ ইত্যাদি সহজতর। তবে প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি বিধায় এর প্রত্যাশিত বিস্তার লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সরকারের অনুকূল নীতিমালা, খামার এলাকায় রাস্তাঘাট উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সংযোগে অগ্রাধিকার, মানসম্পন্ন খাবার ও উপকরণের মানোন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, বেসরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত পিসিআর নেগেটিভ পোনা উৎপাদনের ব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তি ইত্যাদির সুযোগ সৃষ্টি করা হলে আধানিবিড় বাগদা চিংড়ি চাষ অধিকতর জনপ্রিয় হবে বলে আশা করা যায়।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

রাজশাহী অঞ্চলে বাণিজ্যিক রুইজাতীয় মাছ চাষের নতুন ধারা : নিরাপদ মাছ সরবরাহের সম্ভাবনা

New Dimension of Commercial Carp Culture in Rajshahi Region: Prospect of Safe Fish Supply

মোহাঃ গোলাম রাব্বানী[১], মোঃ বায়েজিদ আলম[২] ও ড. আলী মুহাম্মদ ওমর ফারুক[৩]

Abstract

In Bangladesh, freshwater aquaculture especially large carp culture has been made notable progress and a new dimension in recent years. Fish farmers of Rajshahi region are being practicing large-size carp production through large yearlings stocking at the density of 800-1000 per acre and 2-4% feeding of body weight with pelleted and farm-made feed. The size of fishes, based on species, attain about 2.5 to 5.5 kg in 9 to 10 months culture period. Fish production is around 2700 -3000 kg/Acre. Generally farmers marketed their fishes alive to the markets of the country including Dhaka. Per acre income from this intervention is around 8,00,000 BDT, production cost around 5,50,000 BDT and profit is around 2,50,000 BDT. The intervention of this eye–catching size of carp notably Rui and Catla production and marketing alive fish, has already managed to establish a brand namely "Live Carp Fish of Rajshahi" through out the country. This new dimension of carp production needs technological and logistic supports for development and sustainability of safe fish production as well as livelihood of the farmers.

আবহমান কাল থেকেই বাঙালির সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সাথে মাছ আহরণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আশির দশকের শুরুর দিকে দেশীয় রুইজাতীয় মাছের (major carp) সফল কৃত্রিম প্রজনন সম্ভবপর হওয়ায় মাছের চাষ বাণিজ্যিকভাবে আরম্ভ হয়। দেশি রুইজাতীয় মাছের সাথে বিদেশি রুইজাতীয় মাছের (exotic major carp) মিশ্রচাষ পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে বিস্তার লাভ করে এবং রুইজাতীয় মাছের মিশ্রচাষ প্রযুক্তি সারাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০২ সাল হতে রাজশাহী অঞ্চলের কিছু এলাকায় (পবা, পুঠিয়া, তানোর, নাটোর সদর, গুরুদাসপুর) কম মজুদ ঘনত্বে চাপের পোনা (yearling or over wintering) মজুদের মাধ্যমে বড় মাছ উৎপাদনের জন্য রুইজাতীয় মাছের মিশ্রচাষ শুরু হয়। বড় রুই, কাতলা মাছের ব্যাপক চাহিদা থাকায় সম্প্রতি রাজশাহী ও পার্শ্ববর্তী জেলার অনেক উদ্যোগী মৎস্যচাষি এ কৌশল অবলম্বন করে মাছ চাষ করছেন যা ইতোমধ্যেই অধিক উৎপাদন ও বাণিজ্যিক সফলতার এক নতুন মাত্রা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মাছ আমাদের আমিষের প্রধান উৎস। তাই তা স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু উৎপাদন ও বাজাতকরণের সময় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কিছু রাসায়নিক দ্রব্য ও জীবাণু যুক্ত হয়ে বা করার ফলে মাছ অনিরাপদ খাদ্যে পরিণত হতে পারে। যেমন মাছের পচন রোধে ক্ষতিকর ফরমালিন ব্যবহার করে মাছকে খাবার অনুপযোগী করা হচ্ছে। তাই নিরাপদ মাছের চাহিদা এখন সমধিক। বড় রুইজাতীয় মাছ উৎপাদন এবং জীবন্ত নিরাপদ মাছ বাজারজাতকরণের মাধ্যমে রাজশাহী অঞ্চলে রুইজাতীয় মাছচাষে এক নতুন মাত্রার সৃষ্টি হয়েছে, যা ইতোমধ্যেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ ধরনের মাছচাষ এলাকায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে অবদান রেখে চলেছে।

রুইজাতীয় মাছচাষের নতুন ধারা
(New Dimension in carp aquaculture)

প্রচলিত পদ্ধতিতে রুইজাতীয় মাছ প্রধানত নতুন পোনা মজুদ এবং জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে চাষ করা হয়। নতুন ধারার পদ্ধতিতে বড় আকারের পোনা কম ঘনত্বে মজুদ, সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করে চাষ করা হয়। এ ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। ফাইটোপ্লাংটন পরিমাণমত থাকায় দ্রবীভূত অক্সিজেন পর্যাপ্ত থাকে এবং পরিমাণমত খাদ্য পাওয়ায় মাছ দ্রুত বাড়ে, অল্প সময়েই বড় বড় আকারের হয়। বড় আকারের পোনা মজুদ করার ফলে মৃত্যুহার খুবই কম হয়। বড় আকারের রুই ও কাতল মাছকে প্রধান প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চাষে প্রধানত জৈব উপকরণ ব্যবহার এবং বাজারজাতকরণেও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় না বিধায় জীবন্ত এ মাছকে নিরাপদ মাছ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। চাষি অধিক মূল্যে মাছ বিক্রি করতে পারে। এ পদ্ধতিতে মাছচাষ ও জীবন্ত বাজারজাতকরণ রুইজাতীয় মাছচাষের সরচেয়ে লাভজনক পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রাজশাহী অঞ্চলে রুইজাতীয় মাছ উৎপাদনে চাষ পদ্ধতি

রাজশাহী অঞ্চলে রুইজাতীয় মাছ উৎপাদনে চাষ পদ্ধতি নিম্নরূপ:

পোনা সংগ্রহ ও লালন পুকুরে মজুদ

সাধারণত পদ্মা নদী থেকে সংগৃহীত প্রাকৃতিক রেণু বা প্রাকৃতিক পোনা সহজলভ্য না হলে মানসম্মত ব্রুড সম্বলিত সরকারি বা বেসরকারি হ্যাচারির রেণু থেকে উৎপাদিত ২.৫-৩.০ ইঞ্চি আকারের পোনা লালন পুকুরে মজুদ করা হয় যা পরবর্তী বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত চাপের পোনা মজুদ উপযোগী আকার (৫০০-৭০০ গ্রাম) পর্যন্ত লালন করা হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণত প্রতি একরে রুই ২০০০টি, কাতলা ৮০০টি, মৃগেল ১২০০টি এবং অন্যান্য মাছ ২০০টি মজুদ করা হয়।

মজুদ পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি

- বড় আকারের রুইজাতীয় মাছের মিশ্রচাষের জন্য সাধারণত সারা বছর ন্যূনতম ৫ ফুট গভীরতার পানি থাকে এমন ধরনের ১-৩ একর বা তদূর্ধ্ব আয়তনের পুকুর নির্বাচন করা হয়।
- পুকুরের পাড় ভাঙ্গা থাকলে মেরামত করতে হয় এবং পাড়ে আগাছা ও ঝোঁপঝাড় থাকলে অপসারণ করতে হয়। রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করার জন্য ৪ ফুট গভীরতার পুকুরে ৯-১০ কেজি/একর মাত্রায় ৯.১ শক্তি সম্পন্ন রোটেনন পাউডার প্রতি শতক জলকরে প্রতি ফুট গভীরতার জন্য ২৫ গ্রাম হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। এরপর প্রতি একরে ১০০ কেজি হরে পাথুরে চুন প্রয়োগ করা হয়। কোন কোন অগ্রসরমান (advanced) চাষি চুন দেওয়ার পাশাপাশি একরে ২৫-৩০ কেজি ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করেন যা জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি ক্যালসিয়াম সরবরাহ করে ভূমিকা রাখে।
- মজুদপূর্ববর্তী সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ৪৫ কেজি/একর মাত্রায় টিএসপি সার প্রয়োগ করা হয়। পুকুরের পানির রং হালকা সবুজ হলে পোনা মজুদ করা হয়।

চাষ পুকুরে পোনা মজুদ

এ ধরনের রুইজাতীয় মাছের চাষের ক্ষেত্রে একর প্রতি সাধারণত ৭৫০-১০৫০টি পোনা মাছ মজুদ করা হয়। রুই ও কাতল মাছকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে মজুদ করা হয়।

সারণি: চাষ পুকুরে প্রজাতিভিত্তিক মজুদ ঘনত্ব ও ওজন

ক্রমিক নং	প্রজাতি	মজুদ হার (সংখ্যা/একর)	মজুদকালীন গড় ওজন (কেজি/পিস)	মজুদকালীন মোট ওজন (কেজি/একর)
১	রুই	৪৮০	০.৬	২৮৮
২	কাতলা	১২০	০.৮	৯৬
৩	মৃগেল	২১০	০.৩	৬৩
৪	কমন কার্প	৯০	০.১	৯
৫	সিলভার কার্প	৩০	০.৩	৯
সর্বমোট		৯৩০টি		৪৬৫

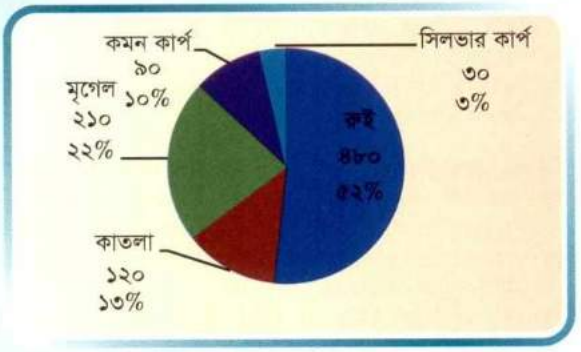

চিত্র: প্রতি একরে প্রজাতি ওজনভিত্তিক মাছ মজুদের পরিমাণ

মজুদপরবর্তী ব্যবস্থাপনা ও সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

- মজুদের পর হতে প্রতি ১০ দিন অন্তর একরে ১০- ১৫ কেজি হারে টিএসপি সার প্রয়োগ করা হয়।
- সম্পূরক খাবারের ক্ষেত্রে সাধারণত ন্যূনতম ২৫% প্রোটিন সমৃদ্ধ পিলেট খাবার দেহ ওজনের ২-৪% হিসেবে প্রদান করা হয়। কোনো কোনো চাষি কাঙ্ক্ষিত মাত্রার প্রোটিনযুক্ত ফার্ম-মেড খাবারও ব্যবহার করে থাকেন। সম্পূরক খাদ্য দু'ভাগ করে সকালে ও বিকালে প্রয়োগ করা হয়।
- প্রতি মাসে একরে ২০-২৫ কেজি চুন প্রয়োগ করা হয়। চুনের পাশাপাশি কোনো কোনো অগ্রসরমান চাষি মজুদের পর প্রতি ১৫ দিন অন্তর একরে ১০ কেজি জিওলাইট প্রয়োগ করেন যা পুকুরের তলার ক্ষতিকারক গ্যাস দূর করতে সাহায্য করে।
- অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণের জন্য রাতে পানি সেচ দেয়া হয়।

আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদ

মজুদের ৫ মাস পর মাছ ধরার আকার হলে ২০-৩৫% মাছ আহরণ করা হয় এবং সমসংখ্যক মাছ পুনঃমজুদ করা হয়। উল্লেখ্য, কোনো কোনো চাষি পুনঃমজুদ না করে অবশিষ্ট মাছকে বড় হওয়ার জন্য রেখে দেন। সাধারণত নির্দিষ্ট আকারের মাছ আহরণ করা হয়। এক্ষেত্রে মোট চাষকাল ৯-১০ মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে।

উৎপাদন ও আয়-ব্যয়

রুইজাতীয় বড় মাছ উৎপাদন পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদন ও অধিক মূল্য পাওয়ায় এ কার্যক্রম অধিক লাভজনক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। প্রতি একরে ৪৬৫ কেজি মাছ মজুদ করে ৩,১৯৫ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে যার বিক্রয় মূল্য ৭,৯৪,৮৮০ টাকা। এ মাছ উৎপাদন করতে ৫,৫৯,৭২৫ টাকা খরচ হওয়ায় নিট লাভ হয় ২,৩৫,১৫৫ টাকা। সুতরাং এ কার্যক্রম গ্রামীণ এলাকায় সবচেয়ে লাভজনক কার্যক্রম হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

চিত্র: বড় রুইজাতীয় মাছ আহরণ

সারণি: আহরণকালে প্রজাতিভিত্তিক মাছের গড় ও মোট ওজন এবং বিক্রয়মূল্য

ক্রমিক নং	প্রজাতি	মাছ আহরণ (সংখ্যা/একর)	আহরণকালীন গড় ওজন (কেজি/পিছ)	মোট ওজন (কেজি/একর)	গড় মূল্য (টাকা/কেজি)	মোট মূল্য (টাকা)
১	রুই	৪৮০	৩.৬	১৭২৮	২৫০.০০	৪৩২০০০.০০
২	কাতলা	১২০	৫.৪	৬৪৮	৩৫০.০০	২২৬৮০০.০০
৩	মৃগেল	২১০	২.১	৪৪১	১৮০.০০	৭৯৩৮০.০০
৪	কমনকার্প	৯০	৩.০	২৭০	১৫০.০০	৪০৫০০.০০
৫	সিলভারকার্প	৩০	৩.৬	১০৮	১৫০.০০	১৬২০০.০০
সর্বমোট		৯৩০ টি		৩১৯৫		৭৯৪৮৮০.০০

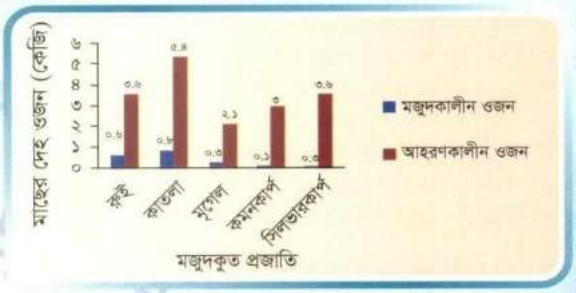

চিত্র: প্রজাতিভিত্তিক মজুদকালীন ও আহরণকালীন গড় ওজন

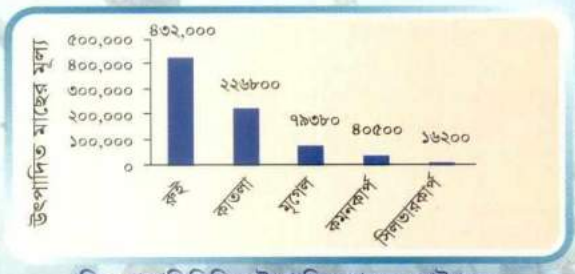

চিত্র: প্রজাতিভিত্তিক উৎপাদিত মাছের মোট মূল্য

সারণি: রুইজাতীয় বড় আকারের মাছ উৎপাদনের এক ফসলের ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব (প্রতি একর)

ব্যয়ের খাত	পরিমাণ/সংখ্যা	টাকা
পুকুর লিজ মূল্য	একর/বছর	১,০৫,০০০.০০
রোটেনন	৯ কেজি	২,৭০০.০০
চুন	৩২৫ কেজি	৪,২২৫.০০
টিএসপি সার	৩১৫ কেজি	৯,৪৫০.০০
পোনা	৪৬৫ কেজি	৮৮,৩৫০.০০
মাছের খাদ্য	৫,২৫০ কেজি	১,৬৮,০০০.০০
অ্যাকোয়া মেডিসিন	থোক	৩,০০০.০০
শ্রমিক	থোক	৪৮,০০০.০০
পানি সেচ	থোক	৬,০০০.০০
আহরণ	থোক	২৯,০০০.০০
পরিবহন	থোক	৯০,০০০.০০
অন্যান্য	থোক	৬,০০০.০০
মোট উৎপাদন ব্যয়	-	**৫,৫৯,৭২৫.০০**
উৎপাদিত মাছের মোট পরিমাণ	৩১৯৫ কেজি	৭,৯৪,৮৮০.০০
প্রকৃত মুনাফা		**২,৩৫,১৫৫.০০**

জীবন্ত রুইজাতীয় মাছ পরিবহন (Live carp marketing)

বর্তমানে নিরাপদ মাছ প্রাপ্তির বিষয়টি বহুল আলোচিত বিষয়। রাজশাহী অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত বড় আকারের রুইজাতীয় মাছ বর্তমানে জীবন্ত অবস্থায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন মাছের আড়তে বিক্রি হওয়ায় ক্রেতা সাধারণ ফরমালিনমুক্ত জীবন্ত মাছ কেনার সুযোগ পাচ্ছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, বাজারজাতকৃত বরফজাত মাছের তুলনায় জীবন্ত মাছের ক্ষেত্রে চাষিগণ প্রতি কেজিতে প্রায় ১০০ টাকা মূল্য বেশি পায়। জীবন্ত মাছ পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রতি ট্রাকে ৫০০-৬০০ কেজি মাছ পরিবহণ করা হয় এবং মাছকে জীবন্ত রাখতে ও সেই সঙ্গে পানির গুণাগুণ ভালো রাখতে পরিবহনকালে ১-২ বার পানি পরিবর্তন করতে হয়। বর্তমানে রাজশাহী হতে ঢাকায় ১৫০০০-১৬০০০ টাকা ট্রাক ভাড়ায় উল্লিখিত জীবন্ত মাছ পরিবহন করা হয়। এ হিসেবে জীবন্ত পরিবহনে কেজি প্রতি ৬০ টাকা খরচ হলে চাষি কেজি প্রতি প্রায় ৪০ টাকা অধিক মূল্য পেয়ে থাকে। জীবন্ত মাছ পরিবহনের জন্য বিশেষ সুবিধা সম্পন্ন মাছবাহী ট্রাকের (specialized vehicle for live fish transportation) প্রচলন/উন্নয়ন করা গেলে চাষিগণ আর্থিকভাবে আরো লাভবান হতে পারবে।

পুকুরের পরিবেশ ও মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা (Environment and health management)

- রোটেনন ব্যবহারের ফলে পানির পরিবেশ নিরাপদ থাকে।
- এ পদ্ধতিতে ইউরিয়া ব্যবহার হয় না বিধায় ফাইটোপ্লাংকটন ব্লুমের সম্ভাবনা কম থাকে।
- সপ্তাহে দুই দিন বিকেলে পুকুরের তলার বিষাক্ত গ্যাস দূর করার জন্য হররা টানা হয়।
- এ পদ্ধতিতে কোনো প্রকার গোবর বা পোল্ট্রি লিটার ব্যবহার হয় না ফলে পানির পরিবেশ ও মাছের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।
- সাধারণত প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত পোনা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিমিত ঘনত্বে মজুদ করা হয় বিধায় মাছের রোগ কম হয়।
- শীতের শুরুতে এবং মাঝে প্রতি শতকে ৫০০ গ্রাম মাত্রায় লবণ এবং চুন ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে একরে ৬-৮ কেজি হারে ব্লিচিং পাউডার অথবা ১৫০-২০০ গ্রাম হারে টিমসেন জাতীয় জীবাণুনাশক ব্যবহার করা হয়।
- সাধারণত মাছের উকুন এবং পুকুরে ক্ষতিকর ও অবাঞ্ছিত পোকা দেখা যায়। এক্ষেত্রে ডেল্টামেথ্রিন, সাইপারমেথ্রিন জাতীয় ঔষধ অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার কারা হয়।
- সম্প্রতি উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (GAP) বিষয়ে প্রশিক্ষণের ফলে নিরাপদ কার্পজাতীয় মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সচেতনতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রধানত জৈবিক উপকরণ ব্যবহারে চাষ হয় বিধায় এ মাছ মানব স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ।

নিরাপদ রুইজাতীয় বড় আকারের মাছ উৎপাদনে চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

- রাজশাহী অঞ্চল খরাপ্রবণ হওয়ায় এবং পানি প্রাপ্তির অভাবে সাধারণত বেশির ভাগ পুকুর সম্পূর্ণ শুকানো যায় না, ফলে
- রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি, পানির গুণাগুণ খারাপ হওয়াসহ চাষ ঝুঁকির মধ্যে পতিত হয়।
- বড় আকারের রুইজাতীয় মাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধির জন্য পোনার গুণাগুণ বজায় রাখা অপরিহার্য। পোনা খারাপ হলে ছোট আকারের মাছে ডিম আসে, বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- রোগ নিয়ন্ত্রণ ও পানির গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য চাষির বিভিন্ন ওষুধ এবং রাসায়নিক দ্রব্য অতিমাত্রায় ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে, ফলে পুকুরে রেসিডুয়াল ইফেক্টের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে।
- সম্প্রতি অধিকাংশ চাষি বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি পিলেট খাবার ব্যবহার করে, ফলে খাবারের গুণাগুণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এবং কৃষি সেচে ডিপ টিউবয়েলের মাধ্যমে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে রাজশাহী অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে। খরা প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে পুকুরের পানি ধারণক্ষমতা কমে পর্যাপ্ত পানি ধরে রাখা কঠিন হচ্ছে।

উপসংহার (Conclusion)

জৈবিকভাবে উৎপাদিত বড় আকারের রুইজাতীয় মাছ সুস্বাদু হওয়ায় বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং বাজার দরও বেশি। বর্তমানে এ পদ্ধতি টেকসইভাবে রাজশাহীর পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকায় সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে এর আরও সম্প্রসারণের জন্য গবেষণার পাশাপাশি প্রকল্প গ্রহণ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বাজারেও এসব বড় রুইজাতীয় মাছ প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি করা সম্ভব। বড় রুইজাতীয় মাছের এই চাষ পদ্ধতি পরিবেশবান্ধব ও স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। রুইজাতীয় মাছ চাষে এ নতুন প্রচেষ্টাকে আরো উন্নত প্রযুক্তি সুবিধা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হলে নিরাপদ আমিষ সরবরাহে ও এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

[১]জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[২]সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[৩]সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনা
Open Water Fisheries Management

মোঃ মিজানুর রহমান[১] ও মোঃ মনজুরুল ইসলাম[২]

Abstract

Bangladesh is an agro-based riverine country enriched with vast fisheries resources. In 2013 major portion of total fish production (82.73%) of the country comes from inland water bodies, where inland open water bodies and inland closed water bodies contributes 28.19% and 54.54% respectively . In recent years Bangladesh developed significant advancement in inland closed water aquaculture production whereas the production of inland open water bodies is decreasing alarmingly. Sustainable Community Based Open Water Management is the key factor to increase the fish production in inland open water bodies of the country. `Establishment of Beel Nursery and Fingerling Stocking in Inland Open Waters' project is being implemented by the Department of Fisheries (DoF) to enhance the production of inland open water bodies. Through this project Community Based Organizations (CBO) are directly involved through this project in production enhancing activities like establishing beel nursery, fingerling stocking in open water bodies.Sustainable open water management will ensure an additional 100000 MT of fish in Inland open water bodies under this project.

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়সমূহ মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত। বিশাল অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ হলেও আহরিত মৎস্যের পরিমাণ ও প্রজাতি বৈচিত্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়সমূহে মৎষ্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাছ উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ স্থান অর্জন করলেও মুক্ত জলাশয়ের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ, কৃষি ফসল উৎপাদনে নির্বিচারে কীটনাশকের ব্যবহার, শিল্প-কলকারখানার বর্জ্য দ্বারা নদী দূষণ, নদী নালার নাব্যতা হ্রাস, খালবিল ভরাট হওয়া, মাছের প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস হওয়া, মাছের চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে মুক্ত জলাশয় সমূহের উৎপাদন নিয়মিতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমাজভিত্তিক কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা না থাকায় মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ষাট বা সত্তর দশকের প্রথম ভাগে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগের অধিক যোগান দিত মুক্ত জলাশয়। বাংলাদেশে নদী ও মোহনাঞ্চল, সুন্দরবন, বিল, হাওর, বাঁওড়, ছড়া, কাপ্তাই লেক ও প্লাবনভূমিসহ ৩৯.১৭ লক্ষ হেক্টর মুক্ত জলাশয় আছে। ২০১২-১৩ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মাছ উৎপাদন তেমন বৃদ্ধি পায়নি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মাছের চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মুক্ত জলাশয়সমূহকে সমাজভিত্তিকভাবে উৎপাদনমুখী করা একান্ত প্রয়োজন।

উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা
(Open Water Management)

আমাদের দেশের বিশালায়তন মুক্ত জলাশয়সমূহকে মাছের নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে গড়ে তোলা এবং মাছের মজুদ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করাই উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্য। মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনার মূল উপাদান হিসেবে বিল নার্সারি স্থাপন, পোনা অবমুক্তকরণ ও অভয়াশ্রম স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সমাজভিত্তিক গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে টেকসই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

সমাজভিত্তিক সংগঠন গঠন
(Forming Community Based Organization)

সমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) হলো কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার সচেতন এবং সমমনা নাগরিকগণের নিজস্ব চাহিদা ও উদ্যোগে পরিচালনাধীন একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় সুফলভোগী সিবিও

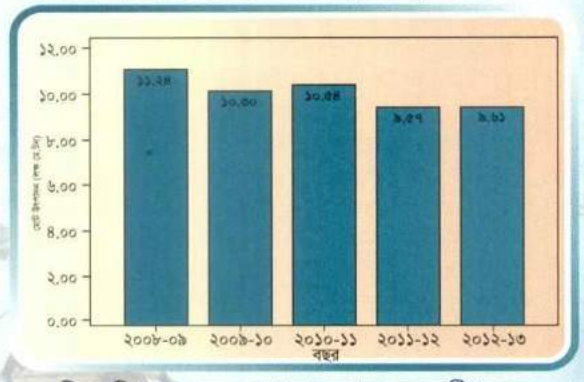

চিত্র: বিগত ৫ বছরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের তুলনামূলক উৎপাদন (ডিওএফ ২০১২-১৩)।

সদস্যগণ মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। বিলের/জলাশয়ের তীরবর্তী/নিকটবর্তী গ্রামের মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষি, ভূমি মালিক, ভূমিহীন, দরিদ্র, নিঃস্ব, দুঃস্থ মহিলা, বেকার যুবক/যুব মহিলা সমন্বয়ে কমিউনিটি দল গঠিত হবে। সুফলভোগী সিবিও সদস্যদের যথাযথ উদ্বুদ্ধকরণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমেই কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মাছ উৎপাদন প্রত্যাশিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব। সিবিও সদস্যগণ মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম যেমন বিল নার্সারি স্থাপন, পোনা অবমুক্তকরণ, অভয়াশ্রম স্থাপন প্রভৃতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন।

সিবিও'র সাধারণ কার্যক্রম
(General actvities of CBO)

- মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত কার্যক্রমের (বিল নার্সারি স্থাপন, পোনা অবমুক্তকরণ, অভয়াশ্রম স্থাপন প্রভৃতি) পর সংশ্লিষ্ট বিলের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং কমপক্ষে ৩-৪ মাস, স্থানভেদে ৬ মাস পর্যন্ত সুফলভোগীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্ধারিত জলাশয়ে মৎস্য আহরণে বিরত রাখা এবং মৎস্য আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা।
- সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিসারের সহযোগিতা/পরামর্শক্রমে সকল সিবিও তাদের সদস্যদের সঞ্চয় এর ব্যবস্থা করবে এবং চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করবে। সংগৃহীত চাঁদা সিবিও কমিটির ব্যাংক হিসাবে জমা থাকবে।
- সাংগঠনিক যেকোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সাধারণ সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের অনুমোদন নিতে হবে এবং মাছ আহরণযোগ্য হবার পর সিবিও এর তত্ত্বাবধানে সকল সদস্য একত্রে মৎস্য আহরণ করবেন এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা রাখবেন।

সিবিওসমূহকে বাংলাদেশ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে এবং প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র থাকতে হবে। কমিউনিটি দলের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সিবিও সদস্যগণ তাদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবে।

কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যপরিধি
(TOR of Executive committee)

- কমিটি সকল সদস্যের পক্ষে সংশ্লিষ্ট জলাশয় ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সকল সদস্যকে সাধারণ সভায় অবগত করবে, প্রয়োজনে সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের অনুমোদন নেবে। প্রতি মাসে সিবিও তাদের সকল সদস্য নিয়ে কমপক্ষে একবার সাধারণ সভা করবে।
- কমিটি আর্থিক বিষয়াদি পরিচালনা এবং সংগঠনের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করবে
- কমিটি সার্বক্ষণিকভাবে সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিসারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং তালিকাভুক্ত সুফলভোগীগণ যাতে মৎস্য আইনের বাস্তবায়নসহ অন্যান্য দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালন করে তা নিশ্চিত করবে।
- মৎস্য আহরণের পর কার্যনির্বাহী কমিটি একটি সাধারণ সভা আহবান করবে। উক্ত সভায় বার্ষিক প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা হবে এবং মাছ বিক্রয় হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশের ৬০% অর্থ আনুপাতিক হারে সিবিওর সাধারণ সদস্যেদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। অবশিষ্ট ৪০% অর্থ ব্যাংক হিসাবে জমা হবে। পরবর্তী বছরসমূহে জমাকৃত অর্থ ব্যয় করে নিজেরাই মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যেমন পোনা মজুদ, বিল নার্সারি স্থাপন ও অভয়াশ্রম স্থাপনসহ যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করবে। এভাবে সিবিও সমূহের ও এর কার্যাবলির স্থায়িত্বশীলতা বজায় থাকবে এবং সার্বিকভাবে এর সদস্যদের জীবন-জীবিকার মানোন্নায়ন ঘটবে।

আমাদের দেশে নদ-নদী, মোহনা, প্লাবনভূমি, খাল-বিলসহ প্রায় ১৪ হাজার মুক্ত জলাশয় বিদ্যমান যার আয়তন ৩৯.১৭ লক্ষ হেক্টর (ডিওএফ ২০১২-১৩)। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে এ বিশালায়তনের জলাভূমিতে উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাংলাদেশে মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, মরা নদী, ছড়া, পোল্ডার, নদীর কোল প্রভৃতিতে পোনা মজুদ কার্যক্রম, বিল নার্সারি স্থাপন, অভয়াশ্রম স্থাপন ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

পোনা মজুদ কার্যক্রম
(Fingerling stocking)

দেশের সকল খাস ও সরকারি জলাভূমি এবং বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবণভূমিতে পোনা মজুদ করা সম্ভব নয় বিধায় আর্থসামাজিক দিক দিয়ে উপযুক্ত এমন জলাভূমিতে পোনামাছ মজুদ করতে হবে যাতে সংলগ্ন এলাকার সকল স্তরের লোকই সুফলভোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হয়। সারা বছর বা বর্ষা মৌসুমে বা ন্যূনতম ৪-৬ মাস পানি থাকে এমন জলাভূমি পোনা মজুদের জন্য নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত জলাভূমিতে রুই জাতীয় মাছের ১০-১২ সেমি আকারের সুস্থ-সবল পোনা অবমুক্ত করতে হবে। এছাড়া দেশীয় প্রজাতির অন্যান্য মাছ যেমন- শিং, মাগুর, ফলি, চিতল, মেনি, পাবদা, কৈ, বাটা, বাইন, গুতুম, খলিশা ও গুলশা ইত্যাদি নির্বাচিত জলাভূমিতে অবমুক্ত করলে সাথে সাথে দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। বর্ষা মৌসুমের মধ্যে পোনামাছ মজুদ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সবচেয়ে উত্তম। তবে বর্ষার পরেও যে সকল বিল/জলাশয়/জলাভূমিতে অন্তত ৪ মাস সময়ের জন্য মাছ চাষ উপযোগী পানি থাকে সে সকল জলাভূমিতে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

বিল নার্সারি স্থাপন কার্যক্রম
(Establishment of beel nursery)

শুকনো মৌসুমে যেসব উন্মুক্ত জলাশয়ে ৩-৪ মাস পানি থাকে এবং রেণু চাষ ও ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান, এরকম বিল/জলাশয় বিল নার্সারি স্থাপন কার্যক্রমের জন্য নির্বাচন করতে হয়। বিশেষ করে নির্বাচিত বিলের অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় (শুকনো মৌসুমে ২-৩ ফুট পানি থাকে) বিল নার্সারি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করতে হয়। বিল/জলাশয়ের তীরবর্তী ও পার্শ্ববর্তী দরিদ্র জনগণের মধ্য থেকে সিবিও গঠনের মাধ্যমে বিল নার্সারি কার্যক্রম পরিচালিত করতে হবে। নির্ধারিত জলাভূমিতে রুইজাতীয় মাছের (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস, ঘনিয়া) এবং একইভাবে দেশীয় প্রজাতির অন্যান্য মাছ (কৈ, শিং, মাগুর, ফলি, চিতল, মেনি, পাবদা, গুলশা ইত্যাদি)-এর উত্তম কৌলিতাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন রেণু লালন-পালন করতে হবে। শীতের শেষে ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে যখন তাপমাত্রা রেণু লালনের উপযুক্ত হয় এবং মাছের রেণু পাওয়া যায় তখন বিল নার্সারিতে রেণু মজুদ করতে হবে। রেণু ছাড়ার আগে মাটি ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষা, পাড় ও তলা মেরামত, চুন ও সার প্রয়োগ, প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা, জলজ পোকা দমন প্রভৃতি সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। বিল নার্সারি স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়নে রাক্ষুসে মাছ নিধনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

অভয়াশ্রম স্থাপন
(Establishment of fish sanctuary)

ডিমওয়ালা মাছের নিরাপদ সংরক্ষণ, অবাধ প্রজনন, প্রজনন ক্ষেত্র ও পোনা মাছ সংরক্ষণের জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়ে থাকে। অভায়শ্রম স্থাপন হলো কোনো জলাশয়ে বা জলাশয়ের নির্দিষ্ট স্থানে আহরণ প্রবেশাধিকার ও আহরণ প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রণ, আহরণ সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ, মজুদ সমৃদ্ধকরণসহ প্রভৃতি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন। মৎস্যসম্পদের সার্বিক উৎপাদান বৃদ্ধি তথা জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে অভয়াশ্রম স্থাপন ও সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণার মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ে টেকশই উৎপাদন সম্ভব।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন
(Implementation of fish conservation law)

উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ রক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের গুরুত্ব অপরিহার্য। এক্ষেত্রে সমাজের মানুষকে সচেতন করে তোলা এবং সমাজভিত্তিক গ্রুপের মাধ্যমে তাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করা সময়ের দাবি। মৎস্যজীবী/জেলেদের পাশাপাশি আমাদের সকলের বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে মৎস্য আহরণ থেকে বিরত থাকা, ছোট প্রজাতি/ডিমওয়ালা মাছ না ধরা, মৎস্য আহরণ সরঞ্জামাদি ব্যবহারে সচেতন হওয়া একান্ত জরুরি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর 'উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সারা বাংলাদেশে (৬০টি জেলা) পর্যায়ক্রমে মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া সমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) গঠন করে কমিউনিটি মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রকল্প মেয়াদে ২১,০০০ জন কমিউনিটি সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপজেলা পর্যায়ে ৮৪০টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করার ব্যবস্থা রয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় ১০৫০ হেক্টর বিল নার্সারি স্থাপন এবং ২ লক্ষ হেক্টর জলায়তনে প্রায় ৫,০০০ মে.টন পোনা অবমুক্ত করা হবে। প্রকল্পের কার্যক্রমকে অবহিতকরণ ও সংগঠিত করার জন্য জেলা পর্যায়ে ৬০টি এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ২টি কর্মশালার আয়োজন করা হবে। প্রকল্পটি নিম্নোক্ত কয়েকটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- বিল নার্সারি স্থাপনের মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি করা।
- পোনা মজুদকরণের মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- জলাশয় পার্শ্ববর্তী ও তীরবর্তী দরিদ্র জনগোষ্ঠী, মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি মজুদের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা।
- নির্বাচিত জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ের প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর এ পর্যন্ত সারাদেশে ৩৩০টি উপজেলায় ৫০০ মে.টন (আকার: ১০-১৫ সেমি) পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ১৪৬টি উপজেলায় ২৯৬টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষি ও সিবিও সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৭৫টি উপজেলায় ২৯৭টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ এবং প্রকল্পের কার্যক্রমকে অবহিতকরণ ও সংগঠিত করার জন্য ৩৫টি জেলায় কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে পোনা মজুদ/বিল নার্সারি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের জন্য বেইজলাইন তথ্য (জলাশয়ের নাম, আয়তন, গভীরতা, প্রাপ্ত মাছের প্রজাতি, বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি, সুফলভোগীর সংখ্যা প্রভৃতি) সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। একইসাথে প্রকল্পভুক্ত জলাশয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত তথ্যাদি (কার্যক্রম পূর্ব ও পরবর্তী উৎপাদন, মাছের প্রজাতি, সুফলভোগীর সংখ্যা প্রভৃতি) সংগ্রহ করা হচ্ছে যাতে বাংলাদেশের মুক্ত জলাশয়সমূহে সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা যায়। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন হলে প্রকল্প মেয়াদে বাংলাদেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন সম্ভব হবে পাশাপাশি জলাশয় সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি সদস্যবৃন্দ প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হবেন।

চিত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ কপোতাক্ষ নদে পোনা অবমুক্ত করেন

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রায় শতকরা ৭০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য কার্যক্রমের (চাষ, উৎপাদন, বিপণন, শ্রম প্রদান প্রভৃতি) সাথে জড়িত। সুতরাং এ জনগোষ্ঠীকে সমাজভিত্তিক মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলা এবং কার্যক্রম চলমান রাখা খুবই জরুরি। মুক্ত জলাশয় হতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে মৎস্য আইন ও বিধিসমূহের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় সম্পদ সংরক্ষণ, সরকারি উদ্যোগে নির্দিষ্ট জলাশয়সমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক পোনা মজুদ, বিল নার্সারি স্থাপন, মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, মৎস্য আবাসস্থল পুনরুদ্ধারসহ মৎস্যজীবীদের ব্যাপক সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে এর ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষ সাধন করে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

[১]প্রকল্প পরিচালক, উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[২]মূল্যায়ন কর্মকর্তা, উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ঢাকা বিভাগের সংযোগ মৎস্যচাষি কার্যক্রম : একটি সফল মৎস্য সম্প্রসারণ উদ্যোগ
Contact Farming in Dhaka Division : A Successful Extension Initiative

ফরিদা বেগম[১] ও এস এম রেজাউল করিম[২]

Abstract

Extension of fisheries technology is a mandatory work for the Department of Fisheries. There were many extension processes adopted in the Department like RD-FF, LEAF under Fourth Fisheries Project, National Agricultural Extension Project and Union project etc. `Contact Fish Farmer' is a new extension process innovated by Deputy Director, Dhaka Division in 2014 which is conducted with zero government investment. Mininum one contact farmer was selected from each union of every Upazila and every district under Dhaka division. There were 3 packages named carp polyculture, pangus monoculture and tilapia monoculture. The production target was 7.0 MT/hectare for carp polyculture, 50 MT/hectare for pangus monoculture and 25 MT/h for tilapia monoculture The baseline production of carp, pangus and tilapia was 4.14 MT/ha, 43.67 MT/hectare and 15.00 MT/hectare respectively in 2013 whereas the average prodution achieved in 2014 was 6.31 MT/hectare, 49.55 MT/hectare and 22.42 MT/hectare for carp, pangus and tilapia. The production was increased 50.96%, 13.46% and 50.37% for carp, pangus and tilapia culture respectively. Mr. Md. Shahinul Islam was the highest scorer contact farmer among 1510 in Dhaka division who showed the production 10.01 MT/hectare in carp culture in Tangail Sadar Upazila, Tangail.

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এদেশের যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-দীঘি-ডোবা ইত্যাদি যা থেকে মৎস্য উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু মৎস্য উৎপাদনে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এখনো আমরা পিছিয়ে আছি। যার অন্যতম কারণ হলো মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় আমাদের উদ্যোগ ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব। তাই প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ দেশের বিস্তৃত জলরাশিতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার কোনো বিকল্প নেই। আর সে কারণেই মৎস্যচাষের প্রযুক্তি সম্প্রসারণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এলক্ষ্যে জনগণকে ব্যাপকভাবে মৎস্যচাষ কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রত্যেকটা কৌশলই কোনো না কোনোভাবে মাছ চাষ ও মৎস্য উৎপাদনের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। যথা: (ক) ট্রিকল ডাউন পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প; (খ) ময়মনসিংহ মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ঋণ নিশ্চয়তা তহবিলসহ তদারকি সংযোগ চাষি কার্যক্রম; (গ) দ্বিতীয় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম; (ঘ) উপজেলা পর্যায়ে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প; (ঙ) জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প এবং (চ) ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প। এসব প্রকল্প থেকে কোনো না কোনোভাবে অর্থনৈতিক সুবিধা দেয়া হয়েছে। কারণ যে কোনো পদ্ধতি চালু করার সময় প্রথমে অর্থনৈতিক সুবিধা দিয়ে জনগণকে অভ্যস্ত করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক সময় কৃষি জমিতে সারের ব্যবহার শেখাতে চাষিকে বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে সার বিতরণ করা হত। জনগণ যখন এ সারের উপকারিতা বুঝতে পারল এবং সার ব্যবহারে অভ্যস্ত হলো তখন তারা চড়া দামে তা কিনে নিয়ে জমিতে দিতে শুরু করে। এসব সম্প্রসারণ পদ্ধতির ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিক সুবিধা দেয়া ছাড়াই স্বপ্রণোদিতভাবে সম্প্রসারণ কাজ চালানোর জন্য চাষিদেরকে উৎসাহ দিয়ে ঢাকা বিভাগের উপপরিচালকের উদ্যোগে 'সংযোগ মৎস্যচাষি' কার্যক্রম চালু করা হয় যা প্রকৃতপক্ষে একটা সফল ইনোভেশন। ২০১৪ সাল থেকে এ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রযুক্তি সম্প্রসারণের কাজ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে।

সংযোগ মৎস্যচাষি ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of contact fish farmer management)

- উত্তম মৎস্যচাষ পদ্ধতি অনুশীলন (GAP) বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
- প্রতি ইউনিয়নে সর্বনিম্ন এক জন করে সংযোগ মৎস্যচাষি নির্বাচন করা।
- সংযোগ চাষি সেই ব্যক্তিকেই নির্বাচন করা হবে যার নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে মাছ চাষের সামর্থ্য, আগ্রহ ও সৃজনশীলতা রয়েছে। তার পুকুর হতে হবে নিজস্ব অথবা দীর্ঘমেয়াদি ইজারাপ্রাপ্ত।
- চাষি মৎস্য কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ব্যক্তিগত অর্থ খরচ করে মাছ চাষ করবে। সরকারিভাবে কোনো অর্থনৈতিক সুযোগ দেয়ার অঙ্গীকার করা হবে না।
- মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা সংযোগ মৎস্যচাষিকে মাছ চাষের নিয়ম কানুন হাতে-কলমে শিখিয়ে দেবেন এবং সংযোগ চাষির সাথে উপজেলা কর্মকর্তার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকবে। সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে একাজ করতে হবে।
- সংযোগ মৎস্যচাষির পুকুর প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মাছ আহরণ পর্যন্ত সকল কাজ উপজেলা কর্মকর্তার সরাসরি নির্দেশনা মোতাবেক চলবে।

- কর্মকর্তা অবশ্যই নির্বাচিত সংযোগ চাষির পূর্ব বছরের পুকুরের উৎপাদন, আয়-ব্যয় ও আর্থসামাজিক বিষয়ের ওপর জরিপ পরিচালনা করবেন। আর কর্মকর্তা সরজমিনে উপস্থিত হয়ে তাকে পরামর্শ প্রদান করবেন।
- নির্বাচিত পুকুরগুলো প্রদর্শনী পুকুর হিসেবে বিবেচিত হবে।
- কর্মকর্তাদের কর্মসম্পাদন (performance) বিচার করা হবে সংযোগ মৎস্যচাষির সফলতার ভিত্তিতে।
- প্রদর্শনী পুকুরের সফলতা দেখানোর জন্য উপজেলা কর্মকর্তা নিজ উদ্যোগে ইউনিয়নের অন্যান্য চাষিদেরকে একত্রিত করবেন।

সংযোগ মৎস্যচাষি কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল

(Implementation technique of contact fish farmer activities)

চাষি নির্বাচন

সংযোগ মৎস্যচাষির বৈশিষ্ট্য মূলত এলাকাভিত্তিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাভেদের ওপর নির্ভরশীল। তবে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

- পুকুরের মালিকানা চাষির নিজের হতে হবে অথবা লিজভুক্ত হলে তা দীর্ঘমেয়াদি হতে হবে;
- পুকুরটি অবশ্যই মাছ চাষের উপযোগী হতে হবে;
- প্রতি ইউনিয়ন হতে কমপক্ষে একজন করে চাষি নির্বাচন করতে হবে;
- চাষিকে সংযোগ মৎস্যচাষি হিসেবে স্বপ্রণোদিতভাবে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে;
- লিখতে পড়তে এবং হিসাব রাখতে সক্ষম এমন চাষি নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্কুল কলেজের শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ও বেকার শিক্ষিত যুবকদের প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে; এবং
- নির্বাচিত চাষিকে উদ্যোগী ও সৃজনশীল হতে হবে।

প্রযুক্তি ব্যবহার

তিনটি প্যাকেজের ভিত্তিতে সংযোগ মৎস্যচাষি নির্বাচন করা হয় যা নিম্নরূপ:

- কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ;
- পাঙ্গাস মাছের একক চাষ; এবং
- তেলাপিয়া মাছের একক চাষ।

প্রচলিত নিয়মে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের পরিবর্তে কোনো না কোনো চাষির পুকুর পাড়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণের জন্য কর্মকর্তাগণ নিজ উদ্যোগে অথবা বিভিন্ন সময়ে অধিদপ্তরের চলমান প্রশিক্ষণ কোর্সে সকল ইউনিয়ন থেকে সংযোগ মৎস্যচাষিদেরকে সুবিধামত স্থানে প্রশিক্ষণের আয়োজন করবেন। অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষিত চাষির সকল কার্যক্রম প্রতিনিয়ত মনিটরিং করবেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। চাষিরাও সার্বক্ষণিকভাবে কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করবেন। পুকুর প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মাছের চূড়ান্ত আহরণ পর্যন্ত সকল কাজ কর্মকর্তার পরামর্শ ছাড়া করবে না। সংযোগ মৎস্যচাষির সফলতা দেখে অন্যান্য চাষিরাও উদ্বুদ্ধ হবে। তাছাড়া সংযোগ মৎস্যচাষি নিজেও অন্যান্য চাষিদেরকে পরামর্শ প্রদান করবে। ঢাকা বিভাগের সংযোগ মৎস্যচাষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মধ্যে কোনো সরকারি বিনিয়োগ নেই। অর্থাৎ তার প্রদর্শনী খামার পরিচালনার জন্য কোনো সরকারি অনুদান দেয়া হয় না। চাষিকে প্রেরণা দিয়ে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কাজ করার জন্য তৈরি করা হয়। অন্যান্য সম্প্রসারণ অ্যাপ্রোচের সাথে সংযোগ মৎস্যচাষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মূলত পার্থক্য এখানেই। তবে এ কাজ কিছুটা দুরূহও বটে। কারণ অর্থনৈতিক সহযোগিতা ছাড়া চাষি নির্বাচন করা কিছুটা কঠিন। এখানে প্রেরণাটাই সম্বল।

মৎস্য উৎপাদনে সংযোগ মৎস্যচাষি কার্যক্রমের প্রভাব

সরকারি অনুদান ব্যতীত সংযোগ মৎস্যচাষি নির্বাচন কঠিন হলেও এ ব্যবস্থাপনায় মাছের উৎপাদন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। ১৫১০ জন সংযোগ চাষির ২০১৩ সালের বেইজলাইন উৎপাদন ছিল ৮৬৫০ মে.টন। আর ২০১৪ সালে মোট উৎপাদন হয়েছে ১১২১০ মে.টন। অর্থাৎ ২০১৪ সালে ১৫১০ জন সংযোগ চাষির মাধ্যমে ২৫৬০ মে.টন মাছ অতিরিক্ত উৎপাদিত হয়েছে যেখানে সরকারি বিনিয়োগ ছিল শূন্য (০)। ঢাকা বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ এ কার্যক্রম খুবই আন্তরিকভাবে বাস্তবায়ন করেছেন।

প্যাকেজের নাম	উৎপাদন (মে.টন)			বৃদ্ধির হার	সর্বোচ্চ গড় উৎপাদন (মে.টন)	মোট উৎপাদন (মে.টন)		
	২০১৩	২০১৪						
	বেইজলাইন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন			২০১৩	২০১৪	মোট বৃদ্ধি
কার্প	৪.১৮	৭.০০	৬.৩১	৫০.৯৬%	১০.১০	৮৬৫০	১১২১০	২৫৬০
তেলাপিয়া	১৫.০০	২৫.০০	২২.৪২	৫০.৩৭%	২৭.০০			
পাঙ্গাস	৪৩.৬৭	৫০.০০	৪৯.৫৫	১৩.৪৬%	৫২.০০			

প্রশিক্ষণ, মনিটরিং ও পরামর্শ প্রদান

সংযোগ মৎস্যচাষি নির্বাচনের পর মাছ চাষের বিভিন্ন দিক ও কলাকৌশলের ওপর প্যাকেজভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে দক্ষ চাষি হিসেবে আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যে বিগত ২০১৪ সালের নির্বাচিত ১৫১০ জন সংযোগ মৎস্যচাষির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংযোগ মৎস্যচাষি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং পুরস্কৃত হয়েছেন টাঙ্গাইল সদর উপজেলার করটিয়া ইউনিয়নের জনাব মোঃ শাহীনূল ইসলাম।

শ্রেষ্ঠ সংযোগ মৎস্যচাষি জনাব মোঃ শাহীনূল ইসলামের সাফল্যগাঁথা

ধলেশ্বরী বিধৌত টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার করটিয়া ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম বীরপুশিয়া। সদর উপজেলা থেকে ১০ কিমি দূরে অবস্থিত তার মৎস্য খামার। এ মৎস্য খামারের স্থপতি জনাব মোঃ শাহীনূল ইসলাম। লেখাপড়ার পাশাপাশি কিশোর বয়স থেকেই তিনি মাছ চাষের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৯১ সালে এমকম পাশ করেন। তারপর তিনি পুরোপুরি মনোযোগ দেন মাছ চাষের দিকে। প্রথম দিকে তিনি আশপাশের চাষিদের কাছে পরামর্শ নিয়ে মাছ চাষ করতেন। দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই চলতে থাকে তার মাছ চাষ কার্যক্রম। পরবর্তীতে তিনি যোগাযোগ করেন মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে। ২০১৪ সালে তাকে অধিদপ্তরের আওতায় সংযোগ মৎস্যচাষি হিসেবে নির্বাচন করা হয়। তিনি তার পুকুরের পাড়ে মৎস্য সংযোগ চাষির একটি সাইনবোর্ডও স্থাপন করেন। সাধারণ মানুষের গতানুগতিক চাষ পদ্ধতি ছেড়ে তিনি আসেন মৎস্য অধিদপ্তরের সৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের দিকে।

চাষ পদ্ধতি

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান তাকে প্রতি শতাংশে ৯টি প্রজাতির মোট ৫০টি করে রুইজাতীয় মাছের পোনা মজুদের পরামর্শ প্রদান করেন। সে হিসেবে তিনি তার ৮০ শতাংশ পুকুরে মোট ৪০০০টি পোনা মজুদ করেন এবং পরবর্তীতে আংশিক আহরণের সময় আরও ৬৫৭টি মাছ পুনঃমজুদ করেন। তিনি তার পুকুরে চাপের পোনা (আগের বছরের মজুদকৃত পোনা) মজুদ করেন। অধিকাংশ পোনার গড় ওজন ছিল ১০০ গ্রাম। তবে পুনঃমজুদকালে তিনি অপেক্ষাকৃত বড় আকারের পোনা মজুদ করেন। প্রাথমিক পোনা মজুদ, আহরণ ও পুনঃমজুদের হার ছিলো নিম্নরূপ:

প্রজাতি	প্রাথমিক পোনা মজুদ		পুনঃমজুদ		পুনঃমজুদসহ মোট মজুদ		মোট আহরণ		মন্তব্য
	সংখ্যা	কেজি	সংখ্যা	কেজি	সংখ্যা	কেজি	সংখ্যা	কেজি	
সিলভার কার্প	৮০০	৫৬	৯৬	৯	৮৯৬	৬৫	৮৪০	৯৪১	পুকুরের মোট আয়তন ছিল ৮০ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে নীট উৎপাদন ১০.০১ মে.টন/হেক্টর
কাতলা	৩২০	১৯	১৯০	৩৭.৫	৫১০	৫৬.৫	৪৮২	৪৩৯	
বিগহেড	৩২০	২৪	০	০	৩২০	২৪	২৯৭	৩৭১	
গ্রাসকার্প	১৬০	১১	০	০	১৬০	১১	১৫৫	২৩৭	
রুই	৬৪০	৩৩	১২৭	১৯.৫	৭৬৭	৫২.৫	৭৫৫	৩৭১	
মৃগেল	৪৮০	১৮	৮১	১৩	৫৬১	৩১	৫২৫	২৪৮	
কমনকার্প	২৪০	১৬	০	০	২৪০	১৬	২১২	২৩০	
ব্লাককার্প	৮০	৮	০	০	৮০	৮	৭৭	১৪৮	
সরপুঁটি	৯৬০	১০	১৬৩	৫.৫	১১২৩	১৫.৫	১০৭৯	২৮৫	
মোট	৪০০০	১৯৫	৬৫৭	৮৪.৫	৪৬৫৭	২৭৯.৫	৪৪২২	৩২৭০	

তিনি কর্মকর্তার পরামর্শ মোতাবেক পুকুরে দিনে দু'বার তৈরি (পিলেট) খাবার প্রয়োগ করেন। প্রতিদিন সকালে তিনি গড়ে ৩ ঘণ্টা নিজস্ব বোরিং থেকে পুকুরে পানি সরবরাহ করেন। অতিরিক্ত পানি পুকুর থেকে বের করে দেয়ার ব্যবস্থা আছে। তিনি প্রাথমিক পোনা মজুদ করেন মার্চ মাসের ১৪ তারিখে।

শাহীনূলের পুকুরে মাছের উৎপাদন

তিনি বিগত বছরে (২০১৩) রুইজাতীয় মাছের মিশ্রচাষ করে হেক্টর প্রতি সর্বোচ্চ (বেইজলাইন) উৎপাদন পেয়েছিলেন মাত্র ৬.৪১ মে.টন। আর তিনি সংযোগ মৎস্যচাষি হিসেবে নির্বাচিত হবার পর তার পুকুরে রুইজাতীয় মাছের মিশ্রচাষ করে উৎপাদন হয়েছে প্রতি হেক্টরে ১০.০১ মে.টন। ১৪ জুন ২০১৪ তারিখ হতে তিনি নিয়মিত আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদ করা শুরু করে মোট সাত বার আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদ করেছেন এবং জানুয়ারি মাসে তিনি সম্পূর্ণ আহরণ করেন। তিনি তার পুকুর থেকে সর্বমোট ৮৪০টি সিলভার কার্প (৯৪১ কেজি), ৪৮২টি কাতলা (৪৩৯ কেজি), ২৯৭টি বিগহেড (৩৭১ কেজি), ১৫৫টি গ্রাসকার্প (২৩৭ কেজি), ৭৫৫টি রুই (৩৭১ কেজি), ৫২৫টি মৃগেল (২৪৮ কেজি), ২১২টি কমনকার্প (২৩০ কেজি), ৭৭টি ব্ল্যাক কার্প (১৪৮ কেজি) এবং ১০৭৯টি সরপুঁটি (২৮৫ কেজি) আহরণ করেন। তিনি ২০১৪ সালে সর্বমোট ৩২৭০ (তিন হাজার দুইশত সত্তর) কেজি মাছ উৎপাদন করেন।

আয়-ব্যয়: এ খামারে তিনি প্রায় ২.৬৩ লক্ষ (দুই লক্ষ তেষট্টি হাজার) টাকা ব্যয় করে প্রায় ৫.৪২ লক্ষ (পাঁচ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা আয় করেন। তার নীট আয় ছিল ২.৭৯ লক্ষ (দুই লক্ষ উনআশি হাজার) টাকা।

তিনি ২০১৪ সালে মোট ২১৪ জন চাষিকে বিনা পারিশ্রমিকে পরামর্শ প্রদান করেছেন। তাছাড়া এলাকার মৎস্যচাষিদের উপকরণ সংগ্রহেও সহযোগিতা করে থাকেন। তার খামারের মাধ্যমে প্রায় ১০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন যে, 'মাছ চাষ এখন আমার কাছে শুধু মাছ চাষই নয় বরং আমার খামারকে আমি এখন একটা গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করতে চাই।' ২০১৪ সালে ঢাকা বিভাগের ১৫১০ জন সংযোগ মৎস্যচাষির মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ সংযোগ মৎস্যচাষি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় তাকে বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক পুরস্কৃত করা হয়েছে। তার খামারটি ঢাকা বিভাগের একটি আদর্শ সংযোগ মৎস্যচাষির খামার।

উপসংহার (Conclusion)

শুধু শাহীনূল ইসলামই নয় বরং নির্বাচিত অন্যান্য সংযোগ মৎস্যচাষিরাও মৎস্য অধিদপ্তরের দেয়া পরামর্শ মোতাবেক মাছ চাষ করার সাথে সাথে আশেপাশের অন্যান্য চাষিদেরকেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছেন। তারা মাঝে মাঝে পুকুর পাড়ে মাঠ দিবসও করে থাকেন যেখানে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ জনগণও উপস্থিত থাকেন। সম্প্রসারণ কর্মীগণ বিনা প্রণোদনায় কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তারা বছরের পর বছর অভ্যাসগতভাবেই অবিরতভাবে সেবা দিয়ে যাবেন। এটাই এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

[1]উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[2]সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

হাওর ও উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন এবং এদের সংরক্ষণ

Natural Breeding and Conservation of Fishes in Haor and Openwater Fisheries

ড. সৈয়দ আলী আজহার

Abstract

Haor is known as mother fishery and vast area of Haor wetland is the natural breeding ground of wild fishes. About 83.35% area inland fishery resources is inland openwater or wetland but fish production of inland closed water is significantly higher than inland open water.This happened mainly because of extensive extension works on modern aquaculture technologies since it's a profitable business. But inland openwater extremely neglected and Government support including Government policies did not favour its biodiversity conservation and management as per requirement of openwater, except some development projects of the Department of Fisheries mainly, a few projets of Local Government and Engineering Department and the Department of Environment including positive role of some non-government and donor organizations besides Government of Bangladesh. But it is possible to increase openwater fish production significantly higher than closed water if modern management and conservation tools are properly applied. Different species of Carp, Cat fish, Barb and Minnows, Clupeid fish, Snakehead, Perch fish, Spiny eel, Featherback, Loach, Prawn and other fishes are very very popular native fishes whose breeding ground is open water, although the open water is now in danger due to several environmental and anthropological causes. Therefore, immediately Government and other relevant stakeholders should take necessary initiatives to protect natural breeding grounds of openwater fisheries to save motherfishes and fisheries, develop livelihood of resources users, for fish biodiversity conservation and for increasing fish production those are major keys to achieve target of 'Vision 2021'.

সহজ কথায় হাওর হলো উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের সমাহারে সৃষ্ট বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ইকোসিস্টেম। হাওর অঞ্চলের প্লাবনভূমিসহ মুক্ত জলাশয়গুলো মাছের এক বিশাল প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র। হাওর 'মা' মাছের ভাণ্ডারও বটে। জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এক সময়ের মৎস্যভাণ্ডার বলে খ্যাত হাওরের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মাছের প্রাকৃতিক প্রজননের সুযোগ সৃষ্টিতে সারাদেশের মুক্ত জলাশয়গুলোর ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। তবে প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহ জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে হারাচ্ছে নাব্যতা, বিপন্ন হতে চলেছে সামগ্রিক জীববৈচিত্র্য।

গ্রামে-গঞ্জে এখন পানিফল, মাখনা, পদের চাক, শাপলা, শালুক, কেওরালী, কুই ইত্যাদি জলজ ফল আগের মত আর পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না কচ্ছপ, শিশুক, বড় শামুক, আর ঝিনুকের ভেতর মুক্তা। তেমনিভাবে এখন অনেক জলাশয়ে মাছ দেখাই যায় না। বিশ্বের জলজ পরিবেশ ও প্রতিবেশের সার্বিক বিপর্যয়ের ৫০% ঘটেছে বিগত ১৯৭১ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে (Loh *et al.*, ১৯৯৮)। ইতোমধ্যেই দেশের মোট ২৯৩ টি (হোসেইন,২০১২) মৎস্য প্রজাতির মধ্যে ৫৪ প্রজাতির মাছ বিপন্নপ্রায় (IUCN, ২০০০)। জলজ উদ্ভিদ, জলে বসবাসকারী পাখি, বিভিন্ন প্রকার জলজ মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী, বেনথোস ইত্যাদি দিন দিন কমেই চলেছে। জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয় যদি এভাবে চলতে থাকে, আর যদি এখনই এর প্রতিকারের জন্য কোনো বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ না নেয়া হয় তবে ভবিষ্যতে জলজ জীবের বিলুপ্তির হার স্থলভাগের চেয়ে ৫ গুণ এবং সমুদ্র উপকূলীয় জীবের চেয়ে ৩ গুণ বেশি হবে। গবেষণা থেকে জানা যায়, ২০৫০ সালের মধ্যে ৩০% জীব পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে (Ricciardi *et al.*, ১৯৯৯)। তাই আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জলাশয়সমূহে মাছের উৎপাদন বড়ানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। আর এটি করতে দেশের ৩৯.১৭ (৮৩.৩৫%) মিলিয়ন হেক্টর অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় (ডিওএফ, ২০১৪) তথা হাওর, নদী, বিল, প্লাবনভূমিসহ সকল প্রকার উন্মুক্ত জলাশয়ে সকল প্রজাতির মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্রসমূহে মাছকে অবাধে, নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে প্রজনন করার সুযোগ দিতে হবে। উৎপাদিত রেণু ও ধানীসহ সকল প্রকার পোনা মাছ ও মা-বাবা মাছকে মুক্ত জলাশয়ে অবাধে এবং নির্বিঘ্নে বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করে এদের সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন এবং সংরক্ষণ

বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় মুক্ত জলাশয়ে নিবিড় মাছ চাষ করা না গেলেও দক্ষতার সাথে লাগসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে। জলবায়ুর পরিবর্তন ছাড়াও রাজস্বমুখী জলমহাল ব্যবস্থাপনা, পলি ভরাট, পানি দূষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, ক্ষতিকর জাল ও সরঞ্জামের ব্যবহার, অতিআহরণ, পানি সেচে মা-বাবা মাছ আহরণ, প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস করা, নির্বিচারে পোনা আহরণ ইত্যাদি কারণে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন প্রতিনিয়ত ক্ষতি বা চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনেই এর উত্তরণ প্রয়োজন, প্রয়োজন পরীক্ষিত বিভিন্ন প্রযুক্তির সমাবেশ এবং উপযুক্ত জলাশয়ে এর প্রয়োগ। এসব বিবেচনায় হাওরসহ মুক্ত জলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্রসমূহে মাছকে অবাধে, নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে প্রজনন কারার সুযোগ দিতে হবে এবং উৎপাদিত রেণু ও ধানীসহ পোনা ও মা-বাবা মাছকে অবাধে ও নির্বিঘ্নে বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করে এদের সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। হাওর ও উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন এবং এদের সংরক্ষণ বিষয় অপর পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হলো:

১. কার্প (Carp)

কালিবাউস *(Labeo Calbasu)*, রুই *(Labeo rohita)*, কাতল *(Jebelion catla)*, মৃগেল *(Cirrhinus cirrhosus)*, কার্পিও *(Cyprinus carpio)*, গনিয়া *(Labeo gonius)*, ভাংনা *(Cirrhina reba)*, মোরার *(Aspidoparia morar)*, জয়া *(A. jaya)*, বাটা *(Labeo bata)*, পিয়ালি, ছেপচেলা ইত্যাদি কার্প দলের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসে হাওর ও প্লাবনভূমির হালকা স্রোতযুক্ত স্থানে গনিয়া, কালিবাউস, ভাংনা ইত্যাদি মাছ প্রজনন করে থাকে। অন্যদিকে কার্পিও বিদেশি মাছ হওয়া সত্ত্বেও সকল প্রকার জলাশয়েই মাঘ মাস থেকে চৈত্র মাসে এদেরকে জলজ আগাছা বা কোনো অবকাঠামোতে আঠালো ডিম দিতে দেখা যায়। তবে হাওর, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রসহ দেশের বড় বড় কিছু নদীতে মৃগেল মাছের প্রজননের তথ্য মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়। রুই, কাতল ও মৃগেল মাছের প্রজননক্ষেত্র হিসেবে চট্টগ্রামের হালদা নদীর বিশ্বের অন্যতম। এসব মাছের মূল প্রজননক্ষেত্র উজানের দিকে ভারতের আসাম, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ ইত্যাদি অঞ্চলের একাধিক পাহাড়ি খড়স্রোতা নদী। স্রোতের টানে এসব মাছের রেণু উল্লিখিত নদীসমূহের বিভিন্ন স্থান যেমন, গোয়ালন্দ ঘাট, সিরাজগঞ্জ ঘাট, কুষ্টিয়া জেলার কিছু স্থান, পাবনা জেলার বেড়া, ঈশ্বরদী ও সুজানগরসহ অন্যান্য কয়েকটি স্থান, বাহাদুরাবাদ ঘাট, ফুলছড়ি ঘাট, তরাঘাট, শম্ভুগঞ্জ ঘাট, হোসেনপুর ঘাট ইত্যাদি স্থানে সাভার জাল দিয়ে রেণুপোনা বা ডিম-পোনা আহরণ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে উল্লিখিত নদীসমূহে প্রজননের হার কমে যাওয়ায় দু-একটি স্থানে স্বল্প পরিমাণ রেণু পোনা পাওয়া গেলেও অধিকাংশ স্থানে আর পাওয়া যায় না।

সকল প্রকার কার্পের প্রজনন মৌসুমে বিশেষ করে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত কম ফাঁসযুক্ত বেড় জাল, (যেমন- মশারি জাল, কুনি জাল, কাঁথা জাল), সাভার জাল ইত্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে এদের রেণু ও ধানী পোনা রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। আবার ডিমওয়ালা কার্পজাতীয় মাছের আহরণ আইন দ্বারা প্রতিহত করা প্রয়োজন।

২. ক্যাট ফিস (Cat fish)

সাধারণত বার্বেল, কাঁটাযুক্ত পাখনা ও আঁইশবিহীন মাছগুলোকে ক্যাটফিস বলা হয়, যেমন- শিং *(Heteropneustes fossilis)*, মাগুর *(Clarias batrachus)*, টেংরা *(Mystus tengara)*, গুলশা *(Mystus gulio)*, বোয়ালিয়া পাবদা *(Ompok bimaculatus)*, বোয়াল *(Wallagonium attu)*, আঁইড় *(Sperata aor)*, গুজি আঁইড় *(Mystus seenghala)*, পাঙ্গাস *(Pangasius pangasius)*, বাচা *(Eutropiichthys vacha)*, ঘাউরা *(Clupisoma garua)*, বাঘাইড় *(Bagarius bagarius)*, কাজলি *(Alia coila)*, রিটা *(Rita rita)*, ইত্যাদি। এরা বর্ষার শুরুতে বৃষ্টির পানি আসার সাথে সাথে প্রজননের উদ্দেশ্যে কম পানিতে ও স্রোতের বিপরীতে গমন করতে দেখা যায়। এদের মধ্যে শিং ও মাগুর মাছ সাধারণত চৈত্র থেকে আষাঢ় মাসে স্বল্প পানি ও জলজ আগাছাযুক্ত প্লাবনভূমি বা ধানক্ষেত, পাটক্ষেত বা জলজ আগাছাযুক্ত জলাশয়ে গর্ত করে গর্তের মধ্যে ডিম ছাড়ে। ডিম ফোটার পরও কিছুদিন মাতৃযত্ন ও পাহারায় পোনা বড় হয়ে জলাশয়ের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। গুলশা, পাবদা, কাজলি, বাতাসি ইত্যাদি জলজ আগাছাযুক্ত প্লাবনভূমিতে ডিম ছেড়ে বাচ্চা উৎপাদন করে। বোয়াল মাছকে পাগলের মত নদী বা বিল থেকে উঠে এসে স্বল্প পানি ও জলজ আগাছাযুক্ত জলাশয়ে ডিম দিতে দেখা যায়। আঁইড় মাছকে নদী বা বিলে বা এ ধরনের জলাশয়ের পরিষ্কার পানিতে গর্ত করে ডিম ছাড়তে এবং মাতৃযত্ন ও পাহারায় পোনা বড় করতে দেখা যায়। সকল প্রকার ক্যাট ফিসের প্রজনন মৌসুমে ডিম ছাড়ার জন্য তৈরিকৃত বাসা বা গর্তসমূহ থেকে যাতে মা-বাবা মাছ আহরণ করা না হয় এবং মাছ যেন নির্বিঘ্নে ডিম দিতে পারে সে জন্য প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনে বর্তমান আইন ও বিধি সাপোর্ট না করলে আইন প্রণয়ন করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. বার্বস ও মিনোস (Barbs and Minnows)

সকল প্রকার পুঁটি, যেমন, সরপুঁটি *(Puntius sarana)*, জাতপুঁটি *(Puntius sophore)*, তিতপুঁটি *(Puntius ticto)* ইত্যাদি, চেলা *(Chela bacaila)*, মলা *(Amblypharyngodon mola)*, ঢেলা *(Rohtee cotio)*, কানপোনা *(Aplocheilus panchax)*, দারকিনা *(Esomus danricus)* ইত্যাদি বার্বস ও মাইনোস দলের অন্তর্ভুক্ত। হাওর ও মুক্ত জলাশয়ের প্লাবনভূমিতে এরা প্রজনন করে থাকে। সাধারণত বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসে হাওর ও প্লাবনভূমির হালকা স্রোতযুক্ত স্থানে এদের প্রজনন হয়ে থাকে। সরপুঁটি ছাড়া অন্যান্য পুঁটি মাছ যেমন- জাতপুঁটি, তিতপুঁটি, কাঞ্চনপুঁটি, ফুটানি পুঁটি ইত্যাদি পুঁটি মাছকে বিল, প্লাবনভূমির ধানক্ষেত বা ছোট্ট জলাশয়েও প্রজনন করতে দেখা যায়। সরপুঁটি সাধারণত একই সময়ে বিল ও প্লাবনভূমিতে প্রজনন করে থাকে। দারকিনা মাছকে ছোট ছোট ডোবাতেও প্রজনন করতে দেখা যায়। এদের প্রজনন মৌসুমে বিশেষ করে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত কম ফাঁসযুক্ত বেড় জাল, (যেমন- মশারি জাল, কুনি জাল, কাথা জাল, গাইট্টা জাল), ফাঁস জাল, ফিস ট্র্যাপ ইত্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে এদের রেণু ও ধানীপোনা রক্ষা করা সম্ভব।

৪. ক্লুপিড ফিস (Clupeid fish)

ইলিশ *(Tenualosa ilisha)*, কাচকি *(Corica soborna)*, চাপিলা *(Gudusia chapra)*, গনি চাপিলা *(Gudusia minminna)*, ইত্যাদি মাছ ক্লুপিড ফিসের আওতাভুক্ত। ইলিশ আমাদের জাতীয়

মাছ যেটি সমুদ্র থেকে প্রজনন মৌসুমে অভিপ্রয়াণ করে পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদীতে আসে প্রজননের উদ্দেশে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মায়ানী পয়েন্ট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম, উত্তর-পশ্চিমের পশ্চিম সৈয়দ আউলিয়া পয়েন্ট, তজুমদ্দিন, ভোলা, দক্ষিণ-পূর্বে গণ্ডামারা পয়েন্ট, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের লতা চাপালি পয়েন্ট, কলাপাড়া, পটুয়াখালী-এ সকল স্থানে প্রতি বছর আশ্বিন মাসে প্রথম পূর্ণিমার ৫দিন আগে ও ৫ দিন পরে ইলিশ প্রধানত ডিম ছাড়ে। এছাড়া চাঁদপুর জেলার ষাটনল হতে লক্ষীপুর জেলার

চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত (মেঘনা নদীর নিম্ন অববাহিকার ১০০ কিমি এলাকা), ভোলা জেলার চর ইলিশা হতে চর পিয়াল পর্যন্ত (মেঘনা নদীর শাহবাজপুর শাখা নদীর ৯০ কিমি এলাকা), পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলা সংলগ্ন আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কিমি এলাকা, উত্তরে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া ও ভেদরগঞ্জ উপজেলা এবং দক্ষিণে চাঁদপুর জেলার মতলব এবং শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার মধ্যে অবস্থিত নিম্ন পদ্মা নদীর ২০ কিমি এলাকায় প্রতিবছর মার্চ হতে এপ্রিল পর্যন্ত এবং ভোলা জেলার ভেদুরিয়া হতে পটুয়াখালীর চররুস্তম পর্যন্ত (তেতুলিয়া নদীর ১০০ কিমি এলাকা) প্রতিবছর নভেম্বর হতে জানুয়ারি পর্যন্ত ইলিশের পোনা বা জাটকা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

চাপিলা মাছ হাওর ও মুক্ত জলাশয়ের প্লাবনভূমিতে প্রজনন করে থাকে। সাধারণত বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাসে হাওর ও প্লাবনভূমির হালকা স্রোতযুক্ত স্থানে এদের প্রজনন হয়ে থাকে। নদী ও হাওরের পানি পরিবাহী খালের সংযোগ স্থলে বা নদীর কমস্রোতযুক্ত স্থানে ফাল্গুন থেকে আষাঢ় মাসে কেচকি মাছকে ডিম ছেড়ে বাচ্চা দিতে দেখা যায়। কারেন্ট জাল, কম ফাঁসযুক্ত বেড় জাল, যেমন, কাথা জাল/মশারি জাল/ কুনি জাল/ গাইট্টা জাল ইত্যাদির ব্যবহার বন্ধ করে এদের রেণু ও ধানী পোনা রক্ষা করা যেতে পারে।

৫. স্নেকহেড (Snakehead)

সাঁপের মাথার ন্যায় চ্যাপ্টা মাথাযুক্ত টাকি *(Channa punctatus)*, শোল *(Channa striatus)*, গজার *(Channa marulius)*, গেচু বা রাগা/রাগ্‌গা মাছ *(Channa orientalis)*

ইত্যাদি স্নেকহেড এর অন্তর্ভুক্ত। ক্যাটফিসের ন্যায় এদেরকেও বর্ষার শুরুতে বৃষ্টির পানি আসার সাথে সাথে প্রজননের উদ্দেশ্যে এক স্থান হতে অন্য স্থানে বিশেষভাবে গমন করতে দেখা যায়। এরা সাধারণত চৈত্র থেকে শ্রাবণ মাসে স্বল্প পানি ও জলজ আগাছাযুক্ত জলাশয়ে বাসা তৈরির জন্য গর্ত সৃষ্টি করে এবং উক্ত গর্তের মধ্যে ডিম ছাড়ে। ডিম ফোটার পর ঝাঁক বেধে মা-বাবাসহ এরা জলাশয়ে ঘুরে বেড়ায়। অনেক দিন পর্যন্ত মাতৃযত্ন ও পাহারায় পোনা বড় হয়ে জলাশয়ের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

খুইয়া জাল বা কম ফাঁসযুক্ত ঠেলা জাল ও উইছা দ্বারা এদের পোনা আহরণ বন্ধ করে এদের সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এদের পোনা আহরণের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে হবে এবং সামাজিকভাবে এর জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

৬. পার্চ ফিস (Perch fish)

কৈ *(Anabas testudineous)*, খলিশা *(Colisa fasciatus)*, বৈচা বা চাটুয়া *(Colisa chuna)*, নাপতানি *(Badis badis)*, চান্দা *(Chanda ranga)*, নামা চান্দা *(Chanda nama)*, গোল চান্দা *(Chanda baculis)*, ভেদা বা মেনি *(Nandus nandus)*, ইত্যাদি মাছ পার্চ দলের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ চৈত্র থেকে আষাঢ় মাসে নতুন বৃষ্টির পানি আসলে প্রজননের উদ্দেশ্যে স্বল্প পানি ও জলজ আগাছাযুক্ত প্লাবনভূমি বা ধানক্ষেত বা জলজ আগাছাযুক্ত জলাশয়ে বা নতুন পানিতে গমন করতে দেখা যায়। কৈ মাছ জলজ আগাছার মধ্যে ডিম ছাড়ে এবং আঠালো ডিমগুলো আগাছায় লেগে যায়। ডিম ফোটার পর পোনাগুলো জলাশয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। খলিশা ও বৈচা মাছ ভাসমান আগাছায় এক প্রকার ফেনাযুক্ত আবরণ সৃষ্টি করে এবং এর নিচে ডিম ছাড়ে। চান্দা, ডেলা, ভেদা বা

মেনিমাছ জলজ আগাছাযুক্ত প্লাবনভূমি বা ধানক্ষেত বা জলজ আগাছাযুক্ত জলাশয়ে বা নতুন পানিতে ডিম ছাড়ে। ডিম ফোটার পর পোনাগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এসব মাছের পোনা ছোট ফাঁসযুক্ত বেড় জাল (যেমন- মশারি জাল, কুনি জাল, গাইট্টা জাল), খুইয়া জাল, ঠেলা জাল, ফিস ট্র্যাপ, ঝাঁকি জাল, কারেন্ট জাল ইত্যাদি দ্বারা আহরণ হতে দেখা যায় এবং এ ধরনের আহরণ বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

(৭) স্পাইনি ইল (Spiny eel)

বড় বাইম বা শাল বাইম *(Mastacembelus armatus)*, তারা বাইম *(Macrognathus aculeatus)*, চিকরা বাইম *(Mastacembelus pancalus)*, কুচিয়া *(Monopterus cuchia)* ইত্যাদি মাছ এ দলের অন্তর্ভুক্ত। এরা সাধারণত পানির তলদেশে, কোনো চোঙ জাতীয় কাঠামো বা জলজ আগাছার মধ্যে বসবাস করে। বাইম মাছকে নদী বা জলাশয়ের পাড়ে পানিতে অবস্থিত মাটির গর্তে প্রচুর পরিমাণে বসবাস করতে দেখা যায়। পানি শুকিয়ে গেলে কাদার মধ্যে মাটির ভেতরেও এদেরকে পাওয়া যায়। এরা মাটির গর্তে বা জলজ আগাছার মধ্যে ডিম দেয়। ডিম ফোটার পর পোনাগুলো গর্তের ভেতরে

দেখা যায় এবং ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন জলজ আগাছাযুক্ত স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন প্রকার ড্রেজ নেট, ঠেলা জাল, কারেন্ট জাল, ফিস ট্র্যাপ, মশারি জাল এদের চরম শত্রু। এদের সংরক্ষণের জন্য প্রজনন মৌসুমে গর্ত থেকে এদের আহরণ বন্ধ করত হবে।

তাছাড়া প্রজনন মৌসুমে উল্লিখিত জালসমূহের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং জলাশয় শুকিয়ে মাছ আহরণ বন্ধ করতে হবে।

৮. লোচ (Loach)

গুতুম *(Lapidocephalus guntea)*, রাণী *(Botia dario)*, ঘোড়া মাছ বা পাহাড়ি গুতুম *(Somileptes gongota)*, ইত্যাদি এ জাতীয় মাছ লোচের অন্তর্ভুক্ত। এরা জলাশয়ের তলায় বসবাস করে। সাধারণত চৈত্র থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত এরা ডিম দেয়। তবে বর্ষার প্রারম্ভে বৃষ্টির নতুন পানিতে খাল, ড্রেন বা পানি প্রবাহের মাঝে এদের এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে দেখা যায়। পানি শুকিয়ে গেলে কাদার ভেতরেও গুতুম মাছকে পাওয়া যায়। জলজ আগাছাযুক্ত স্থান বা ড্রেন, খাল, প্লাবনভূমি বা নদীর কিনারায়, পাথর বা কোনো অবকাঠামোর ফাঁকে এদের ডিম ছাড়তে দেখা যায়। লোচের পোনা ছোট ফাঁসযুক্ত বেড় জাল, যেমন, মশারি জাল, কুনি জাল, বিভিন্ন প্রকার ড্রেজনেট, ঠেলা জাল, ফিস ট্র্যাপ, ইত্যাদি দ্বারা আহরণ হতে দেখা যায়। এদের সংরক্ষণের জন্য প্রজনন মৌসুমে ডিম ছাড়ার সুযোগ দিতে হবে এবং উল্লিখিত জালসমূহের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এদের ক্ষেত্রেও মা-বাবাকে রক্ষা করতে হলে কোনো অবস্থাতেই জলাশয় শুকিয়ে মাছ আহরণ করা যাবে না।

৯. ফিদারব্যাক (Featherback)

চিতল *(Notopterus chitala)*, ফলি *(Notopterus notopterus)*, ইত্যাদি মাছকে ফিদারব্যাক বলা হয়। ফলি জলাশয়ের আগাছাযুক্ত স্থানে গর্ত তৈরি করে গর্তে ডিম ছাড়ে। চিতল মাছ আগাছার গোড়ায় মূলে বা ডালপালা বা কাঠজাতীয় অবকাঠামোতে ডিম ছাড়ে। এদের ডিম ফোটার সময় অন্যান্য মাছের চেয়ে বেশি, সাধারণত ৭-১৫ দিন। ডিম আঠালো এবং আগাছা বা অবকাঠামো লেগে থাকে। পোনা বেশ কিছুদিন একত্রে ঘন হয়ে বিচরণ করে পরে জলাশয়ের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ছোট ফাঁসযুক্ত বেড় জাল; যেমন- মশারি জাল, কুনি জাল, বিভিন্ন প্রকার ড্রেজনেট, ঠেলা জাল এদের জন্য হুমকি। এদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করা গেলে এসব মাছের বংশ রক্ষা পাবে।

১০. চিংড়ি (Prawn species)

গলদা চিংড়ি *(Macrobrachium rosebergii)*, ঠেঙ্গুয়া চিংড়ি *(M. birmanicus)*, ডিমুয়া চিংড়ি *(M. villosimanus)*, ছটকা চিংড়ি *(M. malcolmsonii)*, গুঁড়া ইচা বা গুঁড়া চিংড়ি *(M. lamarrei)* এর অন্তর্ভুক্ত। গুঁড়া ইচা সকল জলজ আগাছাযুক্ত জলাশয়ের আগাছায়, স্বল্প পানি ও স্বল্প স্রোতে জলাশয়ের তলদেশে দেখা যায়। গলদা চিংড়ি অভিপ্রয়াণ করে লবণাক্ত পানিতে চলে যায় প্রজননের জন্য। চৈত্র থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত হাওর অঞ্চলের নদীর কিনারে স্রোতযুক্ত স্থানে সকল প্রকার চিংড়িকে পেটের তলদেশে ডিমসহ পাওয়া যায়। এ সময়ে প্রচুর ছোট পোনাও পাওয়া যায়। ঠেলাজাল, ড্রেজনেট, সেটব্যাগ নেট (যেমন- ভীম জাল), বেড় জাল, ফিস ট্র্যাপ ইত্যাদি দ্বারা চিংড়ি আহরণ করা হয়। এদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করা গেলে এ সকল মাছের বংশ রক্ষা পাবে।

১১. অন্যান্য মাছ (Miscellanceous fish)

বাইলা *(Glossogobius giuris ও Awaous stamineus)*, কাকিলা *(Xenentodon cancila)*, একঠুটিয়া *(Hemirhamphus gaimardi)*, পোয়া *(Pama pama)*, ছোট টেপা বা পটকা *(Tetradon cutcutia)* ইত্যাদি অন্যান্য মাছের দলভুক্ত করা হয়েছে। বাইলা মাছ পানির তলদেশে থাকে এবং নদী, বিল, খাল এমনকি পুকুরেও ডিম দিতে দেখা যায়। সাধারণত চৈত্র থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত এদের পেটে ডিম দেখা যায়। এ সময় এরা সকল প্রকার জলাশয়ের অপেক্ষাকৃত কম পানি ও কম স্রোতযুক্ত স্থানে মাটিতে ডিম দেয়। পটকা ছাড়া অন্যান্য অধিকাংশ প্রজাতির মাছকে কম স্রোতযুক্ত স্থানের জলজ আগাছায় ডিম দিতে দেখা যায়। প্রধানত নদী, খাল পানি উজান থেকে জলাশয়ে নেমে আসার সংযোগস্থলে বা এর নিকটবর্তী স্থানে এরা ডিম ছাড়ে। বেড় জাল ও কারেন্ট জালের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করা গেলে এসব মাছ রক্ষা পাবে। উল্লেখ্য, শুধু জাল বা সরঞ্জামের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করা হলেই মাছের সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করা যাবে না বরং এর সাথে জলাশয় সেচে মাছ আহরণ বন্ধ করতে হবে। হাওর ও মুক্ত জলাশয় হলো সকল প্রকার মিঠা পানির মাছের মূল বাসস্থান ও প্রাকৃতিকভাবে বংশবৃদ্ধির মূল প্রজননক্ষেত্র। তাই এসব প্রজননক্ষেত্রগুলোকে সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ করতে হবে। তবে একই সাথে প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা। মানুষ সচেতন হলে অনেক কিছুই করা সম্ভব। মাচ/আইপ্যাক/ক্রেল প্রকল্পভুক্ত শ্রীমঙ্গলের বাইক্যা বিল মাছ ও জলজজীবের প্রজনন ও সংরক্ষণের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ক্ষেত্রে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা বা সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। আমাদেরকে নবায়নযোগ্য এ প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে শুধুই নেয়ার মানসিকতা বর্জন করে কিছু দেয়ার মানসিকতা সংশ্লিষ্ট সকলকে অর্জন করতে হবে। দেশের সম্ভাবনাময় ও পুরোপুরি উপযোগী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্রগুলো শুকিয়ে মাছ ধরা বন্ধ করে মাছকে প্রজননের সুযোগ দেয়া, জলাশয়ে পরিমাণ মত পানি মজুদ রাখা, প্রয়োজনে মাছ মজুদ করাসহ উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদনমুখী ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যা বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ভিশন-২০২১ এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যক।

কনসালটেন্ট, হাওর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন উইনরক ইন্টারন্যাশনাল-ক্রেল, ইউএসএআইডি-ডিওএফ/ডিওই/এফডি

চলনবিল - অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত
Chalan Beel - Past, Present and Future

মোঃ রেজাউল ইসলাম[১], মোঃ আব্দুদ দাইয়ান[২] ও মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী[৩]

Abstract

Chalan beel is a wetland in Bangladesh. It is large inland depression, marshy in character, with rich flora and fauna. It is an extensive lowland area in the lower Atrai basin and spreads across Singra and Gurudaspur upazila of Natore district, Chatmohar, Bhangura and Faridpur upazila of Pabna District and Ullahpara, Raigonj and Tarash upazilas of Sirajganj District. It consists of a series of beels connected to one another by various channels to form a continuous water body during the rainy season. Although the beel area expands into a vast water body with dense aquatic vegetation as long as the Jamuna remains flooded the moonsoon months, it dries out in the winter months. The banks of the beel are covered with dense stands of kash babla, nol, dholkolmi, simul and date palm. Chalan beel has a total 34 species reptiles including ten turtles and tortoises nine lizards and various snake species. There are 27 species of mammals from 12 families.

দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছের আবাসস্থল হিসেবে চলনবিল বাংলদেশের মানচিত্রে এক বিশাল স্থান দখল করে আছে। চলনবিল বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে বড়, জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ বিস্তীর্ণ জলাভূমি, যা প্রায় ১০৮৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। চলনবিলটি বাংলাদেশের ২৪.৩৫ ডিগ্রি থেকে ২৪.৭০ ডিগ্রি উত্তর দ্রাঘিমাংশ এবং ৮৯.১০ ডিগ্রি থেকে ৮৯.৩৫ ডিগ্রি পূর্ব অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। ঐতিহাসিকভাবে, চলনবিল নিকটবর্তী ৬টি জেলা যথা- রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ ও বগুড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এর বেশিরভাগই সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ ও পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলাসহ কম-বেশি ১৮টি উপজেলা জুড়ে বিস্তৃত।

চলনবিলের বিস্তৃতি

চলনবিলের বিস্তৃতি নিম্নরূপ:

১. রাজশাহী জেলা (পবা, বাঘমারা ও মোহনপুর উপজেলা);
২. পাবনা জেলা (চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর উপজেলা);
৩. সিরাজগঞ্জ জেলা (তাড়াশ, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ ও শাহজাদপুর উপজেলা);
৪. নাটোর জেলা (সদর, সিংড়া, গুরুদাসপুর ও বড়াইগ্রাম উপজেলা);
৫. নওগাঁ জেলা (মান্দা, রাণীনগর ও আত্রাই উপজেলা); এবং
৬. বগুড়া জেলা (নন্দীগ্রাম উপজেলা)।

বর্তমানে পরিবেশ বিপর্যয়ের শিকার এ সুপ্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী জনপদটি রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ, নাটোর ও পাবনা এ তিনটি জেলার অন্তর্ভুক্ত তাড়াশ, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, সিংড়া, গুরুদাসপুর, বড়াইগ্রাম, চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর - এ ১০টি উপজেলার ১৬০০ গ্রাম জুড়ে বিস্তৃত। এ চলনবিল খুবই দ্রুত পলি পড়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। গত শতাব্দী এবং এ শতাব্দীর অর্ধেক সময় যাবৎ এ বিলটির দক্ষিণ ভাগের কমপক্ষে ১৯.৩২ কিলোমিটার গঙ্গা বিধৌত পলির কারণে ভরাট হয়ে গেছে। এর অন্যান্য শাখা নদী যেমন- গুর এবং বড়াল, চলনবিলের মোট আয়তন কমার জন্য অনেকাংশে দায়ী। ১৯০৯ সালে গণপূর্ত অধিদপ্তরের জরিপে দেখা গেছে যে, এর আয়তন ছিল প্রায় ১০৮৫ বর্গ কিলোমিটার। কিন্তু জলাভূমির পানির ব্যাপক নিষ্কাশন ও পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে চলনবিলের আয়তন কমে ৩৬৮ বর্গ কিলোমিটার এসে দাঁড়িয়েছে যার মাত্র ৮৫ বর্গ কিলোমিটারে বর্তমানে সারাবছর পানি থাকে। এখানকার কৃষি, জলজ সম্পদ ও মৎস্যসম্পদের প্রাচুর্য এখন উপকথা মাত্র। চলন বিলজোড়া অসংখ্য নদী, খাল-বিল এখন শুষ্ক প্রায়, ফলে এখানকার জীববৈচিত্র্য মারাত্মক হুমকির মুখে। সেই সঙ্গে বিপর্যস্ত হয়েছে এর ওপর নির্ভরশীল ২০ লক্ষাধিক মানুষের জীবন ও জীবিকা। চলনবিলে রয়েছে মোট ১২টি নদী, ৭৮টি বৃহৎ জলাশয় এবং ১৮টি বড় বড় খাল। এছাড়া রয়েছে আরো ছোট ছোট অসংখ্য নাম না জানা খাল। বর্তমানে মাত্র ২৬ কিমি এলাকা জলমগ্ন থাকে। পানির গড় গভীরতা ৬.৬ ফুট এবং বর্ষায় পানির সর্বোচ্চ গভীরতা দাঁড়ায় ১৩ ফুটে। চলনবিলে নানাবিধ মাছ, জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণী, পাখি, জলজ অন্যান্য প্রাণী ইত্যাদি পাওয়া যায়, যার ওপর নির্ভর করে বিল নিকটবর্তী মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা এবং জীবন ও জীবিকা। বিল নিকটবর্তী জনগোষ্ঠী সাধারণত মাছ, জলজ পণ্য, কৃষিজ দ্রব্য এবং গবাদিপশুর জন্য মুক্ত চারণভূমি ব্যবহার করেই চলেছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এসব মুক্ত জলাশয়ের মোট বাৎসরিক উৎপাদন এবং জীববৈচিত্র্য এখন হুমকির সম্মুখীন। হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জলজ প্রাণী।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিরূপ অবস্থা, নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং মৃদু স্রোতের কারণে পলি পড়ে বিল ভরাট হয়ে যাচ্ছে যার ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর বিচরণ এবং প্রজননক্ষেত্র দিনদিন সংকুচিত হয়ে আসছে। এছাড়া অনেক মানবসৃষ্ট কারণও জলজ জীববৈচিত্র্য নিধনের জন্য দায়ী; যেমন শস্য চাষের জন্য বিল থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা অনিয়ন্ত্রিত সেচের পানির ব্যবহার, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই অতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার, অবাধে ডিমওয়ালা এবং ছোট মাছ নিধন, মৎস্য আইন লঙ্ঘন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মৎস্য অভয়াশ্রম না থাকার কারণে শুষ্ক মৌসুমে বিলের গভীর অংশে আশ্রয় নেয়া বিভিন্ন প্রজাতির ডিমওয়ালা মাছ মানুষ অবাধে আহরণ করে থাকে। ফলে পোনা মাছের প্রাকৃতিক যোগান বিপুলভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কমে যাচ্ছে মাছের মোট উৎপাদন, ব্যাহত হচ্ছে বিলের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মানবসৃষ্ট নানাবিধ কারণে গত ৩০ বছরে এ বিলে মৎস্য প্রাপ্তির যে হিসেব দেখা যায় তা সকলের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

- ১৯৮২ সালে স্থায়ী জলাশয়ে ৯৫% পানি থাকতো, যাতে ৭৫ প্রজাতির মাছের উৎপাদন ছিল ২৬.৯৯ মে.টন
- ১৯৯২ সালে স্থায়ী জলাশয়ে ৭৫% পানি থাকতো, যাতে ৭০ প্রজাতির মাছের উৎপাদন ছিল ১৮.৭০ মে.টন
- ২০০২ সালে স্থায়ী জলাশয়ে ২৫% পানি থাকতো, যাতে ৬৫ প্রজাতির মাছের উৎপাদন ছিল ১২.৪৬ মে.টন
- ২০১২ সালে স্থায়ী জলাশয়ে সম্ভাব্য ১০% পানি থাকে, যাতে ৫০ প্রজাতির মাছের উৎপাদন হয় ৯.৯ মে.টন

অর্থাৎ চলনবিল থেকে গত ৩০ বছরে মাছের উৎপাদন কমেছে প্রায় ৬৩%।

এমতাবস্থায় জলবায়ুর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিলুপ্তপ্রায় মাছ ও জলজ প্রাণিকূলের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। পলি পড়ে ভরাট হওয়া বিলের অংশগুলো পুনঃখননের মাধ্যমে মৎস্য আবাসস্থল এবং প্রজননক্ষেত্র নিশ্চিতকরণ এবং বাঁধ নির্মাণের পূর্বে নদীর গতি পথের ওপর বিরূপ প্রভাব যাচাইপূর্বক সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সুষম পানি বণ্টনের দিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে এবং আইন-শৃঙ্খলার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মাছ ধরা ও পোনা মাছ নিধন বন্ধ করা এবং একই সাথে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও পয়োজন। জলাভূমির ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, অবাধে ডিমওয়ালা মাছ ও পোনা মাছ নিধন ইত্যাদির জীববৈচিত্র্যের ওপর বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে কিছুটা হলেও ফিরিয়ে আনা সম্ভব চলনবিলের হারানো ঐতিহ্যকে।

চলনবিলে মৎস্য জীববৈচিত্র্য ক্রম-অবনতির কারণসমূহ
(Causes of fish biodiversity reduction in Chalan Beel)

- মাছের আবাসস্থল নষ্ট হওয়া-
  - পলি পড়ে ভরাট হওয়া
  - খাল বা সংযোগ নদীতে বাঁধ নির্মাণ
  - জলাশয়কে ফসলি জমিতে রূপান্তর করা
- ক্ষতিকর মৎস্য আহরণ পদ্ধতি-
  - অবাধে কারেন্ট জালের ব্যবহার
  - সুতিজাল/বের জালের ব্যবহার
  - সেচ দিয়ে বিল শুকিয়ে মাছ ধরা
- অতিমাত্রায় মৎস্য আহরণ
- নির্বিচারে পোনা ও ডিমওয়ালা মাছ ধরা
- কৃষি জমিতে কীটনাশকের ব্যবহার
- কৃষি জমিতে অতিমাত্রায় রাসায়নিক সারের ব্যবহার
- বিলের বিভিন্ন সংযোগ নদী বা খালে বানা দিয়ে মাছের স্বাভাবিক চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা
- শাপলা, শালুক, পদ্ম, চেঁচড়াসহ সকল জলজ উদ্ভিদ ধ্বংস করা
- অনিয়মিত বৃষ্টিপাত
- খরা

চলনবিলে মৎস্য জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারের সুপারিশমালা
(Recommendations of fish biodiversity rehabilitation in Chalan Beel)

- চলনবিলের জলাশয়, মাছের প্রজাতি ও মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অতীত ও বর্তমানের মৎস্য উৎপাদনের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করা।
- অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটানো।
- সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
- মৃদু স্রোতের কারণে পলি জমে ভরাট হওয়া বিলের অংশসমূহ পুনঃখননের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে মাছের আবাসস্থল এবং প্রজননক্ষেত্র নিশ্চতকরণ।
- মুক্ত জলাশয়ে মাছের প্রজাতি রক্ষা ও আবাসস্থল পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা।
- জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মাছের (মা মাছের) এবং নির্দিষ্ট আকারের চেয়ে ছোট মাছ সংরক্ষণের প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ।
- মুক্ত জলাশয়ে দেশীয় মাছের প্রজাতি রক্ষা ও আবাসস্থলের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম যেমন- গম্ভিরা গান, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ভিডিও ডকুমেন্টারি ও স্পট ফিলার প্রদর্শনী, মুক্ত আলোচনা ইত্যাদি পরিচালনার মাধ্যমে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
- জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
- বিলুপ্ত বা হুমকির সম্মুখীন দেশীয় মৎস্য প্রজাতির পুনঃমজুদকরণ
- শুষ্ক মৌসুমে জলাভূমির পানির গভীরতা মৎস্যবান্ধব পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে কম সেচের মাধ্যমে বোরো চাষ পদ্ধতি অথবা বিকল্প শস্য উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন
- বিকল্প আয় বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন
- সমাজভিত্তিক সংগঠনের জন্য কমিউনিটি সেন্টার কাম গার্ডশেড নির্মাণ
- জলজ বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ
- জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি।

[১]জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[২]সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[৩]মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মৎস্য প্রজাতির প্রাচুর্যের ওপর নদীর গতিপথ পরিবর্তনের প্রভাব

Inpact of Diversion of Rivercourse One Fish Diversity

মোহাঃ ওবাইদুল্লাহ্[১] ও সরদার মহীউদ্দিন[২]

Abstract

Rivers are considered as common pool resources (CPR) for the livelihoods of millions of fishers and non fishers households across the country and includes a number of economic sectors i.e. agriculture, fisheries, industry and commerce. The study was carried out to assess the consequences of river course diversion on fish species availability, river land and water encroachment and the impact on livelihoods of dependent fisher communities. Three down stream abandoned areas of the river Tulshiganga and one inflow section of the same river basin and their associated fishery villages in Naogaon Sadar Upazila were studied and information collected from 1978 to 2008 using the recall method through Focus group discussions (FGDs) followed by Participatory rural appraisal (PRA) and household surveys in selected fishery villages to collect primary data which were interpreted and supplemented with secondary information from various sources. Catch per unit effort (CPUE) was also assessed in the above mentioned areas of the river basin to identify and compare the impact of diversion on fish production. Within three decades 30-49% fish species were reduced and 20 fish species were not found since 1988 in the study areas. The area of open access for fishing decreased by 43-72%; water depth declined at 50-60% with less water holding of 1-2 months; river bed 25-57% already been encroached, mostly transformed as agricultural land over the same time period and areas. Over time period percent credit on daily income was increased at 12 to 20% with corresponding decrease of 49-88% average daily catch per fisher in selected areas and time period. Furthermore, yearly production rate found almost two times less in abandoned part of the river basin to inflow that influences to change profession that indicates the increase of seasonal fisher over the time and selected localities. To combat the adverse impact of alteration of river regime, river bed excavation, community based fisheries management, creation of alternative IGAs are applicable for the dependent people.

বাংলাদেশের জলজ সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছে নদী। দেশের ৩১৮ টির অধিক নদী জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যে ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদী। নদীমাতৃক এ দেশে নদী আমাদের কৃষি, মৎস্য, অর্থনীতি-বাণিজ্য, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, জীবনযাত্রার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলি মূলত আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অবাবহিকা থেকে সৃষ্ট এবং এককালে বিভিন্ন জলজ জীবের প্রজনন ও লালনক্ষেত্র হিসেবে যথেষ্ট উৎপাদনশীল জলজ ইকোসিস্টেম বলে বিবেচিত হতো। এই বিশাল জলজ সম্পদ সাধারণ সম্পদ (Common pool resource) হিসেবে খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে এবং কর্ম সংস্থানের জন্য মৎস্যজীবী সহ লক্ষ কোটি জনগণ ব্যবহার করে আসছে। বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে, সবুজ বিপ্লবের শুরুতে মূলত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ কার্যের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো-বাঁধ, পোল্ডার, রাস্তা, স্লুইস গেইট ইত্যাদির ব্যাপক নির্মাণের ফলে অনেক ছোট ছোট নদীর স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে, পাশাপাশি হারিয়েছে তার প্রকৃতিসৃষ্ট প্লাবনভূমি। ফলশ্রুতিতে নদীর পানি প্রাপ্যতা ও নদীর ভূমি নিয়ে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, হ্রাস পেয়েছে মৎস্য প্রজাতির প্রাচুর্য ও প্রজনন সুযোগ। নদীর খাড়িতে পলি জমার হার বৃদ্ধি পেয়ে নদী হারাচ্ছে তার নাব্যতা এবং ঘটছে অতিমাত্রায় মৎস্য আহরণ। এছাড়া শিল্প বর্জ্য ও কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ব্যাপক রাসায়নিকও নদীগুলোকে দূষিত করে তুলছে। এর ফলে সাধারণ ভাবে নদীনির্ভর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মৎসজীবীদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের আয় রোজগারের পথ, বাধ্য হচ্ছে তারা পেশা পরিবর্তন করতে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের বিশাল অংশ এক সময় মুক্ত জলাশয় থেকে আসত এবং এর উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল নদী থেকে আহরিত মাছ। কালের পরিক্রমায় দূষণসহ মনুষ্যসৃষ্ট ও প্রকৃতিক কারণে অনেক নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হবার ফলে, নদীর স্বাভাবিক প্রতিবেশ (ecosystem) বিনষ্ট হবার কারণে, নদীর মৎস্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। দুই দশক পূর্বে দেশের বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদনে নদী থেকে আহরিত মৎস্যের অবদান ছিল ২৮.৫%, বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে ৬.৫% এ এসে দাঁড়িয়েছে। তেমনি একই সময়ের ব্যবধানে সেচ সুবিধার প্রাপ্ত জমির পরিমাণ ১.৫ মিলিয়ন হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৫ মিলিয়ন হেক্টর হলেও সেচ কাজের জন্য ব্যবহৃত পানিতে নদীর অবদান ৪৯% থেকে হ্রাস পেয়ে ২৯% এ এসে দাঁড়িয়েছে।

দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে প্রবাহিত অনেক ছোট ছোট নদীর মধ্যে 'তুলশী গঙ্গা' একটি পরিচিত নাম। নদীটি নওগাঁ জেলার সদর উপজেলাসহ উত্তরবঙ্গের ৩টি জেলার ৬টি উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত যার নিম্ন অবাহিকায় (নওগাঁ ও জয়পুরহাট জেলা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। আর এ পরিবর্তনের ফলে নদীর মৎস্য প্রজাতির বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য এবং নদীনির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার অপর প্রভাবের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি নিরূপণের জন্য এ সমীক্ষা, একটি স্থানীয় অনুসন্ধানমূলক প্রয়াস।

সামীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ

- নদীর মৎস্য প্রজাতি বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য এবং উৎপাদনশীলতা নিরূপণ।
- নদী সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী পরিবারের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ।

- নদীর বর্তমান জলজ পরিবেশ এবং মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সম্ভাব্য পদক্ষেপ অনুসন্ধান।

নদীর পরিচিতি ও পরিবর্তিত গতিপথ

দেশের উত্তরাঞ্চলে ১১০ কিমি দীর্ঘ তুলশী গঙ্গা নদীটি দিনাজপুর জেলার নওয়াবগঞ্জ উপজেলার ধনপাড়া বিল থেকে উৎপন্ন হয়ে জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলার মধ্যে দিয়ে আদি প্রবাহ নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার ত্রিমোহনী নামক স্থানে ছোট যমুনা নদীতে মিলিত হয়েছে (পুরাতন পতন স্থল)। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাসন ও সেচ সুবিধা (Flood control Irrigation and Drainage, FCDI) বৃদ্ধির জন্য ষাটের দশক থেকে নদীটির নিম্ন অববাহিকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীটির বামতীর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নদীর তীরে পোল্ডার/বাধ নির্মাণ কারা হয়।

পর্যায়ক্রমিক গৃহীত বন্যা নিয়ন্ত্রণমূলক এ কার্যক্রমের মাধ্যমে মূল নদীর অববাহিকার ১৮ কিমি লুপকাটিং পদ্ধতির মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করা হয়। প্রবাহমান অংশটিকে চ্যানেলাইজেশনের মাধ্যমে আক্কেলপুর উপজেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার সীমানায় সমান্তরালে প্রবাহমান ছোট যমুনা নদীর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে (নতুন পতনস্থল)। কুড়ি বছরের অধিককাল অতিক্রান্তে মূল নদীর ১৮ কিমি বিচ্ছিন্ন অংশটি নব্বই দশকের প্রথম দিকে স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ পুরাতন/পরিত্যক্ত হিসেবে ঘোষণা করে। এ পরিত্যক্ত অংশে ৩টি মৎস্যজীবী/জেলে অধ্যুষিত গ্রাম এবং নতুন সংযোগস্থলে ১টি মৎস্যজীবী/জেলে অধ্যুষিত গ্রাম রয়েছে। নির্ভরশীল এ জনগোষ্ঠীর নিকট নদীটি এক সময় ছিল 'জীবন সূত্রক (Life Line)'।

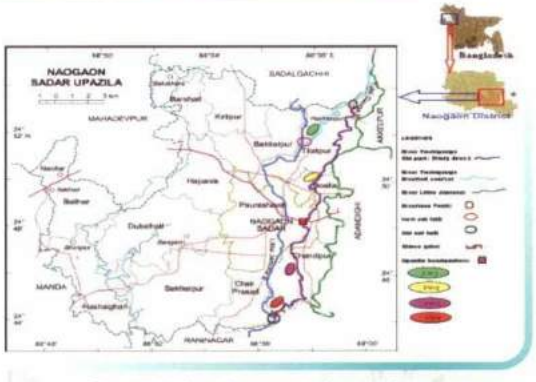

মানচিত্রে নদীর পরিবর্তিত গতিপথ ও নির্বাচিত কার্যক্রম এলাকার অবস্থান এবং নদীর পরিবর্তিত গতিপথের স্যাটেলাইট চিত্র

কার্যক্রম এলাকা

নদীর নতুন পতনস্থল (প্রবাহমান অংশ) হতে পুরাতন পতনস্থল (পরিতাক্ত অংশ) পর্যন্ত ১৮ কিমি নদী অংশের ৪টি এলাকা ও তৎসংলগ্ন মৎস্যজীবী গ্রাম- নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার মোহনপুর, সদর উপজেলার বোয়ালীয়া, ইলিশাবাড়ী ও চুনিয়াগাড়ী সমীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়।

কর্মপদ্ধতি ও উপাত্ত সংগ্রহ

নির্ধারিত দলীয় আলোচনা (Focus Group Discussion-FGD), প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নির্বাচিত ৪টি এলাকায় মৎস্যজীবী ও অমৎস্যজীবী পরিবারে মৎস্য সংশ্লিষ্ট ও জীবনযাত্রা বিষয়ক প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নদী অববাহিকায় এলাকাভিত্তিক মৎস্য উৎপাদন অবস্থা নিরূপণের জন্য আহরণ মূল্যায়ন জরিপ (Catch Assessment Survey, CAS) করা হয়। নির্ধারিত দলীয় আলোচনায় বিগত ৩০ বছরের তথ্য (১৯৮৭-২০০৮ পর্যন্ত) সংগ্রহ করা হয়। তথ্যের সঠিকতার জন্য অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকদের FGD- তে প্রাধান্য দেয়া হয়। মাধমিক তথ্য উপাত্ত বিভিন্ন রিপোর্ট, জার্নাল, মৎস্য বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় ভূমি অফিস, পরিসংখ্যান বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অফিসের রেকর্ড এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ওয়েবসোর্স থেকে সংগ্রহ করা হয়।

ফলাফল

তিন দশকে, পূর্বের তুলনায় নির্বাচিত এলাকায় ৩০-৪৯% মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে নির্বাচিত এলাকায় ২৮-৪০টি প্রজাতির মাছের প্রাপ্যতা পরিলক্ষিত হলেও ২৫-৩৫% মাছের প্রজাতি দুঃপ্রাপ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং দুই দশকের অধিককাল যাবৎ ২০টি প্রজাতির মাছ নির্বাচিত এলাকাগুলোতে দেখা যায় না বা বিলুপ্তির পথে যা ক্ষয়িষ্ণু মৎস্য প্রজাতি বৈচিত্র্যতার নিদের্শক। নিম্নে বিভিন্ন মৎস্য প্রজাতি দলের প্রাচুর্যের অবস্থা এবং বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছের তালিকা দেয়া হলো:

সারণি: দেশীয় মাছের প্রজনন মৌসুম ও পদ্মা-যমুনা নদী হতে পোনা সংগ্রহের সময়

মৎস্য দলীয় নাম	বিভিন্ন মৎস্য প্রজাতি প্রাচুর্যের অবস্থা ও সংখ্যা				মোট
	পর্যাপ্তভাবে প্রাপ্য	মাঝেমধ্যে প্রাপ্য	দুঃপ্রাপ্য	খুবই দুঃপ্রাপ্য	
Barb	১	-	-	-	১
Carp	-	-	৪	২	৬
Other cyprinid	-	৪	২	১	৭
Glassfish	১	১	-	-	২
Catfish	২	-	৩	৪	৯
Gobies	১	-	-	-	১
Eel	-	১	১	-	২
Gourami	-	১	১	-	২
Perches	-	-	-	১	১
Snake head	-	১	২	-	৩
Feather back	-	-	-	১	১
Top Minnows	-	১	-	-	১
Exotic Carps	-	-	২	-	২
Prawn	-	২	-	-	২
মোট	৫	১১	১৫	৯	৪০

সারণি: বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছের তালিকা

স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
Jatputi	*Puntius sophore*	Kajuli	*Ailia coila*
Sharputi	*Puntius sarana*	Chapila	*Gudusia chapra*
Gonia	*Labeo gonius*	Khas khoira	*Chela laubuca*
Air	*Sperata aor*	Rani	*Botia dario*
Bagha Air	*Bagarius bagarius*	Anju	*Danio rerio*
Rita	*Rita rita*	Sal Baim	*Mastacembelus armatus*
Cheka	*Chaca chaca*	Chitol	*Notopterus chitala*
Bacha	*Eutropiichthys vacha*	Bheda	*Nandus nandus*
Gulsha	*Mystus cavasius*	Gajar	*Channa marulius*
Gang Tengra	*Gagata gagata*	Potoka	*Tetraodon cutcutia*
মোট: ১০+১০=২০ টি প্রজাতি			

৩০ বছর পূর্বে নির্বাচিত এলাকায় নদী খাতের ৯২-৯৭% অংশ মাছ ধরার জন্য উন্মুক্ত ছিল, বর্তমানে তা ৪৩-৭২% এ হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ের ব্যবধানে নির্বাচিত এলাকায় পূর্বের ৪-৫ মি. পানির গভিরতা ৫০-৬০% হ্রাস পেয়েছে এবং পানিধারণের স্থায়িত্ব এলাকা ভেদে ৩-৪ মাস হতে ১-২ মাসে নেমে এসেছে। পাশাপাশি তিন দশকে নির্বাচিত এলাকার নদীতলদেশের ২৫-৫৭% ভাগ জায়গা বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে বা দখল হয়েছে, এর ১৫-৪৪% কৃষি জমিতে রূপান্তর।

১৯৭৮ সালে নির্বাচিত এলাকায় নদী ভূমির গড় ব্যবহার

২০০৮ সালে নির্বাচিত এলাকায় নদী ভূমির গড় ব্যবহার

নির্বাচিত এলাকায় নদী তলদেশ কৃষি জমিতে (মোহনপুর) রূপান্তরও নদীতে স্থাপনা (বোয়ালিয়া) নির্মাণের আলোক চিত্র

দৈনিক মাথা পিছু মৎস্য আহরণ হার পূর্বের তুলনায় ৪৯-৮৮% হ্রাস পেয়েছে এবং বর্তমানে প্রবাহমান অংশে বৎসরিক প্রাক্কলিত মৎস্য উৎপাদন ২১০ কেজি/হেক্টর। পক্ষান্তরে পরিত্যক্ত নদী অংশে গড় মৎস্য উৎপাদন ১২০ কেজি/হেক্টর। নির্বাচিত এলাকার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান ও সম্পদ হ্রাস পেয়েছে এবং দৈনদিন জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য তাদের দৈনিক গড় আয়ের ওপর এলাকাভেদে ১২-২০% অর্থ, ঋণ বা বিকল্প উপার্জনের মাধ্যমে সংস্থান করতে হচ্ছে। পাশাপাশি নির্বাচিত এলাকায় মৌসুমী মৎস্যজীবীর সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি জেলেদের পেশা পরিবর্তনের তাৎপর্যপূর্ণ নিদের্শক।

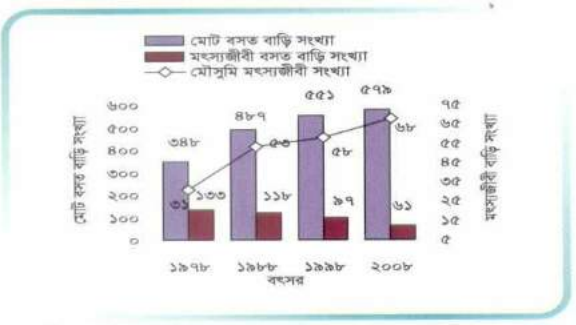

মানচিত্রে নদীর পরিবর্তিত গতিপথ ও নির্বচিত কার্যক্রম এলাকার অবস্থান এবং নদীর পরিবর্তিত গতিপথের স্যাটেলাইট চিত্র

সুপারিশমালা (Recommendations)

নদীর গতিপথে যে পরিবর্তন হয়েছে তা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়ত সম্ভব হবে না, ব্যয়বহুল এবং বাস্তবসম্মতও নয়। সমীক্ষাকালীন স্থানীয় জনগণ জলমহলটিও নির্ভরশীল মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত সুপারিশগুলো করেন:

- নদীর পরিত্যক্ত/ পুরাতন অংশের পুনঃখনন, যাতে পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং জলজ আবাসস্থলের উন্নয়ন করা।
- গভীরতম স্থানে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা।
- জলাভূমি সংরক্ষণ আইন ও নীতিমালার আলোকে নদীর তীরে এবং তলদেশে কৃষিকার্যসহ বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করা।
- খাস জমি হিসেবে কৃষক/ অন্য সুবিধাভোগীদের মধ্যে নদীর তলদেশের ভূমি পত্তন দেয়া বন্ধ করা।
- পোনা মজুদ কার্যক্রমসহ বিলুপ্ত প্রজাতির মাছ নদীতে ছাড়ার ব্যবস্থা নেয়া।
- প্রশিক্ষণসহ স্থানীয় মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

[১]জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নওগাঁ
[২]সহকারী পরিচালক, হুরা সাগরে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, সিরাজগঞ্জ

বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা এবং অধিক মৎস্য উৎপাদনে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন

(Fish Production Trend in Bangladesh and Good Aquaculture Practices for Production Boosting)

ড. এ কে এম আমিনুল হক

Abstract

Fish is the main source of animal protein in Bangladesh. Fisheries sector contributes 22.60% to the Agricultural GDP. Fish production has been increased five folds since after liberation over 43 years in the country through introduction of improved aquacultural technologies in ponds and tanks of its inland closed waterbodies and management policies in open waters. Now annual yield of 0.371 million ha ponds raised to 4.11 ton/ha. To meet the national demand it is targeted to raise the yield to 5 ton/ha over 2020-21. On the contrary, increased pressure coming from local and global markets to produce safe, quality and ecofriendly fish and fish production practices. Hence, Bangladesh Fisheries has no other alternatives but to boost production of its inland closed waterbodies for an accelerated growth rate of 0.1 million ton of fish per year. The paper identifies its inland closed waterbodies as the most reliable source of investment and suggests for boosting seven good aquaculture practice (GAPs) in this area in order to achieve the target.

মাছ বাংলাদেশের প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস। জাতীয় কৃষিজ উৎপাদনে মৎস্য খাতের অবদান ২২.৬০%। স্বাধীনতা-উত্তর বিগত ৪৩ বছরে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় ও পুকুর-দিঘিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দেশে মাছের উৎপাদন ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে বর্তমানে দেশের ৩.৭১ লক্ষ হেক্টর পুকুর-দিঘির গড় বার্ষিক উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৪.১১ মেট্রিক টন। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে ২০২০-২১ সালের মধ্যে এ উৎপাদন হার ৫.০ মে. টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যসম্মত, মাননিয়ন্ত্রিত ও পরিবেশবান্ধব মাছ চাষের দাবি ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে উন্নত চাষ প্রযুক্তির প্রয়োগে হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি সময়ের দাবি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নত ও লাগসই উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে ঈর্ষণীয় উৎপাদন প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য আহরণ ও বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম (FAO, ২০১৪)। বিগত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে দেশে মাছের উৎপাদন ছিল সর্বমোট ৩৫.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২১ সালের মধ্যে এই উৎপাদন ৪৫.৫২ লক্ষ টনে উন্নীত করতে মৎস্য উৎপাদনে বার্ষিক ন্যূনতম এক লক্ষ মে. টন প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন। এ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনাময় এ ক্ষেত্র হতে বার্ষিক ১ লক্ষ মে.টন উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহজ ও পরীক্ষিত (হক, ২০০৪) ৭ উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practices) কৌশল পরের পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হলো।

সারণি: ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০১৩-১৪ বাংলাদেশে বছর ও খাতওয়ারি মৎস্য উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি

অর্থ বছর	অভ্যন্তরীণ (ক)	সামুদ্রিক (খ)	অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় (ক১)	অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় (ক২)	সর্বমোট (ক+খ)	বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%)				
						মোট	অভ্যন্তরীণ	সামুদ্রিক	অভ্য. মুক্ত জলাশয়	অভ্য.বদ্ধ জলাশয়
১৯৯৯-০০	১৩২৭৫৮৫	৩৩৩৭৯৯	৬৭০৪৬৫	৬৫৭১২০	১৬৬১৩৮৪	–	–	–	–	–
২০০০-০১	১৪০১৫৬০	৩৭৯৪৯৭	৬৮৮৯২০	৭১২৬৪০	১৭৮১০৫৭	৭.২০	৫.৫৭	১৩.৬৯	২.৭৫	
২০০১-০২	১৪৭৫০৩৯	৪১৫৪২০	৬৮৮৪৩৫	৭৮৬৬০৪	১৮৯০৪৫৯	৬.১৪	৫.২৪	৯.৪৭	-০.০৭	১০.৩৮
২০০২-০৩	১৫৬৬২৮৯	৪৩১৯০৮	৭০৯৩৩৩	৮৫৬৯৫৬	১৯৯৮১৯৭	৫.৭০	৬.১৯	৩.৯৭	৩.০৪	৮.৯৪
২০০৩-০৪	১৬৪৬৮১৯	৪৫৫২০৭	৭৩২০৬৭	৯১৪৭৫২	২১০২০২৬	৫.২০	৫.১৪	৫.৩৯	৩.২০	৬.৭৪
২০০৪-০৫	১৭৪১৩৬০	৪৭৪৫৯৭	৮৫৯২৬৯	৮৮২০৯১	২২১৫৯৫৭	৫.৪২	৫.৭৪	৪.২৬	১৭.৩৮	-৩.৫৭
২০০৫-০৬	১৮৪৮৭৩৫	৪৭৯৮১০	৯৫৬৬৮৬	৮৯২০৪৯	২৩২৮৫৪৫	৫.০৮	৬.১৭	১.১০	১১.৩৪	১.১৩
২০০৬-০৭	১৯৫২৫৭৩	৪৮৭৪৩৮	১০০৬৭৬১	৯৪৫৮১২	২৪৪০০১১	৪.৭৯	৫.৬২	১.৫৯	৫.২৩	৬.০৩
২০০৭-০৮	২০৬৫৭২৩	৪৯৭৫৭৩	১০৬০১৮১	১০০৫৫৪২	২৫৬৩২৯৬	৫.০৫	৫.৭৯	২.০৮	৫.৩১	৬.৩২
২০০৮-০৯	২১৮৬৭২৬	৫১৪৬৪৪	১১২৩৯২৫	১০৬২৮০১	২৭০১৩৭০	৫.৩৯	৫.৮৬	৩.৪৩	৬.০১	৫.৬৯
২০০৯-১০	২৩৮১৯১৬	৫১৭২৮২	১০২৯৯৩৭	১৩৫১৯৭৯	২৮৯৯১৯৮	৭.৩২	৮.৯৩	০.৫১	-৮.৩৬	২৭.২১
২০১০-১১	২৫১৫৩৫৪	৫৪৬৩৩৩	১০৫৪৫৮৫	১৪৬০৭৬৯	৩০৬১৬৮৭	৫.৬০	৫.৬০	৫.৬২	২.৩৯	৮.০৫
২০১১-১২	২৬৮৩১৬২	৫৭৮৬২০	৯৫৭০৯৫	১৭২৬০৬৭	৩২৬১৭৮২	৬.৫৪	৬.৬৭	৫.৯১	-৯.২৪	১৮.১৬
২০১২-১৩	২৮২১২৬৬	৫৮৮৯৮৮	৯৬১৪৫৮	১৮৫৯৮০৮	৩৪১০২৫৪	৪.৫৫	৫.১৫	১.৭৯	০.৪৬	৭.৭৫
২০১৩-১৪	২৯২১৫৩৬	৫৯৫৩৮৫	১০০৩২৬৪	১৯১৮২৭২	৩৫১৬৯২১	৩.১৩	৩.৫৫	১.০৯	৪.৩৫	৩.১৪

বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন ক্রমধারা

বিগত ২০০০-০১ হতে ২০১৩-১৪ সন পর্যন্ত বাংলাদেশে বছর ও খাতওয়ারি মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক মৎস্য উৎপাদিত হয় অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে; আবার অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মধ্যে পুকুর-দিঘির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা সবচেয়ে বেশি । বিগত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে দেশের মৎস্য উৎপাদনে সামুদ্রিক উৎসের অবদান মাত্র ১৭.২৭%, পক্ষান্তরে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের অবদান ছিল ৫৪.৫৪%।

বিল নার্সারি স্থাপন, পোনা অবমুক্তি, মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থপনা, খাল পুনঃখনন, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন প্রভৃতি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের পরও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন সীমিত। জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান, আপৎকালীন খাদ্য সহায়তা এবং ভরা প্রজনন মৌসুমে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ইলিশের প্রাপ্যতা ও প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি সত্ত্বেও সত্তরের দশকে জাতীয় উৎপাদনে ইলিশের ৫০% অবদানের বিপরীতে ২০১২-১৩ সালে মাত্র ১০%। অবশ্য ২০০৩-০৪ সাল হতে ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের পর হতে ইলিশের প্রবৃদ্ধি আশাব্যঞ্জক।

উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলনসমূহ
(Good Aquaculture practices)

১. মাঘ মাসে পুকুর প্রস্তুতি

মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে ফাল্গুন মাস হতে মাছের উৎপাদন বর্ষ শুরু হয়। মাছের উৎপাদন বছরের শুরুতেই পোনা মজুদের জন্য পুকুর প্রস্তুতির কাজ মাঘ মাসেই সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এটি মাছ চাষে সাফল্যের প্রথম সোপান। এক্ষেত্রে নিচের কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করণীয়:

১.১ পাড় মেরামত

পুকুরের পাড় ভাঙ্গা হলে মেরামত করতে হয়। পাড়ে ঝোপ-জঙ্গল, আগাছা বা ছায়াযুক্ত উঁচু গাছ থাকলে ডালপালা ছেঁটে দিয়ে পুকুরের পানিতে পর্যাপ্ত সূর্যকিরণের ব্যবস্থা করতে হয়। একটি কথা আছে 'যদি পড়ে রোদ্রের কিরণ, দেখবে কেমন মাছের ফলন'।

১.২ চুন প্রয়োগ

নতুন পুকুর হলে পুকুরের তলায় প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে পাথুরে চুন ১ দিন আগে পানিতে ভিজিয়ে রেখে তরল করে ছিটিয়ে দিতে হয়। পুকুরে পানি না থাকলে বা শুকনা পুকুর হলে পুকুরে ৫-৬ ফুট পানি দিতে হয়। পুরাতন মাছ চাষের পুকুর হলে এবং সেখানে রাক্ষুসে ও আমাছা (Weed fish) থাকলে চুন প্রয়োগের আগেই জাল টেনে বা রটেনন প্রয়োগে রাক্ষুসে মাছ ও আমাছা পরিস্কার করতে হয়।

১.৩ সার প্রয়োগ

চুন প্রয়োগের ৪-৫ দিন পর পুকুরে পরিমিত পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রতি শতাংশে ১০০-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০-৭৫ গ্রাম হারে টিএসপি সার প্রয়োগ করা হয়। অর্গানিক একুয়াকালচার বা স্বাস্থ্যঝুঁকিমুক্ত মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় না। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে চুন প্রয়োগের পূর্বেই পুকুর শুকিয়ে পুকুরের তলায় ধৈঞ্চা, শন, বরবটি ইত্যাদির বীজ ছিটিয়ে সবুজ সার উৎপাদন করা হয়। এসব উদ্ভিদের চারা দেড়-দুই ফুট হলে মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। এখানে একটি কথা খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, পুকুরে আগে চুন প্রয়োগ করতে হয়, পরে সার দিতে হয়। তা না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

২. ফাল্গুন মাসে চাপের পোনা মজুদ

উৎপাদন বর্ষের শুরুতেই পুকুরে গুণগত মানসম্পন্ন পোনা মজুদ মাছ চাষে সাফল্যের দ্বিতীয় সোপান। রুইজাতীয় মাছের উৎপাদন বর্ষ শুরু হয় ফাল্গুন মাস হতে। এসময় শীতের পর বসন্তের আগমনে আবহাওয়া উষ্ণ হতে থাকে। ফলে গরমের প্রভাবে মাছের খাদ্য গ্রহণ বেড়ে যায় ও মাছ দ্রুত বাড়তে থাকে। এজন্য এ সময়ে গত বছরের পুরাতন চাপের পোনা মজুদ করতে হয়। কারণ গত বছরের শীত-পার-করা ও চাপ-করে-রাখা পুরাতন চাপের পোনার বয়স বেশি হওয়ার কারণে এগুলো মৌসুমের শুরু হতেই দ্রুত বাড়তে থাকে। ফলে খুব কম সময়েই এগুলো বাজারজাত করা যায়।

৩. নির্বাচিত প্রজাতির নির্দিষ্ট সংখ্যক বড় মাপের নির্দিষ্ট অনুপাতে গুণগত মানসম্মত পোনা মজুদ

উৎপাদন বছরের শুরুতে নির্বাচিত প্রজাতির বড় মাপের নির্দিষ্ট সংখ্যক গুণগত মানসম্মত পোনা নির্দিষ্ট অনুপাতে মজুদ মাছ চাষে সাফল্যের তৃতীয় সোপান। সাধারণত পোনা যত বড় হবে উৎপাদন তত বেশি হবে। পোনা ১০ সেমিথেকে ১৫ সেমির নিচে নয়, কব্জি কব্জি হলে ভালো হয়, আরও বড় হলে আরও ভালো হয়। পুকুরে রুইজাতীয় মাছ চাষের ক্ষেত্রে মিশ্রচাষই অধিক লাভজনক। এক্ষেত্রে পুকুরের সকল স্তরের খাদ্য ও বাসযোগ্য স্তরের সুষম ব্যবহার হয়। প্রতি শতকে মোট ৫০টি হিসাবে উপরের স্তরের জন্য ৫০% কাতলা ও সিলভার কার্প, মধ্যস্তরের জন্য ২৫% রুই ও নিচের স্তরের জন্য ২৫% মৃগেল, কালিবাউস ও কার্পিও মাছ মজুদ করা যায়। হালদা, যমুনা, পদ্মা প্রভৃতি নদীর প্রাকৃতিক উৎসের পোনা হলে ভালো হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশনকৃত পরীক্ষিত ভালো হ্যাচারি হতে গুণগত মানসম্মত পোনা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৪. পোনা ধাতস্থকরণ ও সঠিক নিয়মে অবমুক্তকরণ

পোনা ধাতস্থকরণ ও সঠিক নিয়মে অবমুক্তকরণ পোনা মজুদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। অনেক সময় পোনা পৌঁছামাত্র সরাসরি পুকুরে ঢেলে মজুদ করা হয়ে থাকে। এটি

ঠিক নয়। পোনা পরিবহন পাত্র ও পুকুরের পানির পরিবেশ সাধারণত এক হয় না। পুকুরের নতুন পরিবেশের সাথে পোনাকে খাপ খাইয়ে মজুদ না করলে অধিকাংশ বা সব পোনাই তাৎক্ষণিক বা কিছু বিলম্বে মারা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পরিবহন পাত্র ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি বিবেচ্য। উভয়ের তাপমাত্রার পার্থক্য ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি হলে ১০০% পোনার মৃত্যু হতে পারে। এজন্য তাপমাত্রার পার্থক্য ০-২ ডিগ্রির মধ্যে নামিয়ে আনতে হয়। পরিবহন পাত্রে পুকুরের পানি অল্প অল্প করে ঢেলে সমপরিমাণ পানি পাত্র হতে ফেলে দিয়ে তাপমাত্রার সমতা বিধান করা যায়। পলিথিন ব্যাগে পোনা পরিবহন করা হলে ১৫-২০ মিনিট পুকুরে পলিথিন ব্যাগ ভাসিয়ে রেখে পরে ব্যাগের মুখ খুলে আস্তে আস্তে পুকুরের পানি ঢুকিয়ে পোনা অবমুক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে ৪৫ ডিগ্রি কোণে পাত্রকে কাত করে ধরলে পুকুরের পানি পাত্রে ঢুকতে থাকবে ও পোনা আপনা আপনি ঝাঁক বেঁধে পুকুরে বেরিয়ে যাবে।

৫. প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ এবং দৈনিক নিয়মিত সুষম সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ

পুকুরে পরিমিত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত ও দৈনিক নিয়মিত সুষম সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। পুকুরের পানির সেকিডিস্ক পাঠ ৩০ সে.মি. এর বেশি হলেই প্রতি শতাংশে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করা যেতে পারে। মাছের ওজনের ৩%-৫% হারে দৈনিক নিয়মিত দানাদার মানসম্মত সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। ডুবন্ত খাদ্যের চেয়ে ভাসমান খাদ্য ভালো। কারণ এ ক্ষেত্রে মাছ কতটুকু খাদ্য গ্রহণ করছে তা বোঝা যায় এবং সেই অনুপাতে খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। মেঘলা দিনে সার প্রয়োগ ও খাদ্য সরবরাহ বন্ধ রাখা শ্রেয়।

৬. মাসে মাসে জাল টেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষণ

পুকুরে মাসে মাসে জাল টেনে মাছের নমুনায়ন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন। মাছ কতটুকু খাদ্য খেয়ে কতটুকু বাড়লো তা বের করে লাভ-ক্ষতি নির্ধারণ ও দৈনিক সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়। মাছে ঘা বা অন্য কোন রোগ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

৭. আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে জীবন্ত মাছ বিপণন

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বাজার যাচাই করে পুকুর পাড়ে পাইকার ডেকে জীবন্ত মাছ বিপণন করা অধিক লাভজনক। এ সময় চাষকৃত মাছের বাজার চড়া থাকে এবং জীবন্ত মাছ অন্ততঃ ১০% অধিকমূল্যে বিক্রয় হয়। এতে অন্ততঃ ৫% আড়ৎ ও পরিবহন ব্যয়ও সাশ্রয় হয় এবং ভোক্তা পর্যায়ে তাজা ও জীবন্ত মাছ সরবরাহ সহজ হয়। জীবন্ত মাছ দূষণ ও পচনমুক্ত এবং স্বাস্থ্যসম্মত। ভোক্তা পর্যায়েও এই মাছের চাহিদা বেশি। ইদানিং সারা দেশেই জীবন্ত মাছ পরিবহন ও বিপণন ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফরমালিনের কুফল হতে পরিত্রাণ ও গুণগত মান সংরক্ষণের জন্য সরকারিভাবে পরিবহনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান ও বাজারজাতকরণে আনুষাঙ্গিক ভৌত সুযোগ-সুবিধাদি সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

উপসংহার
(Conclusions)

মৎস্যচাষ একটি বহুমাত্রিক জৈব উৎপাদন ব্যবস্থাপনা। উৎপাদনের সাথে জড়িত বিভিন্ন ভৌত-রাসায়নিক নিয়ামক, প্রতিবেশ, মৌসুম, উৎপাদন চক্র, বাজার চাহিদা, উপকরণ প্রাপ্যতা ও বিপণন ব্যবস্থাপনা। রয়েছে বহুমুখী ব্যবসায়িক ও আর্থ-সামাজিক প্রতিযোগিতা এবং প্রতিবন্ধকতা। সেই সঙ্গে অবারিত রয়েছে নবতর প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং নানামাত্রিক সৃজনশীল উত্তরণ বিকল্প। আধুনিক জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আলোকে এসব কিছু লাভজনকভাবে সমন্বয় করে সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করা সম্ভব। লাভ মুখ্য হলেও মৎস্যচাষে জনস্বাস্থ্য ও জনস্বার্থ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান জরুরি। প্রতিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের ওপর প্রভাবও বিশেষভাবে বিবেচ্য। বিবেচ্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আইন, বিধি ও প্রবিধান। এসব কিছু বিবেচনা করে মৎস্যচাষে উপরোক্ত সাত উত্তম অনুশীলন -এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বর্ণিত পদ্ধতিতে মৎস্যচাষে একজন উদ্যোক্তা গুণিতক হারে লাভবান হবেন অন্যদিকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও সহজ হবে।

আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রথমত ফাল্গুন মাসে আগের বছরের চাপের পোনা মজুদ করা হয়। দ্বিতীয়ত মাছ বিক্রয়ের পরপরই পুনরায় পুকুর প্রস্তুত করে পোনা/মাছ মজুদ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতি চার মাস অন্তর পোনা মজুদ ও মাছ আহরণ করা হয়, পোনা মজুদ ও মাছ আহরণে মাস বিবেচনা করা হয় না। তবে উভয় ক্ষেত্রেই পুরাতন চাপের পোনা বা বড় মাছ মজুদ করা হয়। পুরাতন চাপের রুইজাতীয় মাছের পোনা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মজুদ করে পরের বছর জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে আহরণ করে বাজারজাত করলে লাভ সবচেয়ে বেশি হয়। এই ১৬ মাসের চাষ মেয়াদে খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা ভালো হলে একেকটি কাতলা ৩-৪ কেজি এবং রুই-মৃগেল ২.০-৩.০ কেজি হয়ে থাকে। বর্ণিত নিয়মে মাছ চাষ করলে মাছের দ্বিগুণ উৎপাদন ও ত্রিগুণিত আয় আশা করা যায়। এই ১৬ মাসের চাষ মেয়াদে প্রচলিত ১২ মাসের চাষ পদ্ধতি অপেক্ষা নিশ্চিতভাবে মাছের ওজন দ্বিগুণ এবং আকারে বড় হওয়ার কারণে দরহারও বেশি হয়। সুতরাং সার্বিকভাবে লাভ তিন গুণ বেশি পাওয়া যায়। দেশের ৩.৭১ লক্ষ হেক্টর পুকুর-দিঘির ৫০% অংশে বর্ণিত প্রযুক্তি সম্পসারণ করা সম্ভব হলে দেশে ২০২১ সালের মধ্যে হেক্টর প্রতি বার্ষিক গড় উৎপাদন ৫.০ মে. টন হতে ৬.০ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব।

উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা।

মাছ ও চিংড়ি চাষে প্রোবায়োটিক ব্যবহার : সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

Use of Probiotics in Fish and Shrimp Culture : New Horizon of Possibilities

ড. খন্দকার আনিছুল হক[১], জয়ন্ত বীর[২] ও মোঃ আবুল কালাম আজাদ[৩]

Abstract

The use of probiotic is environment-friendly and helps to increase production through competitive exclusion of potentially pathogenic microorganisms; digestion enhancement by participating in digestion process, supplying fatty acids and vitamins; providing necessary growth factors; and immunity enhancement. To determine the effect of probiotics on production performance of freshwater prawn, a study was conducted. Prawn PL were stocked at the rate of 2/m2 and were reared upto eight months. The total production were found 694, 742, 850 and 932kg/ha in 4 treatments. The water and soil quality parameters found suitable and the prawn was free from potential pathogenic bacterial hazard, survival rate was found 87.81, 89.10, 88.50 and 90.32%. Therefore, it can be said that the application of probiotics in aquaculture could be considered as a sustainable alternative to antibiotics and would produce safe food with higher production. As a developing country, probiotic based aquaculture could keep diverse contributions such as production enhancement, safe food product to attract export market and employment opportunity for the poor fisher-folks.

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে চিংড়ি ও মাছ তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত হিসেবে স্বীকৃত। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট মাছ উৎপাদন হয়েছে ৩৪.১০ লক্ষ মে.টন, যার বাজারমূল্য প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। একই অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ১৮৫২৭৪ মে.টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে যার মধ্যে ১৪০২৬১ মে.টন চাষকৃত চিংড়ি। যদিও খুলনা অঞ্চলের মাঠ পর্যায়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে গলদার চাষ হচ্ছে যার হেক্টর প্রতি উৎপাদন মাত্র ৩০০-৬০০ কেজি। তবুও বিগত অর্থবছরে কেবল ৫০৩৩৩ মে.টন হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করেই ৩৩৭৬.২ কোটি টাকা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও চিংড়ির ব্যাপক চাহিদা আছে। গুণগতমান ও আকারভেদে দেশেই প্রতি কেজি চিংড়ি ৪০০-১২০০ টাকায় বিক্রয় করা যায়। অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় এ শিল্প আজ নানাকারণে ঝুঁকির মুখে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ বাগদা চিংড়ির ক্ষেত্রে চাষ পর্যায়ে ও গলদা চিংড়ির ক্ষেত্রে হ্যাচারি পর্যায়ে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হওয়ায় জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ রপ্তানি খাতটি এখন ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন। চিংড়ির রোগবালাই দমনে নানাবিধ অ্যান্টিবায়োটিকের (জীবাণুনাশক) যথেচ্ছ ব্যবহার এ শিল্পকে ক্রমশ ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারের ফলে ক্ষতিকর জীবাণুসমূহের মধ্যে ঔষধ-প্রতিরোধী ক্ষমতা (drug resistance) বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে তেমন কোনো টেকসই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী (BAS) ও যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি অধিদপ্তর (USDA)-এর কৃষি ও জীববিজ্ঞান কর্মসূচি (PALS) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞানে উচ্চতর গবেষণা প্রকল্পের আওতায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিসারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি (FMRT) ডিসিপ্লিনের একদল গবেষক সাম্প্রতিক কয়েকটি ধারাবাহিক গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, গলদা চিংড়ির পরিবেশবান্ধব চাষ, স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষতিকর জীবাণু নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যমান রোগের ঝুঁকি কমাতে উপকারী বন্ধু অণুজীব বা প্রোবায়োটিকের ব্যবহার টেকসই সুরক্ষা দিতে পারে। চিংড়ি ছাড়াও অন্যান্য মাছ চাষের ক্ষেত্রে প্রোবায়োটিক ব্যবহার করা হলে মজুদ ঘনত্ব বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। আমাদের দেশে মাছ ও চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে প্রোবায়োটিকের ব্যবহার নতুন। তাই প্রোবায়োটিকের পরিচিতি ও ব্যবহার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

প্রোবায়োটিক (Probiotics)

যেসব জীবিত অণুজীব পোষকের (মাছ, চিংড়ি, মানুষ ইত্যাদি যে কোনো প্রাণী) দেহে ও পরিবেশে উপস্থিত থেকে পোষককে ক্ষতিকর রোগজীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয় ও পোষকের দৈহিক বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে সেসব উপকারী অণুজীবকেই প্রোবায়োটিক নামে অভিহিত করা হয়। সহজ কথায় প্রোবায়োটিক হলো উপকারী বন্ধু অণুজীব (প্রধানত ব্যাকটেরিয়া জাতীয়) যাদের উপস্থিতিতে জীবদেহ ও পরিবেশের ক্ষতিকর অণুজীব দমন করা যায় এবং তাদের ক্ষতি করার ক্ষমতাও কমানো যায়। ফলে চাষযোগ্য প্রজাতিকে বিভিন্ন রোগব্যাধি হতে বাঁচিয়ে পরিবেশবান্ধব চাষ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন এবং সার্বিক উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়।

প্রোবায়োটিকের ব্যবহার (Use of Probiotics)

জলজ পরিবেশ স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন প্রকার উপকারী ও অপকারী অণুজীবের বংশবিস্তারের জন্য উপযুক্ত। এ পরিবেশে অপকারী অণুজীবগুলোর আক্রমণে মাছ ও চিংড়ি রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। এসব রোগবালাই সৃষ্টিকারী অপকারী অণুজীবসমূহকে নিয়ন্ত্রণে যুগ যুগ ধরে অ্যান্টিবায়োটিক এবং মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু অননুমোদিত অ্যান্টিবায়োটিকের মাধ্যমে ক্ষতিকর জীবাণু মেরে ফেলা গেলেও একইসাথে জীবদেহে ও খামারের আশপাশের পরিবেশে বিদ্যমান নানান উপকারী অণুজীবেরও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। অ্যান্টিবায়োটিকের অপরিমিত ও অবাধ প্রয়োগের ফলে ক্ষতিকর জীবাণুর নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা

(resistance power) তৈরি হয়। ফলে এক সময় অ্যান্টিবায়োটিকের মাধ্যমে ক্ষতিকর জীবাণু আর দমন করা যায় না। তাছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগে তাৎক্ষণিক সমাধান হলেও দীর্ঘমেয়াদে তা মানবদেহে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এজন্য রোগ দমনে অ্যান্টিবায়োটিকের বিকল্প হিসেবে প্রোবায়োটিকের ব্যবহার অধিক যৌক্তিক এবং স্থায়িত্বশীল বলে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রোবায়োটিকের উপকারিতা (Benefits of Probiotics)

প্রোবায়োটিক জীবদেহে ও পরিবেশে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; যেমন- চাষকৃত প্রজাতির অন্ত্রে উপকারী অণুজীবের বংশবিস্তার করে, ক্ষতিকর জীবাণুর টিকে থাকা ও সংক্রমণ প্রতিরোধ করে, ক্ষতিকর জীবাণুরোধী বস্তু (ব্যাকটেরিওসিন ও জৈব এসিড) নিঃসৃত করে ও বিপাকীয় উৎসেচক (digestive enzymes) উৎপন্ন করে, পরিপাক ক্রিয়া বা হজমে সহায়তা করে, বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান ও ভিটামিন উৎপাদনে সহায়তা করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ক্ষতিকর জীবাণুর অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি প্রতিরোধে জৈবিক নিয়ন্ত্রক এজেন্ট হিসাবে কাজ করে, পোষকদেহের পীড়নজনিত ক্ষতিকর অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে, পরিবেশের মাটি ও পানির উন্নয়ন ঘটায়, কতিপয় ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান নিষ্ক্রিয় করে ইত্যাদি। এজন্যই উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও চিংড়ি চাষে প্রোবায়োটিকের পরিমিত ব্যবহার প্রয়োজন।

প্রোবায়োটিকের কাজ করার প্রক্রিয়া (Action prosess of Probiotics)

জীবদেহে প্রোবায়োটিক ঠিক কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে বিগত কয়েক দশকের গবেষকগণ তাদের গবেষণার ভিত্তিতে নানা তথ্য দিয়েছেন। প্রোবায়োটিকের কাজের ক্ষেত্রে বর্ণিত উপায় ও পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো: (১) অন্ত্রের অভ্যন্তরভাগে উপকারী প্রোবায়োটিক অণুজীব বংশবিস্তার করে অন্ত্র বরাবর অবস্থান গ্রহণ করায় ক্ষতিকর জীবাণুর আক্রমণ ভাগ অন্ত্রে সংযুক্ত হতে পারে না ও নিষ্ক্রান্ত হতে বাধ্য হয়। এটি ক্ষতিকর জীবাণুসমূহের বাসস্থানগত প্রতিযোগিতামূলক দমন বা দূরীকরণ (competitive exclusion of pathogenic bacteria)পদ্ধতি হিসাবে বেশ আলোচিত। (২) পর্যাপ্ত সংখ্যক উপকারী প্রোবায়োটিক অণুজীব জীবদেহ ও পরিবেশে থাকলে তারা স্বভাবতঃই প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ প্রাপ্তির প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হয়ে থাকে। পুষ্টি উপাদান সমূহ প্রাপ্তিরে এহেন প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থানে ক্ষতিকর অণুজীবের বৃদ্ধি ব্যহত হয় ও তারা টিকে থাকতে পারে না। (৩) কিছু কিছু প্রোবায়োটিক উদ্বায়ী ফ্যাটি এসিড ও ক্ষতিকর জীবাণুরোধী বস্তু (antibacterial compounds) তৈরি করায় ক্ষতিকর অণুজীবের বৃদ্ধি ব্যহত হয় ও তারা দূরীভূত হয়। (৪) কিছু প্রোবায়োটিক অণুজীব বিপাকীয় উৎসেচক (যেমন-প্রোটিয়েজ, লাইপেজ, এমাইলেজ ইত্যাদি) নিঃসরণ ঘটিয়ে পোষকের বিপাক প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। বিপাকের মাধ্যমে উৎপাদিত দরকারী এমাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড, ভিটামিন ইত্যাদি জৈব পুষ্টি উপাদান পোষক কর্তৃক সরাসরি পরিশোষিত হওয়ায় পোষকের বৃদ্ধি তরান্বিত হয়। (৫) মাটি ও পানির গুণগত মান উন্নয়ন, পিএইচ নিয়ন্ত্রণ, তলার বর্জ্য শোধন, ক্ষতিকর এমোনিয়া ও নাইট্রাইট দূর করা ইত্যাদির জন্য প্রোবায়োটিক হিসাবে বেসিলাস (Bacillus sp.) গণের ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার বেশ প্রসিদ্ধ। এর ফলে মাছ বা চিংড়ি জাতীয় পোষকের বাঁচার হার, দৈহিক বৃদ্ধি হার বাড়ে ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হয়। (৬) কিছু কিছু ফটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া সূর্যের আলো কাজে লাগিয়ে দ্রুত কাঙ্ক্ষিত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। আবার কিছুকিছু ব্যকটেরিয়ার শৈবালনাশক প্রভাবকে (algicidal effect) কাজে লাগিয়ে অত্যাধিক মাত্রার অনাকাঙ্ক্ষিত শৈবাল (বিশেষতঃ লাল শৈবাল স্তর) নিয়ন্ত্রণ করা যায়। (৭) কিছু কিছু প্রোবায়োটিক খাদ্যের সাথে জীবদেহে প্রবেশ করালে তা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে (immune system) উদ্দীপ্ত করে; প্রতিরক্ষামূলক শ্বেত রক্ত কণিকার (leucocytes) ফ্যাগোসাইটিক ক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়; ফলে জীবাণুনাশ ও রোগব্যাধি প্রতিরোধ সহজ হয়। তাছাড়াও ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে প্রোবায়োটিকের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা অদ্যাবধি চলমান আছে।

প্রোবায়োটিকের নিয়মিত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা (Importance of regular use of Probiotics)

রোগ হওয়ার পর চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগ প্রতিরোধ সর্বদাই উত্তম। মাছ ও চিংড়ির অন্ত্রে উপকারি এবং অপকারি এই উভয় প্রকার অনুজীবই বিদ্যমান। সুযোগসন্ধানী ক্ষতিকর অপকারি অনুজীবগুলো সুযোগ পেলেই মাছ ও চিংড়িতে রোগ তৈরি করে, ফলে দৈহিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়, এমনকি মৃত্যুর ঝুকি বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে প্রোবায়োটিক জীবদেহের বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই মাছ ও চিংড়ির অন্ত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ উপকারি অণুজীব বা প্রোবায়োটিকের সংখ্যা বজায় রাখা খুবই জরুরি। কিন্তু অনেক সময় নানা কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক কারণে যেমন- অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ বা এর বাহ্যিক ব্যবহার, নানাবিধ পীড়ন ও ধকল, বাসস্থান ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে উপকারি অণুজীবের সংখ্যা কমে যেতে পারে। পরিবেশে উপকারি এবং অপকারি অণুজীবের ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলেই পরিবেশ দূষিত হয়, উপকারি অণুজীবের বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ বিনষ্ট হয়, চাষযোগ্য প্রজাতিতে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশ: আরো নানা সমস্যা তৈরি হতে থাকে। তাই কেবল দূষিত পরিবেশে বা রোগাক্রান্ত অবস্থার জন্য নয় বরং সুস্থ ও স্বাভাবিক সময়কালেও মাছ ও চিংড়ি চাষে নিয়মিত প্রোবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত।

প্রোবায়োটিক নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় (Probiotics Selection criteria)

মাছ বা চিংড়ি চাষে ব্যবহারের জন্য বাজারে নানা ধরনের প্রোবায়োটিক পাওয়া যায় যার সবই আমদানীকৃত।এসব প্রোবায়োটিকের ব্যবহার পদ্ধতি ও প্রয়োগমাত্রা প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ করা আছে। মনে রাখা প্রয়োজন, চাষকৃত প্রজাতিতে ও চাষ পরিবেশে প্রাকৃতিকভাবেই উপকারী ও অপকারী উভয় প্রকার অণুজীব থাকে। স্থানীয় পরিবেশে ও সুস্থ জীবদেহে প্রাপ্ত স্বাভাবিকভাবে উপকার প্রদানকারী প্রোবায়োটিক যেকোনো বিদেশি প্রোবায়োটিক অপেক্ষা শ্রেয়। তাই সর্বাগ্রে সুস্থ জীবদেহে ও স্থানীয় পরিবেশে প্রাপ্ত অণুজীবের সাথে মিল রেখে মানসম্পন্ন

প্রোবায়োটিক ব্যবহার করাই ভাল। প্রোবায়োটিক নির্বাচন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিকটস্থ মৎস্য কর্মকর্তা বা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ গবেষকের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে কোনো ক্রমেই কেবল বিক্রেতার পরামর্শে প্রোবায়োটিক ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। কারণ কোনো কোনো বিক্রেতা তার নিকট থাকা প্রোবায়োটিক অণুজীব ও তার কার্যকারিতার মেয়াদ সম্বন্ধে না জেনে কেবল লাভের স্বার্থে বিক্রয় করে চাষিকে অযাচিত ব্যয় বাড়াতে প্রলুব্ধ করতে পারে।

মাছ ও চিংড়ি চাষে প্রোবায়োটিকের ব্যবহার (Use of Probiotics in fish and shrimp Culture)

ভাল উৎপাদনের জন্য পুকুর প্রস্তুতির স্বাভাবিক কাজগুলো করার পাশাপাশি পুকুরের আয়তন অনুযায়ী মাটিতে ব্যবহারযোগ্য প্রোবায়োটিক (সুপার পিএস বা পন্ড প্লাস বা পন্ড ডি টক্স) প্যাকেটে নির্ধারিত মাত্রা ও পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হয়। যেমন-পুকুরের তলার মাটিতে ব্যবহারযোগ্য প্রোবায়োটিক সুপার পিএস হেক্টরে ৩০-৫০ লিটার হারে তলার জৈব পদার্থের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হয় ও পরে প্রতি সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে চাষের শুরুতে ০.৫ পিপিএম হারে, মাঝে ১ পিপিএম হারে ও শেষে ১-২ পিপিএম হারে তা প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে হয়। আবার পুকুরে প্রয়োজন মত পানি প্রবেশ ও সার প্রয়োগ করার পর প্রয়োজন হলে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য সহায়ক প্রোবায়োটিক (যেমন- অ্যাকোয়া গোল্ড ১.৫ লি/একর বা অ্যাকুয়া ফটো ৫০-৭০ মিলি/একর) পরিমাণমত ব্যবহার করা যেতে পারে। নার্সারি পুকুরে মাছের ছোট পোনা বা চিংড়ির পিএল লালনকালে মাটি ও পানিতে এবং খাদ্যের সাথে ব্যবহারযোগ্য প্রোবায়োটিক প্যাকেটে বর্ণিত ব্যবহরিবিধি অনুসরণে প্রয়োগ করতে হবে। মজুদ পুকুরেও লালন পুকুরের ন্যায় একইভাবে প্রতিবার খাদ্য প্রয়োগের সময় খাদ্যের সাথে পরিমাণ মত প্রোবায়োটিক (জাইমেটিন ৫ গ্রাম/কেজি খাদ্যে বা বায়োজাইম ৫০ গ্রাম/১০০কেজি খাদ্যে) মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে তলার মাটি ও বর্জ্য শোধন ও পানিতে ব্যবহারযোগ্য প্রোবায়োটিক (সুপার পিএস পূর্বে বর্ণিত হারে বা গোল্ডেন ব্যাক ১.৫০-২.০০ কেজি/একর) প্রয়োগ করতে হয়।

সাম্প্রতিক একটি গবেষণার উৎপাদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পুকুরে গলদা চিংড়ির পিএল ২ মাস লালন করে ৮০টি গলদা জুভেনাইল/শতাংশ মজুদ করে ৬ মাসব্যাপী নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে চাষ করা হয়েছে। এতে করে প্রোবায়োটিকবিহীন চাষে হেক্টর প্রতি ৬৯৪ কেজি এবং মাটি ও খাদ্যে ব্যবহারযোগ্য প্রোবায়োটিক ব্যবহার করে চাষ করায় হেক্টর প্রতি ৯৩২ কেজি চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। বাজারে গলদা চিংড়ি আকারভেদে ৪০০-১২০০ টাকায় বিক্রয় হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, চিংড়ির বাজারমূল্য গড়ে ৫০০ টাকা ধরে হিসেব করা হলেও প্রোবায়োটিকবিহীন চাষে প্রতিহেক্টরে ব্যয় ২,০১,০০০ টাকা, ব্যয় বাদে নীট আয় ১,৪৬,০০০ টাকা। মাটি ও খাদ্যে ব্যবহারযোগ্য প্রোবায়োটিকসহ গলদা চাষে হেক্টর প্রতি প্রোবায়োটিক বাবদ ৪৫০০০ টাকা ব্যয়সহ সর্বমোট ব্যয় ২,৪৬,০০০ টাকা, নীট আয় ২,২০,০০০ টাকা। প্রোবায়োটিক ব্যবহার করে একই ব্যবস্থাপনায় গলদা চাষ করে হেক্টর প্রতি নীট ৭৪,০০০ টাকা অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব।

সতর্কতা (Precaution)

- পুকুরে প্রোবায়োটিক ব্যবহারের পূর্বে ক্রয়কৃত পণ্যে জীবিত প্রোবায়োটিকের পরিমাণ যাচাই করা ও মেয়াদ আছে কি না দেখা আবশ্যক।
- পুকুর প্রস্তুতকালে পানি শোধন করার পর অন্য কোন ক্ষতিকর বা প্রতিযোগী অণুজীব বংশবিস্তারের পূর্বেই প্রোবায়োটিক ব্যবহার করা হলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- প্রোবায়োটিক রোগ হওয়ার পূর্বেই রোগ প্রতিরোধকারী হিসেবে নিয়মিত ব্যবহার করতে হবে। কেবল রোগ হয়ে গেলে প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার ভাল ফলদায়ক নাও হতে পারে।
- সাধারণত স্থির পানিতে বা কম পরিচলনশীল পানিতে প্রোবায়োটিক ব্যবহার করলে তা অধিক কার্যকর হয়ে থাকে।
- প্রোবায়োটিক ব্যবহারের পরেও পরিবেশে অতিরিক্ত ক্ষতিকর অণুজীবের সংক্রমণ রোধ করতে সংক্রমিত ব্যক্তি বা সব ধরনের বস্তু সামগ্রী হতে নিরাপত্তা বিধান করা উচিত।
- প্রোবায়োটিক ব্যবহার কালে এমন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক বা রাসায়নিক ব্যবহার করা উচিত নয় যা প্রোবায়োটিকের মৃত্যুর কারণ হয় বা তাঁদের বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ বিনষ্ট করে।
- ব্যবহারকালে অ্যাপ্রোন, গ্লোভস ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশের মাছ ও চিংড়ি শিল্পকে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পূর্বক সম্ভাবনার অপার দিগন্ত খুলে দিতে পারে প্রোবায়োটিক। প্রোবায়োটিক ব্যবহার করে বিদ্যমান ক্ষতিকারক ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ও বিভিন্ন রোগবালাইয়ের প্রকোপ হতে সুরক্ষা দেয়া গেলে মাছ ও চিংড়ি চাষে রুপালি বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। অ্যান্টিবায়োটিক ও রাসায়নিকের পরিবর্তে উপকারী অণুজীব ব্যবহার করে জৈবিকভাবে চাষ করলে দেশের মাছ ও চিংড়ির গুণগতমান বৃদ্ধির সাথে সাথে বিদেশি গ্রাহকদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা ও মূল্য উভয়ই বাড়বে। বহির্বিশ্বে রপ্তানিকৃত বাংলাদেশি চিংড়ি অ্যান্টিবায়োটিক ও রাসায়নিকমুক্ত নিরাপদ পণ্য হিসেবে চিহ্নিত ও স্বীকৃত হলে এ শিল্পের ইমেজও উজ্জ্বল হবে। তাছাড়া বর্তমানে দেশের বাইরে থেকে আনা প্রোবায়োটিক ব্যবহার হওয়ায় উৎপাদন ব্যয় কিছুটা বেশি হচ্ছে। আমাদের দেশের গলদা চিংড়ির অন্ত্রে এবং এ দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে বিদ্যমান উপকারী অণুজীবগুলোর মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে প্রোবায়োটিক তৈরি করা গেলে উৎপাদন ব্যয় আরো কমবে। এজন্য আরো গবেষণা কার্যক্রম অব্যহত রাখা দরকার।

[১]প্রফেসর, ফিসারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।
[২]সহকারী অধ্যাপক, ফিসারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৩]সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার, মৎস্য অধিদপ্তর ও পিএইচডি ফেলো, ফিসারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইএমএস : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চিংড়ি সম্পদের সাম্প্রতিক বিপর্যয়

EMS : Recent Threat for South-East Asian Shrimp

অমিতোষ সেন

Abstract

Early Mortality Syndrome (EMS) or more technically known as `a cute hepato- pancreatic necrosis disease (AHPND)' a recent threat for south asian tarming both in vannameai and monodon. The disease was first seen in China in 2009, before it spreads to vietnam in 2010. Malaysia in 2011 and Thailand in 2012. In 2013, EMS was reported for the first time outside asia. The EMS disease typically affects shrimp post larvae within 20-30 day after stocking and trequeantly causes up to 100% mortality. Main causative agent suspected is bacteria in the Hepato-Pancreas to damage the organ. All control measures failed, only bio-security protocols were little-bit hopeful. Though till-date Bangladesh is not experienced EMS, since the neighbouring countries are affected. Precautionery measures should be taken from right now. So farmers are advised for good pond preparation, regular water quality check, maintain stocking density, introduce strong aeration, imply good feeding, bottom management and follow over-all bio-security protocols, etc. to get relief.

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশের চিংড়ি সম্পদ সম্প্রতি ভাইরাস অপেক্ষা কয়েকগুণ ভয়াবহ EMS (Early Mortality Syndrome) নামক রোগে বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এ রোগ Acute Hepato-Pancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS) নামেও পরিচিত। এ অঞ্চলের দেশগুলোতে ভেনামি এবং মনোডন উভয় প্রজাতির চিংড়িতে এ রোগের প্রকোপ দৃশ্যমান। চিংড়ি উৎপাদনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও এর আন্তর্জাতিক বাজার, স্থানীয় কর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদির ওপরেও EMS এর বিরূপ প্রভাব লক্ষণীয়। ২০০৯ সালে দেশে, প্রথম EMS এর অস্তিত্ব ধরা পড়ে এবং তা দ্রুত পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। ২০১১ সালের মধ্যে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে এ রোগ দেখা দেয়। থাইল্যান্ডে সম্প্রতি এ রোগে চিংড়ির উৎপাদন প্রায় ৫০% কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ভারতের চিংড়ি খামারেও সম্প্রতি EMS শনাক্ত হয়েছে। তবে বাংলাদেশে এখনো এ রোগের অস্তিত্ব ধরা পড়েনি।

রোগের বহিঃপ্রকাশ
(Outbreak of disease)

সকল বয়স ও আকারের চিংড়ি EMS-এ আক্রান্ত হওয়ার নজির রয়েছে। তবে মূলত খামারে পিএল মজুদের ১৫-২০ দিনের মধ্যে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ১.৫-২ গ্রাম ওজনের চিংড়ির মড়ক শুরু হতে দেখা যায়। আক্রান্ত পুকুরের চিংড়ির খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, চিংড়ি দুর্বল হয়ে পুকুরের কিনারায় বা তলায় বসে যায় এবং ধীরে ধীরে মারা যেতে থাকে। রোগের উল্লেখযোগ্য কোনো বাহ্যিক লক্ষণ দৃশ্যমান হয় না। কিছু মৃত চিংড়ির ফুলকা কালো হয়ে যেতে দেখা যায়। প্রথম সংক্রমণের কয়েক দিনের মধ্যে পার্শ্ববর্তী পুকুরে এবং ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে সারা খামারে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত পুকুরে মৃত্যুহার প্রায় ৭০-১০০%। সংক্রমণের ধরন অনেকটা ভাইরাসের অনুরূপ হলেও আক্রান্ত চিংড়িতে কোনো পরিচিত ভাইরাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়নি। EMS-এ মৃত চিংড়ির সংস্পর্শে এলেই এ রোগ দ্রুত ছড়াতে দেখা যায়। সারা বছর EMS-এর প্রকোপ দেখা যায়। তবে এপ্রিল-জুলাই মাসে এর তীব্রতা বেশি থাকে। নিবিড় বা আধানিবিড় মনোডন ও ভেনামি খামারে এ রোগের সংক্রমণ বেশি দেখা যায়। অধিক লবণাক্ততা সম্পন্ন (২৫-৩৫%) খামারে এবং শুষ্ক মৌসুমে বেশি তাপমাত্রার সময়ে এর প্রকোপ বেশি হতে দেখা যায়। ছোট আকারের চিংড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিধায় একই উৎপাদন চক্র শেষ করতে খামারে অনেকবার পিএল মজুদ করতে হয় এবং এর ফলে উৎপাদিত চিংড়ির ব্যাপক আকৃতি-বৈষম্য ও স্বজাতিভক্ষণ ঘটতে দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ
(Symptoms)

বাহ্যিকভাবে এ রোগের তেমন বিশেষ কোনো লক্ষণ দৃশ্যমান নয়। তবে মৃত চিংড়ির হেপাটোপ্যানক্রিয়াসের বর্ণ ফ্যাকাসে থেকে সাদা হয়ে যায় এবং অঙ্গটি সংকুচিত হয়ে ৫০% পর্যন্ত ছোট হয়ে যায়। সংক্রমণ আরো ছড়িয়ে গেলে এ অঙ্গটিতে মেলানিন সঞ্চিত হওয়ার ফলে সাদা-কালো দাগ পড়ে এবং ক্রমে কালো হয়ে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে হ্যাপাটোপ্যানক্রিয়াসের আকার ও বর্ণ নষ্ট হতে থাকে, আকার কিছুটা বড় হয়ে ফ্যাকাসে এবং চুপসে যেতে থাকে এবং এক সময় এ অঙ্গটি নষ্ট হয়ে চিংড়ি মারা যায়।

আক্রান্ত চিংড়ির শরীরে রোগজীবাণুর উপস্থিতি
(Pathogens in infected shrimp)

EMS আক্রান্ত মৃত চিংড়ি পরীক্ষা করে হেপাটোপ্যানক্রিয়াসে ভিবব্রিও ভ্যালনিফিকাস, ভিবব্রিও এনজিওলাইটিকাস, ফ্লুভিয়ালিস এবং ভিবব্রিও প্যারাহিমোলাইটিকাস *(Vibrio parahaemolticus)*-এর কলোনি পাওয়া গেছে। আক্রান্ত চিংড়ির হেপাটোপ্যানক্রিয়াসে মাইক্রোসপোরিডিয়াও বংশবৃদ্ধি করতে দেখা যায়। তবে আক্রান্ত ও অনাক্রান্ত পুকুরের পানিতে ব্যাকটেরিয়ার ব্যাপকতায় তেমন পার্থক্য দেখা যায়নি। এদের মধ্যে ভিবরিও প্যারাহিমোলাইটিকাস-এর গ্রাম নেগেটিভ একটি স্ট্রেইনকে EMS-এর জন্য প্রধানত দায়ি মনে করা হয়। এরা পানির লবণাক্ততা, তাপমাত্রা ও পিএইচে-এর ব্যাপক পরিবর্তন সহ্য করতে পারে, মাদার চিংড়ি বা পিএল-এর শরীরে, সামুদ্রিক প্লাংকটনে এমনকি সমুদ্রের স্রোতেও এরা বৃদ্ধি পেতে পারে। এ কারণে এরা দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং এদের প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। EMS আক্রান্ত চিংড়িতে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের জন্য 'স্বজাতিভক্ষণ' একটি অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

রান্না এবং হিমায়িতকরণে এসব জীবাণু টিকতে পারে না। তাই EMS আক্রান্ত রান্না করা চিংড়ি আহারে মানবদেহের কোনো প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তাছাড়া চিংড়ি হিমায়িতকরণের আকারে পৌছার অনেক আগেই EMS-এর কারণে এর মৃত্যু ঘটে বিধায় হিমায়িত চিংড়িতে এসব ব্যাকটেরিয়ার তেমন আশঙ্কা থাকে না।

পানির গুণাগুণের ভূমিকা
(Influence of water quality)

পুকুরের পানির বিভিন্ন গুণাগুণের পার্থক্য EMS রোগ ছড়ানোর জন্য দায়ি হতে পারে। এর মধ্যে পিএইচ-কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। পানিতে দায়ি ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি সত্ত্বেও যেসব পুকুরের পানির গুণাগুণ উপযোগী ছিল সেসব পুকুরে চিংড়ি বেশি আক্রান্ত হতে দেখা গেছে। ৫/৭ বছর বা এর বেশি সময় ধরে চিংড়ি চাষ হচ্ছে এমন এলাকায় এবং সমুদ্রের কাছাকাছি বেশি লবণাক্ততা সম্পন্ন পানি ব্যবহার করা হয় (২৫-৩৫ %) এমন সব এলাকায় এ রোগের প্রকোপ বেশি হতে দেখা যায়। তথাপি বাস্তবতার বিবেচনায় পানির গুণাগুণের অসামঞ্জস্যতাকে EMS-এর বিশেষ কারণ হিসেবে মনে করা যায় না। কারণ বিভিন্ন মানের পিএল মজুদ, পিএল-এর মজুদ ঘনত্ব হ্রাস, চাষের পানিকে ক্লোরিন দ্বারা শোধন, পানি পরিবর্তন পরিহার ইত্যাদি সত্ত্বেও পরপর পরিচালিত উৎপাদন চক্রে EMS-এর সংক্রমণ ঘটতে দেখা গেছে।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ
(Treatment & Prevention)

দায়ি বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া চিংড়ির পাকস্থলীতে বায়োফিল্ম তৈরি করে আশ্রয় নেয় বিধায় EMS আক্রান্ত খামারে কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাই কাজে আসে না এবং এদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকর হয়ে পড়ে। তবে বিভিন্ন দেশে ভাল মানের পিএল মজুদ, ভাল খামার প্রস্তুতি, ভাল খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও জীব-নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদির ফলে EMS-এর সংক্রমণ কম হতে দেখা গেছে। EMS-এর বিস্তার প্রতিরোধে সম্প্রতি ভারতের Marine Products Export Development Authority (MPEDA) স্থানীয় চিংড়ি হ্যাচারি ও খামারের জন্য ৮টি পদক্ষেপ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে, যা অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশেও বিবেচনা করা যেতে পারে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে -

- হ্যাচারিতে মাদার চিংড়ি, নপলি, পিএল, প্রোবায়োটিক, জীবিত ও সম্পূরক খাদ্য এবং খাদ্যের উপাদান ইত্যাদি নির্ধারিত প্রোটোকল অনুযায়ী পরিদর্শন ও পরীক্ষা করতে হবে।
- খামার এবং ডিপোতে নির্ধারিত প্রোটোকল অনুযায়ী চিংড়ি পরিদর্শন ও পরীক্ষা করতে হবে।
- চিংড়ি ক্রয়, বিক্রয়, বিপণন এবং খামার/হ্যাচারি/ডিপোতে পরিবহন সংক্রান্ত সকল তথ্য ও নথিপত্র পরিদর্শন করতে হবে।
- খামার/হ্যাচারি/ডিপোতে কোনো প্রকার আপত্তিজনক চিংড়ি পাওয়া গেলে তা সাথে সাথে বিনষ্ট করতে হবে।
- হ্যাচারি পরিচালনার জন্য অননুমোদিত সরবরাহকারীর নিকট থেকে মাদার চিংড়ি সংগ্রহ করা যাবে না।
- হ্যাচারি ও খামারের পানি জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে।
- চিংড়ি শিল্পের সকল স্টেকহোল্ডারকে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং মাঝে মাঝে ক্রপ-হলিডে বা শাট-ডাউন পালন করতে হবে।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সময়ে সময়ে পরিদর্শন করতে হবে।

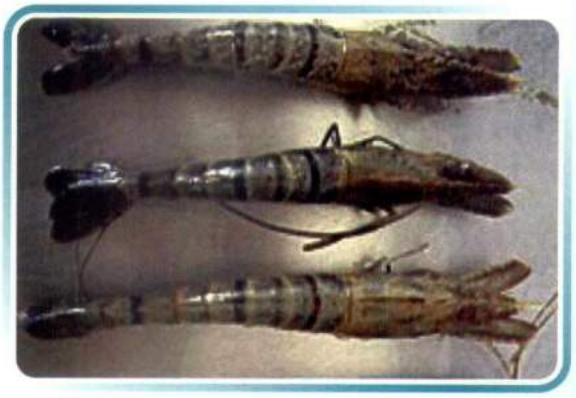

চিত্র: EMS আক্রান্ত মনোডন

চাষির করণীয় (Farmers to do)

যেহেতু EMS-এর প্রকৃত কারণ এখনো অজ্ঞাত। তাই এর প্রতিরোধে কিছু সাধারণ পরামর্শ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। যেমন পিএল মজুদের সময় এর শরীরে সকল প্রকার ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া ও ফাঙ্গাস-এর অনুপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। পিএল ও খামারের পানির গুরুত্বপূর্ণ গুণাগুণে সমতা রাখতে হবে এবং খামারে পিএল মজুদের সময় ভালভাবে খাপ-খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অত্যধিক বৃষ্টি, বাতাস, ঠাণ্ডা বা গরম আবহাওয়ায় পিএল মজুদ না করা উত্তম। পিএল মজুদের অন্তত ১০ ঘণ্টা আগে থেকে খামারে অ্যারেটার চালানো এবং মজুদের সময় খামারের তলদেশ বেশি ঘাটাঘাটি পরিহার করতে হবে। ২/৩ দিন পর পর পুকুরের পানিতে ভিব্রিও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বায়ুশূন্য পরিস্থিতিতে ভিব্রিও বেশি বিস্তার লাভ করে বিধায় পুকুরের তলার পচা কাদা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পিএল নির্বাচন ও মজুদকালীন সাবধানতা, ভাল খাদ্য ব্যবস্থাপনা, পূর্ববর্তী ফসলের তুলনায় ৮০% পিএল মজুদ, চরম বর্ষা বা শীত পরিহার ইত্যাদির ফলে EMS-এর প্রকোপ কম হতে দেখা গেছে।

উপসংহার (Conclusion)

EMS সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চিংড়ি চাষে অপ্রতিরোধ্য নতুন বিপর্যয় হিসেবে দেখা দিচ্ছে। এখনই সাবধান না হলে বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদও এ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞ চিংড়ি বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সাম্প্রতিক সময়ে সারাবিশ্বে চিংড়ি সম্পদে ভাইরাসজনিত বিপর্যয় অধিক ক্ষতিকর হলেও এক সময় ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস অপেক্ষা বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠবে। চিংড়ি চাষ পদ্ধতির দ্রুত নিবিড়করণের ফলে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সাফল্যের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত EMS-এর মতো অনেক অপ্রত্যাশিত এবং অপ্রতিরোধ্য সমস্যারও সৃষ্টি হচ্ছে। এসব সমস্যা নিয়ন্ত্রণে এখনই পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। তাই চিংড়ির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে এর মৎস্য উপযুক্ত সহায়ক পরিবেশ রক্ষা করে এ সম্পদের বিকাশে সকলকে এখনই যত্নবান হতে হবে।

সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

উপকূলে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রাপ্যতা ও মুক্তা চাষের সম্ভাবনা

Availability of Pearl Producing Bivalves in the Coast and Pearl Culture Potentialities

ড. মোঃ ইনামুল হক,[১] মোঃ আতাউর রহমান[২] ও মোঃ হারুনর রশিদ[৩]

Abstract

Bivalves are known to produce pearls. On the other hand, pearl oysters are mainly found in salt water and grow attached to rocks, gravel, tree roots or any hard object in the intertidal zone. Eight species of genus *Pinctada* belongs to pearl oyster in coastal region of the country. In Bangladesh, still naturally collected freshwater mussels are the main source of pearl culture. Introducing marine species for pearl culture in Bangladesh is new concept. So a study on availability of pearl producing marine bivalves in Bangladesh coast and their culture potentialities has been investigated to identify the appropriate species for pearl culture. Collected bivalve (*Placuna placenta*) was kept in fiber glass aquariums for a period of 10 months. A total 102 pearl found during the rearing period from *P. placenta*. From the above survey work it was found that, most of the pearl bearing oysters were found in Ghotivanga Khal, Moheshkhali specially *P. placenta* which carried pearl inside their body found during the aquarium culture and some other species including *Perna viridis* had economically importance.

এদেশে প্রাকৃতিক উৎস হতে মুক্তা আহরণের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। মুক্তা ঝিনুকের দেহের ভেতরে জৈবিক প্রক্রিয়ায় তৈরি এক ধরনের রত্ন। কোন বাইরের বস্তু ঝিনুকের দেহের ভেতরে ঢুকে নরম অংশে আটকে গেলে এক ধরনের আঘাতের সৃষ্টি হয়। ঝিনুক এ আঘাতের অনুভূতি থেকে উপশম পেতে বাইরে থেকে ঢোকা বস্তুটির চারদিকে লালা নিঃসরণ করতে থাকে। ক্রমাগত নিঃসৃত এ লালা বাইরের বস্তুটির চারদিকে জমাট বেঁধে ক্রমান্বয়ে মুক্তায় পরিণত হয়। মুক্তা গোলাকার অথবা ডিম্বাকৃতি এবং উজ্জ্বল ও বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে।

মুক্তা একটি বাণিজ্যিক পণ্য। এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে মুক্তাচাষ করছে। এক্ষেত্রে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চীন ও জাপান প্রধান মুক্তা উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে স্বাদুপানির ঝিনুকে মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। এদেশে স্বাদু পানির ঝিনুকের ৬টি প্রজাতি এবং সামুদ্রিক লোনা পানির ঝিনুকের ১৪২টি প্রজাতি রয়েছে। উপকূলবর্তী জেলা কক্সবাজারের মহেশখালী, সোনাদিয়া, সেন্টমার্টিন ও শাহপরীর দ্বীপ এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে ঝিনুকে মুক্তা পাওয়া যায়। আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে ঝিনুকের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন এবং মুক্তা উৎপাদনে ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সক্ষম। এসব এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির মুক্তা বহনকারী ঝিনুক রয়েছে। এদের মধ্যে *Placuna placenta* গণের ঝিনুক চাষে মুক্তা উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রচুর। তাছাড়া লোনাপানির *Pinctada* গণের ৮ প্রজাতির মুক্তা বহনকারী ঝিনুক রয়েছে। তবে পরিবেশ দূষণ, আবাসস্থলের পরিবর্তন, নির্বিচারে ঝিনুক আহরণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে বর্তমানে প্রাকৃতিক উৎস থেকে ঝিনুক ও মুক্তার প্রাপ্যতা অনেকাংশে কমে গেছে।

উপকূলে মুক্তা বহনকারী ঝিনুকের প্রাপ্যতা
(Availability of pearl producing Bivalves in the coast)

পার্লওয়েস্টার হল বাইভালব বা দ্বিখোলসমুখী ঝিনুক। এরা *Pinctada* গণের Pterridae পরিবারভুক্ত ঝিনুক। বিশ্বের প্রায় সকল স্বল্প উষ্ণপ্রধান ও উষ্ণপ্রধান সামুদ্রিক জলাশয় পার্লওয়েস্টারের আবাসস্থল। এরা সমুদ্রের স্বল্প গভীর হতে ৮০ মি. গভীর এলাকায় বিচরণ করে। প্রায় ৩০টি সামুদ্রিক ঝিনুক প্রজাতির মধ্যে ৩টি সামুদ্রিক প্রজাতির ঝিনুক বাণিজ্যিক মুক্তা উৎপাদনে ভূমিকা পালন করে ।

এদেশের উপকূলীয় এলাকায় মুক্তা বহনকারী ঝিনুকের আবাসস্থল কক্সবাজার, মহেশখালী, সোনাদিয়া, মাতারবাড়ি, কুতুবদিয়া, উখিয়া, টেকনাফ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, শাহপরীর দ্বীপসহ প্রায় সমগ্র সমুদ্র-উপকূল। যুগ যুগ ধরে উপকূলীয় জনসাধারণ এসব এলাকা থেকে শামুক-ঝিনুক সংগ্রহ করে। জোয়ারের সময় শামুক-ঝিনুকগুলো উপকূলে ভেসে আসে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র সামুদ্রিক ঝিনুকে মুক্তার প্রাপ্যতা ও মুক্তা চাষ নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ইতোপূর্বে ১৯৯৯ সালে স্বাদুপানিতে পরীক্ষামূলকভাবে মুক্তাচাষ শুরু হলেও লোনাপানিতে মুক্তা চাষের গবেষণা কার্যক্রম এটাই প্রথম। গবেষণা জরিপে ইতোমধ্যে কক্সবাজার সদর উপজেলার বাকখালী নদী, মহেশখালী চ্যানেল সংলগ্ন নুনিয়ারছড়া, মহেশখালীর ঘটিভাঙ্গা ও সোনাদিয়া এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা উক্ত এলাকা থেকে ৫ প্রজাতির ঝিনুকের সন্ধান পেয়েছেন। যার মধ্যে *Placuna placenta* প্রজাতির ঝিনুকে (করতাল) প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মুক্তার সন্ধান পাওয়া গেছে। পানির ১ হতে ২ মিটার গভীরতায় বালুকাময় তলদেশে ও ১৮ হতে ২২ পিপিটি লবণাক্ততায় একটি ঝিনুক বা করতালে গড়ে ৫টি হতে সর্বোচ্চ ১২টি মুক্তা পাওয়া গেছে।

গ্রুপ	পরিবার	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	প্রাপ্যতা
Pterioida	Anomiidae	করতাল	Windowpane shell	*Placuna placenta*	সোনাদিয়া ও মহেশখালী
Pterioida	Pteriidae	কস্তুরা	Pearl oyster	*Pinctada* sp.	ঘটিভাঙ্গা
Mytiloida	Mytilidae	কালো ঝিনুক	Green mussel	*Perna viridis*	নুনিয়ারছড়া
Veneroida	Veneridae	চিলেন	Poker–chip clam	*Meretrix meretrix*	নুনিয়ারছড়া ও ঘটিভাঙ্গা

প্রাকৃতিক মুক্তা উৎপাদন প্রক্রিয়া
(Natural pearl production process)

নিউক্লিয়াস-বিহীন মুক্তা

যখন ঝিনুকের বহিঃত্বকে (খোলসের সাথে ম্যান্টলের লেগে থাকা অংশ) কোনরূপ ক্ষতের সৃষ্টি হয়, ফুলে ওঠে কিংবা হঠাৎ আঘাত পায়, তখন বহিঃত্বকের কিছু কোষ ম্যান্টলের মধ্যে ঢুকে যায়। বহিঃত্বকের এই কোষগুলো বিভাজন এবং পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি পেয়ে মুক্তার থলি তৈরি করে। মুক্তার থলি অনবরত আঠালো পদার্থ নিঃসরণ করতে থাকে যাকে নেকার বলা হয়। নেকার জমে মুক্তার সৃষ্টি হয়।

নিউক্লিয়াস মুক্তা

কোন বহিঃস্থ বা বাইরের বস্তু, যেমন- বালিকণা, পাথরকণা বা পরজীবী হঠাৎ করে যখন ঝিনুকের ম্যান্টলে ঢুকে যায়, তখন তার সাথে বহিঃত্বকের টুকরাও ঢুকে পড়ে। ঐ টুকরা বৃদ্ধি পেয়ে একটি থলি তৈরি করে এবং বহিঃস্থ বস্তুকে ঘিরে ফেলে। এই থলি অবিরাম আঠালো রস বা নেকার নিঃসরণ করে যা বহিঃস্থ বস্তুর চারপাশে জমা হয়। ফলে ক্রমান্বয়ে নিউক্লিয়াস মুক্তা তৈরি হয়।

চাষকৃত মুক্তা উৎপাদন প্রক্রিয়া
(Cultured pearl production process)

মুক্তা তৈরির প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণে ঝিনুকের দেহাভ্যন্তরের ম্যান্টল টিস্যুতে একটি বহিঃস্থ বস্তু (ম্যান্টল টিস্যু বা নিউক্লিয়াস) ঢুকিয়ে মুক্তা তৈরি করা হয়। একেই চাষকৃত মুক্তা বা cultured pearl বলা হয়।

নিউক্লিয়াস-বিহীন বা ম্যান্টল টিস্যু মুক্তা তৈরি

এতে একটি ঝিনুকের ম্যান্টল থেকে এক টুকরা টিস্যু সংগ্রহ করে অন্য একটি ঝিনুকের ম্যান্টলে সুক্ষ্মভাবে দ্রুত ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এভাবে প্রতিস্থাপিত ম্যান্টল টিস্যুতে তখন কোষ বিভাজন এবং পুনঃবিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই কোষগুলো পরে মুক্তার থলি তৈরি করে এবং স্তরে স্তরে নেকার নিঃসৃত করে মুক্তা তৈরি করে।

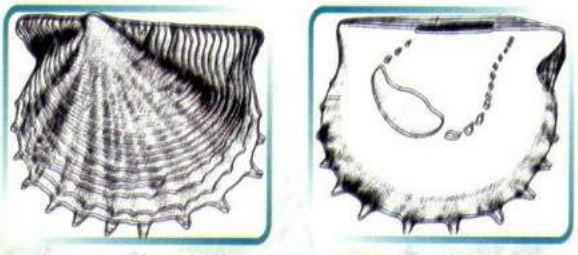

চিত্র: পার্লওয়েস্টারে ম্যান্টল টিস্যু প্রবেশ

নিউক্লিয়াস মুক্তা তৈরি

এই প্রক্রিয়ায় ঝিনুকের দেহে ম্যান্টল টিস্যুসহ একটি নিউক্লিয়াস ঢুকিয়ে দেয়া হয়। ম্যান্টল টিস্যু বৃদ্ধি পেয়ে নিউক্লিয়াসের চারপাশে একটি মুক্তা থলি তৈরি করে। মুক্তা থলি নেকার নিঃসরণ করে নিউক্লিয়াসটিকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে। এভাবেই নিউক্লিয়াস মুক্তা তৈরি হয়।

চিত্র: লোনাপানিতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের চাষ

চিত্র: উৎপাদিত মুক্তা

চিত্র: সামুদ্রিক ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন

লোনাপানিতে মুক্তাচাষের সম্ভাব্যতা
(Pearl culture potentialities in salt water)

কক্সবাজারারস্থ স্থানীয় উপকূল থেকে ঝিনুক বা করতাল *(Placuna placenta)* সংগ্রহের পর সেগুলোকে সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রে ২ টন ধারণ ক্ষমতা ফাইবার গ্লাস ট্যাংকে লোনাপানিতে বায়ু সঞ্চালনে লালন করা হয়। ট্যাংকে পানির তাপমাত্রা ২১.৬-২১.২°সে. ও লবণাক্ততা ২০-২৫ পিপিটি এবং পিএইচ ৮ রাখা হয়। প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার নমুনায়নের মাধ্যমে লালনকৃত ঝিনুক থেকে মুক্তা পাওয়ার সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণ করা হয়। ফাইবার গ্লাস ট্যাংকে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের বেঁচে থাকার হার ৮৮% এবং মুক্তা আহরণের হার ৭০%। প্রায় ১০ মাসের গবেষণা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, আবদ্ধ পানিতে লালন করে ঝিনুক বা করতাল হতে মুক্তা আহরণ করা সম্ভব, যা উপকূলীয় এলাকায় মুক্তা চাষের এক নতুন দ্বার উন্মোচন করবে বলে ধারণা করা যায়।

[১]মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সা. দা), বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
[২]বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
[৩]প্রকল্প পরিচালক, মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

ভাসমান খাঁচায় সুস্বাদু গুলশা মাছের চাষ
Gulsha Calture in Floating Cage

ড. এএইচএম কোহিনুর,[১] মোঃ মশিউর রহমান[২] ও ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ[৩]

Abstract

Among the small indigenous fish species, gulsha *(Mystus cavasius)* is very popular and high valued fish in Bangladesh. It is considered to be highly nourishing, palatable and tasty and well preferred because of its less spine, less fat and high digestibility and have a great demand fetching high price in the market. Many farmers of Mymensingh region are practicing mono and polyculture of gulsha in their ponds. Sudden dissolved oxygen depletion is the main threat of gulsha culture in pond ecology. Recently, BFRI developed a cage culture technology of gulsha, which is risk free and environment friendly. In this technology, gulsha can be cultured at the stocking density of 500/m3 with 30% protein enriched supplementary feed. After six months rearing, a production of 9-10 kg/m3 could be achieved. Through this culture technology, Tk.1200-1300/m3 could be obtained as net benefit from cage culture.

মৎস্য উৎপাদনের বিবেচনায় বাংলাদেশের জলজ সম্পদ একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উৎস হলেও এখনও পর্যন্ত এই জলজ সম্পদকে যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সুষম উৎপাদনের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভবপর হয়নি। উন্মুক্ত জলাশয় প্রধানত ব্যবস্থাপনা নির্ভর সম্পদ হওয়ায় বদ্ধ জলাশয়ের চেয়ে এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত চাষাবাদের বিষয়টিকে পূর্বে সেরূপ গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ইতোমধ্যে দেশের বদ্ধ জলাশয়সমূহ থেকে চাষাবাদের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও তা দ্রুত বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর মৎস্য চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত নয়। এরূপ অবস্থায় সম্ভবনাময় আরও ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে ব্যবহারের আওতায় সহনশীল উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত না করা হলে চাহিদা ও সরবরাহের এই ব্যবধান দিন দিন বেড়েই চলবে। মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি তাই উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্য উৎপাদনে গুরুত্বারোপ করা হলে খাদ্য সরবরাহ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। এরূপ বিবেচনায় নদীতে খাঁচায় মাছ চাষ একটি উৎসাহজনক প্রযুক্তি। অতি সনাতন কাল থেকে বাঁশ বা জালের তৈরি খাঁচায় মাছ লালন পালনের ইতিহাস থাকলেও সে সময়ে এসবের লাভ লোকসানের হিসাব এতটা বিবেচ্য ছিল না। তবে চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্র অঞ্চল প্রধানত চীন সাগরে ও ভারত মহাসাগরে প্রায় ৩ যুগ পূর্ব থেকেই বাণিজ্যিক বিবেচনায় খাঁচায় মাছ চাষের প্রচলন শুরু হয়েছিল। বিগত কয়েক বছর যাবৎ আমাদের দেশেও বিভিন্ন নদ নদীতে খাঁচায় তেলাপিয়া চাষ হচ্ছে। কিন্তু দেশীয় প্রজাতির মাছ যেমনঃ পাবদা, গুলশা, মাগুর, শিং ইত্যাদি খাঁচায় চাষের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করে। বিগত কয়েক বছর ধারাবাহিক গবেষণার পর খাঁচায় বিলুপ্তপ্রায় গুলশা মাছ চাষের লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছে। সহনশীল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভাসমান খাঁচায় সুস্বাদু উচ্চমূল্যের বিলুপ্তপ্রায় গুলশা মাছ চাষ করা হলে তা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টির অভাব পূরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

ভাসমান খাঁচায় গুলশা চাষের সুবিধা

- খাঁচায় অধিক ঘনত্বে গুলশা মাছ চাষ করে আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব
- গুলশা মাছ অক্সিজেন সংবেদনশীল হওয়ায় প্রবহমান পানিতে এ মাছ সহজেই চাষ করা যায়
- নদীর পানিতে তাপমাত্রার তারতম্য খুব কম হয় বিধায় এ মাছের রোগ বালাই অপেক্ষাকৃত কম হয়
- বাজারে এ মাছের চাহিদা বেশি হওয়ার কারণে বাজার মূল্য অন্য মাছের তুলনায় অনেক বেশি

ভাসমান খাঁচা তৈরির উপকরণ, প্রস্তুত ও স্থাপন পদ্ধতি

- খাঁচা তৈরির জন্য ১.০ সে.মি. ফাঁসের নটলেস পলিইথিলিন জাল ও খাঁচার উপরিভাগ ঢাকার জন্য ৭.০-৭.৫ সে.মি. ফাঁসের কড়ের জাল ব্যবহার করা উত্তম
- সাধারণত ১৮ (৩X৩X২) ঘনমিটার আকারের জালের খাঁচা গুলশা চাষের জন্য প্রস্তুত করা যেতে পারে
- অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের জালের খাঁচায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা সহজতর হয়
- খাঁচার তলদেশ এবং চারপাশে খাঁচা তৈরির জাল দিয়ে সেলাই করে আটকে দিতে হবে। অতঃপর উপরিতলে ঢাকনার জাল সেলাই করে দিতে হবে
- নদীতে খাঁচা স্থাপনের জন্য প্রথমে খাঁচার মাপের বাঁশের তৈরি ফ্রেম প্লাস্টিকের ড্রামের সাথে বেঁধে পানিতে স্থাপন করতে হবে
- খাঁচার চার কোণায় প্লাস্টিক রশির লুপ বেঁধে ফ্রেমের সাথে জাল পানিতে ঝুলিয়ে স্থাপন করতে হবে
- নদীর নির্দিষ্ট স্থানে খাঁচা সারিবদ্ধভাবে বিন্যাস করার পর চতুর্দিকে বাঁশের বেষ্টনী তৈরি করতে হবে
- খাঁচাগুলিকে দুইপাশে মোটা প্লাস্টিক রশি দ্বারা বেঁধে জলাশয়ের পাড় থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে নোঙ্গরের সাহায্যে স্থাপন করতে হবে

স্থান নির্বাচন

- ভাসমান খাঁচায় গুলশা মাছ চাষের জন্য কম স্রোতের ছোট বা বড় নদীর অংশবিশেষকে নির্বাচন করা যেতে পারে
- সারা বছর কমপক্ষে ৩-৪ মিটার পানির গভীরতা, দূষণমুক্ত পরিবেশ, স্বচ্ছ পানি, মাছ বাজারজাত করার সুবিধা এবং চুরি-ডাকাতির প্রবণতা নেই বললেই চলে এমন স্থানে খাঁচা স্থাপন করতে হবে

চিত্র: খাঁচায় গুলশা মাছ চাষ

খাঁচায় পোনা মজুদকরণ

- খাঁচায় পোনা মজুদকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সুস্থ সবল পোনা ও সঠিক মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ
- পোনা মজুদের ক্ষেত্রে পোনার ওজন গড়ে ২.৫-৩.০ গ্রাম হলে ভাল হয়
- খাঁচায় প্রতি ঘনমিটারে গড়ে ৫০০ টি গুলশা মাছের সুস্থ সবল পোনা ৫-৬ মাস চাষ করে ভাল ফলন পাওয়া যায়
- মজুদ খাচায় পোনা ছাড়ার পূর্বে ফিল্টার নেটের নার্সারি হাপায় পোনাগুলোকে অন্তত ১-১.৫ মাস লালন করে নিলে খাঁচায় পোনার মজুদের পরে মৃত্যুর হার কম হয়
- খাঁচায় পোনা মজুদের পূর্বের দিন নার্সারি হাপায় পোনাকে খাবার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে এবং মজুদকরণের ৬-৭ ঘন্টা পর অল্প অল্প করে সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করতে হবে

খাদ্য প্রয়োগ ও পরিচর্যা

- উন্মুক্ত জলাশয়ে খাঁচায় অধিক মজুদ ঘনত্বে মাছ চাষ করা হয় বিধায় মাছের বৃদ্ধিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের ভুমিকা নেই বললেই চলে। এ কারণে বাইরে থেকে সরবরাহকৃত সম্পূরক খাদ্যের ওপর মাছের বৃদ্ধি নির্ভরশীল। তাই লাভজনকভাবে খাঁচায় মাছ চাষের খাদ্য নির্বাচন ও প্রয়োগ অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয়
- ভাসমান খাঁচায় গুলশা মাছ চাষের ক্ষেত্রে সম্পূরক খাদ্যে কমপক্ষে ৩০% প্রোটিন থাকা আবশ্যক
- নার্সারি অবস্থায় গুলশা মাছের পোনার দেহ ওজনের ১৫% হিসেবে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে
- চাষকালীন সময়ে ১ম দুই মাস ৮-১০%, পরবর্তী ২ মাস ৭-৮% এবং শেষ দুই মাস ৫% হিসেবে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে
- অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে ভাসমান পিলেট জাতীয় খাদ্যই বেশি উপযোগী। তবে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পিলেট খাদ্যও খাঁচায় ব্যবহার করা যায়।
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পিলেট খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে খাঁচার ভেতর ফিডিং ট্রে ব্যবহার করতে হবে
- ফিডিং ট্রে ব্যবহার করার পরও সরবরাহকৃত খাদ্যের প্রায় শতকরা ৩০-৪০ ভাগ অপচয় হয় যা পানিতে পঁচে পানি দূষণ ও মাছের মড়কসহ আর্থিক ক্ষতি সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- ভাসমান পিলেট জাতীয় খাদ্য দৈনিক ২/৩ বার যতক্ষণ খাঁচার মাছ খাদ্য গ্রহণে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- মাসে একবার খাঁচায় মাছ নমুনায়ন করে সরবরাহকৃত সম্পূরক খাদ্যের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে
- উন্মুক্ত জলাশয়ে অধিক ঘনত্বে খাঁচায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে জলাশয়ের শেওলাসহ বিভিন্ন ধরণের কীটপতঙ্গ ও পরজীবী খাঁচার জালকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে গ্রহণ করে, যার ফলে জালের ফাঁস দিয়ে পানি প্রবাহ কমে যায়। ফলে খাঁচার মাছ বিভিন্ন প্রকার রোগসহ পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে
- খাঁচার তলদেশের অব্যবহৃত খাদ্য নিয়মিত পরিষ্কার করে খাঁচার পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে হবে
- স্রোতে ভেসে আসা জলজ উদ্ভিদ/আগাছা যেন খাঁচার বাইরে জমা হয়ে পানি প্রবাহ কমিয়ে না দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ

- ন্যূনতম খরচে ও পরিশ্রমে যেকোন সময় খাঁচার মাছ আহরণ করা যায়
- মাছ একত্রে আহরণ অপেক্ষা ৪-৫ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে ৬ মাস পর্যন্ত বেছে বড় মাছ আহরণ করলে অধিক লাভবান হওয়া যায়
- ভাসমান খাঁচায় গুলশা মাছ চাষ করে প্রতি ঘনমিটারে প্রায় ৯-১০ কেজি উৎপাদন পাওয়া সম্ভব
- যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল হলে দ্রুত তাজা মাছ বাজারে নিয়ে বিক্রয় করে অধিক মূল্য পাওয়া যায়

চিত্রঃ উৎপাদিত গুলশা মাছ

খাঁচায় গুলশা মাছ চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব

একটি ১৮ (৩x৩x২) ঘনমিটার আকারের ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষে ছয় মাসে উৎপাদিত গুলশা মাছের আয়-ব্যয়ের হিসাবঃ

আয়-ব্যয়ের খাত	টাকা
খাঁচা প্রতি ব্যয়	
খাঁচা তৈরির উপকরণ	৩,০০০.০০
অঙ্গুলি পোনা	১৩,৫০০.০০
ভাসমান খাদ্য	২৭,০০০.০০
অন্যান্য	২,০০০.০০
মোট	৪৫,৫০০.০০
খাঁচা প্রতি আয়	
গুলশা মাছ বিক্রয় হতে আয় ১৮০ কেজি X ৩৮০/- প্রতি কেজি	৬৮,৪০০.০০
মুনাফা : (আয়-ব্যয়)	২২,৯০০.০০

উপসংহার (Conclusion)

দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নদীতে খাঁচা স্থাপন করে বিলুপ্তপ্রায় গুলশা মাছ সহজে চাষ করা যায়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বেশকিছু নদীতে উৎসাহী মৎস্যচাষিরা খাঁচায় মাছ চাষ করে লাভবান হচ্ছেন। এর ধারাবাহিকতায় নদীতে বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির গুলশা মাছ খাঁচায় চাষ করে উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। ভাসমান খাঁচায় গুলশাসহ অন্যান্য দেশীয় মাছ চাষের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

[১]উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, স্বাদুপানি কেন্দ্র, বামগাই, ময়মনসিংহ
[২]বৈজ্ঞানিক কমকর্তা, স্বাদুপানি কেন্দ্র, বামগাই, ময়মনসিংহ
[৩]পরিচালক, বামগাই, ময়মনসিংহ

মৎস্য সেক্টরের দ্রুত বিকাশ : মৎস্যচাষ প্রকৌশলের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও কর্মপরিধি

(Development of Fast Growing Fisheries Sector : Importance and Role of Aquaculture Engineering)

মোঃ আলীমুজ্জামান চৌধুরী

Abstract

Aquaculture Engineering is a specialized multidisciplinary engineering activities related to aquaculture development and culture practices of aquatic animals. The field of Aquaculture Engineering consists of civil, structural, agricultural, water resources, environmental, hydrological, mechanical, electrical, chemical engineering disciplines. Above each discipline has its own specialists, but it is important for fish culturist or biologist to understand fish culture as well. So, the subject matter of Aquaculture Engineering addresses these problem by providing fish culturist or biologist with the necessary engineering background and engineers with the design requirements of aquaculture system. It is undoubtedly agreed that net income per unit of water area is very high in aquaculture practices than that of other agriculture practices. Also investment and operational costs are comparatively less in compared to other similar sector's investment. We have tremendous scope to expand our aquaculture command area by introducing suitable facilities in a sustainable manner for our greater interest. Aquaculture can be broadly summarized into two field of activities, namely Aquaculture Engineering i.e. planning, designing, development and maintenance acitivities and biology i.e. production and husbandry which are inter-dependent with each other. Given the present socio-economic and environmental conditions of Bangladesh, fisheries should not be considered only as a purely biological science. To strengthen fisheries activities, it is necessary to apply engineering principles in this biological field.

মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা এবং এর চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণসহ এ সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে যেসব অবকাঠামো ও সুবিধাদি নির্মাণের প্রয়োজন তা মৎস্যচাষ প্রকৌশলের আওতাভুক্ত। উপযুক্ত অবকাঠামো ও সুবিধাদি নির্মাণ না করা হলে যতই আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হোক না কেন আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যাবে না। মৎস্যচাষ প্রকৌশল বিদ্যা হলো প্রচলিত সকল প্রকৌশল বিদ্যার সংমিশ্রিত রূপ (multidisciplinery engineering activities), যা কোনো একক প্রকৌশল বিদ্যা নয়। সার্বিকভাবে মৎস্যচাষ প্রকৌশলের গুরুত্ব ও কর্মপরিধির প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলো হলো- মৎস্য খামার স্থাপনে নির্বাচিত জায়গার ভূমি জরিপ; আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ডিজাইন তৈরিসহ মাছের আবাসস্থল তথা পুকুর খনন ও অন্যান্য সকল সহযোগী অবকাঠামো নির্মাণের প্রাক্কলন প্রণয়ন এবং সম্ভাব্য নির্মাণ ব্যয় নিরূপণ; সকল অবকাঠামোর নির্মাণ সামগ্রীর পরিচিতি ও এর গুণাগুণ বিষয়ে ধারণা; ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা; পুকুর নির্মাণ কলা-কৌশল; পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ; মাছ চাষে পেন ও কেইজ নির্মাণ কৌশল; মাছ চাষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি; মৎস্য হ্যাচারির গুরুত্ব ও স্থান নির্বাচন; অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনার অবকাঠামোসমূহ।

মৎস্য চাষ প্রকৌশলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
(Concept & Importance of Aquaculture Engineering)
মৎস্যচাষ প্রকৌশল

এক কথায় মৎস্যচাষ প্রকৌশল (Aquaculture Engineering) হলো মৎস্যচাষ উন্নয়নে প্রকৌশলগত বা অবকাঠামোগত সুবিধাদি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহ। এ প্রকৌশল বিদ্যা প্রধানত যান্ত্রিক প্রকৌশল (Mechanical Engineering), স্থাপত্য প্রকৌশল (Structural Engineering), পুরকৌশল (Civil Engineering), কৃষি প্রকৌশল (Agricultural Engineering), পানিসম্পদ প্রকৌশল (Water Resources Engineering), বৈদ্যুতিক প্রকৌশল (Electrical Engineering), রসায়ন প্রকৌশল (Chemical Engineering), পরিবেশ প্রকৌশল (Environmental Engineering) ইত্যাদি প্রকৌশল বিদ্যার সমন্বিত রূপ। এটা কোনো একক সিভিল প্রকৌশল, কৃষি প্রকৌশল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কেমিক্যাল ইত্যাদি প্রকৌশল বিষয়ক বিদ্যা নয়। যদিও উপরের প্রতিটি প্রকৌশল বিদ্যাগুলোর প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বা পৃথক নিজস্ব বিশেষত্ব (specialization) আছে কিন্তু একজন মৎস্যচাষ প্রযুক্তিবিদের যেমন সাধারণ প্রকৌশলগত অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন, তেমনি একজন মৎস্যচাষ প্রকৌশলীর মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা জরুরি।

মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনাকে লাভজনকভাবে উন্নত পর্যায়ে নেয়ার মাধ্যমে উৎপাদন স্তর (production level) বৃদ্ধি করতে হলে প্রাথমিকভাবে দরকার অবকাঠামো উন্নয়ন (facility development)। প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ সাপেক্ষে মৎস্যচাষের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করা হলেই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব।

উপরের ফ্লো-চার্টটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে মৎস্যচাষ কার্যক্রমকে মাঠ পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে দুটি প্রধান কর্মকাণ্ডে বিভক্ত করা যায়। যথা:

ক. মৎস্যচাষ প্রকৌশল বিষয়ক কর্মকাণ্ড

এর আওতার মধ্যে থাকবে প্রধানত জায়গা নির্বাচন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাচাই, পরিকল্পনা প্রণয়ন, লে-আউট ও নকশা প্রণয়ন, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন, মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং সার্বিক মেরামতসহ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ: এবং

খ. মৎস্যচাষ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকাণ্ড

এর আওতার মধ্যে থাকবে প্রধানত মৎস্য উৎপাদন কৌশল ও এর চাষ ব্যবস্থাপনা। উপর্যুক্ত দুটি কর্মকাণ্ড মৎস্য চাষ উৎপাদনে একটি অন্যটির সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত এবং সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ বাণিজ্যিকভাবে কোনো মৎস্য খামার স্থাপনে জায়গা নির্বাচন থেকে ডিজাইন তৈরি, খামার নির্মাণ, সহযোগী অবকাঠামো নির্মাণ, খামার পরিচালনা, উৎপাদিত মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই মৎস্য উৎপাদন কৌশল ও এর চাষ ব্যবস্থাপনার মতো মৎস্যচাষ প্রকৌশলের ভূমিকা অগ্রাধিকার পাবে।

নিম্নের মৎস্য চাষের নিবিড়করণ তথা পর্যায়ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির ফ্লো-চার্টের মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণ তথা মৎস্যচাষ প্রকৌশল এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়। মৎস্যচাষ প্রকৌশলের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণভাবে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার নিবিড়করণ এবং উৎপাদন লেভেল বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফলে মৎস্য চাষ নিবিড়করণের সাথে অবকাঠামো উন্নয়নের তথা প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সৃষ্টির একটা নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সনাতন (traditional) থেকে যত নিবিড়করণের (intensification) দিকে অগ্রসর হবে, প্রতি একক জলাশয় হতে উৎপাদন তত বেশি হবে। এখানে দেখা যায়, অবকাঠামো নির্মাণ (facility construction) এবং এর গুরুত্ব, যথাক্রমে মৎস্যচাষ ব্যাবস্থাপনার নিবিড়করণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির সমানুপাতিক (proporsional)। প্রতি একক জলাশয় হতে যত বেশি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা থাকবে, সেখানে অবকাঠামো নির্মাণ বা সুবিধাদি তৈরি তত বেশি প্রয়োজন হবে।

মৎস্যচাষ প্রকৌশলের কর্মপরিধি (Role of Aquaculture Engineering)

এক কথায় কর্মপরিধিকে আমরা কোনো নির্দিষ্ট কাজের বা বিষয়ের আওতা বা পরিসীমা বুঝে থাকি। আর এখানে মৎস্যচাষ প্রকৌশলের কর্মপরিধি বলতে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনায় প্রকৌশলগত কর্মকাণ্ডের পরিসীমাকে বুঝানো হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক এবং পরিবেশের বিবেচনায় মৎস্যবিজ্ঞানকে শুধুমাত্র চাষ প্রযুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সঠিক নয়। মৎস্যবিজ্ঞানকে উন্নয়নের জন্য তথা এ সেক্টর থেকে সহনশীল অবস্থায় অধিক মুনাফা পেতে হলে চাষ প্রযুক্তির সাথে মৎস্যচাষ প্রকৌশল বিদ্যাকে

মৎস্য খামার নিবিড়করণ (Intensification of a fish farm)

উৎপাদন (মে.টন/হেক্টর/বছর)

০ - ১	১ - ১০	১০ - ১৫	১৫ - ২০	২০ - ৩০
সনাতন পদ্ধতি	আধানিবিড় পদ্ধতি		নিবিড় পদ্ধতি	
• বড় জলাশয়। • কোনো ধরনের সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয় না। • কোনো ধরনের সার প্রয়োগ করা হয় না। • প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। • উৎপাদন কম।	• তুলনামূলকভাবে একটু ছোট জলাশয়। • সার প্রয়োগ করা হয়। • আংশিক সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। • প্রয়োজনে পানি সরবরাহ করা হয়। • পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয়। • উৎপাদন কিছু বেশি।	• পরিকল্পিত একটু ছোট জলাশয়। • সার প্রয়োগ করা হয়। • সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। • প্রয়োজনে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন করা হয়। • প্রয়োজনে পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয়। • প্রয়োজনে এয়ারেশন দেয়া হয়। • উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বেশি।	• পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন সুবিধা সম্পন্ন ছোট পাকা জলাশয়। • সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। • প্রায় সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন করা হয়। • নিয়মিত পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয়। • এয়ারেশন দেয়া হয়। • দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকবে। • অধিক উৎপাদন।	• পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন সুবিধা সম্পন্ন ছোট পাকা ট্যাংক। • পুষ্টিমানসম্পন্ন পিলেট খাবার প্রয়োগ। • ২৪ ঘণ্টা পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন করা হয়। • ২৪ ঘণ্টা পানির গুণাগুণ পরীক্ষা ও মনিটর করা হয়। • ২৪ ঘণ্টা এয়ারেশন ও ফিল্ট্রেশন সিস্টেম চালু থাকবে। • দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকবে। • সাধারণের চলাচল নিয়ন্ত্রিত। • রেসওয়ে পদ্ধতি। • সর্বোচ্চ উৎপাদন।

পর্যায়ক্রমে সহযোগী অবকাঠামো ও সুবিধাদি নির্মাণ বৃদ্ধি পাবে।

অন্তর্ভুক্ত করা সময়ের দাবী। বিশ্বের বহু দেশ অনেক পূর্বেই পরিস্থিতি অনুধাবন করে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মৎস্যবিজ্ঞানকে উন্নয়নের জন্য চাষ প্রযুক্তির সাথে মৎস্যচাষ প্রকৌশল বিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে এবং অর্জিত জ্ঞান মাঠপর্যায়ে প্রয়োগ করে উৎপাদন-স্তর (production level) বহুগুণ বাড়িয়ে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছে, গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রা বর্তমানেও অব্যাহত আছে। এমনকি অনেক দেশ মৎস্যচাষ প্রকৌশল বিদ্যার গুরুত্ব বিবেচনা করে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করে স্বতন্ত্র ডিগ্রি প্রদান করছে। আমাদের দেশের প্রতি একক জলাশয় হতে বর্তমান উৎপাদন মাত্রা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। সহনশীল মাত্রায় উৎপাদন বাড়াতে হলে মৎস্যচাষ প্রকৌশল কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিতে হবে। একটু দেরিতে হলেও প্রকৃত বাস্তবতা অনুধাবন করে আমাদের দেশের সকল উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদে মৎস্যচাষ প্রকৌশল বিদ্যাকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এর মাঠ পর্যায়ে সফল বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করার মাধ্যমে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে। মৎস্যচাষ প্রকৌশলের কর্মপরিধি বলতে একটা ব্যাপক কর্মকাণ্ডকে বুঝায়। বৃহত্তর পরিসরে এর আওতায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ট্রলার বা জাহাজ নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ মৎস্য আহরণের জন্য যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক নৌকা নির্মাণ, মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক কারখানা নির্মাণ, মৎস্য সংরক্ষণে বরফ কারখানা নির্মাণ, মৎস্য বাজারজাতকরণে প্রয়োজনীয় সুবিধা নির্মাণ, মৎস্য পরিবহনে প্রয়োজনীয় যানবাহন সংগ্রহ, কৃত্রিমভাবে মৎস্য ও চিংড়ি পোনা উৎপাদনে হ্যাচারি নির্মাণ, অর্থাৎ প্রস্তাবিত জায়গা নির্বাচন হতে নির্মিত খামার রক্ষণাবেক্ষণসহ মধ্যবর্তী সকল কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত।

সার্বিকভাবে মৎস্য খামার স্থাপন ও মৎস্যচাষ প্রযুক্তি, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণসহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান প্রকৌশল কর্মকাণ্ডগুলো বিবেচনা করা যায়।

- মৎস্য খামার স্থাপনের উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন (site selection)।
- নির্বাচিত জায়গার জরিপ ও মাটির স্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ (land survey & sub-soil investigation)।
- মৎস্য চাষের অবকাঠামো সুবিধাসমূহের পরিকল্পনা ও ডিজাইন তৈরি (facility planning & design)।
- স্বাদুপানি ও লবণাক্ত পানির মৎস্য খামার পরিকল্পনা ও ডিজাইন তৈরি (farm planning & design for fresh and brakish water aquaculture practices)।
- জৈবিক ও কারিগরি বিবেচনায় পানির পরিমাণ নির্ধারণসহ সরবরাহ ব্যবস্থাপনা (water supply facilities)।
- জৈবিক ও কারিগরি বিবেচনায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা (water drainage facilities)।
- মৎস্যচাষ কার্যক্রমে যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক সুবিধা নিশ্চিতকরণ (mechanical & electrical devices)।
- ব্যবহার উপযোগী পানির উৎস {ভূপৃষ্ঠস্থ (Surface) ও ভূগর্ভস্থ (sub-surface)] নিশ্চিতকরণ ও উত্তোলন ব্যবস্থা (water source identification)।
- মাটি ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষা (soil & water quality testing and analysis)।
- পেন, কেইজ ও র‍্যাপ্ট-এ মাছ চাষ পদ্ধতি পরিকল্পনা ও ডিজাইন তৈরি।
- কার্পজাতীয় মাছ এবং চিংড়ি হ্যাচারি পরিকল্পনা ও ডিজাইন তৈরি।
- গভীর/অগভীর নলকূপ পরিকল্পনা, ডিজাইন তৈরি ও স্থাপন পদ্ধতি।
- পানির গুণগত মান উন্নয়নের সুবিধাদি নির্মাণ (water quality improvement facilities/re-circulation)।
- মৎস্য প্রযুক্তিবিদ ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য মৎস্যচাষ প্রকৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রণয়ন।
- মৎস্যচাষ প্রকৌশলগত গবেষণার জন্য মডেল তৈরিকরণ।
- উন্মুক্ত জলাশয়ে গ্রহণযোগ্য মৎস্য চলাচল অবকাঠামো নির্মাণ (fish pass structure under open water fisheries)।
- অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যচাষ উপযোগী একক জলাশয় তৈরির লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ (culture management unit development under Inland capture fisheries)।
- মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধাসমূহ (fish processing and marketing facilities)।
- অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে যানবাহনসহ অন্যান্য যানবাহন ডিজাইন তৈরি।
- নির্মিত স্থাপনা এবং সুবিধাদি রক্ষণাবেক্ষণ (repair and maintanance)।

উপসংহার (Conclusion)

উপর্যুক্ত কর্মপরিধিগুলো বিবেচনায় আনা হলে এটা স্পষ্টভাবে বলা যায়, আধুনিক ও বাণিজ্যিক মৎস্য খামার ব্যবস্থাপনায় মৎস্যচাষ প্রকৌশলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আমাদের দেশে সময়ের চাহিদার সাথে তাল রেখে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা বর্তমানে যত আধুনিক হচ্ছে, মৎস্যচাষ প্রকৌশলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ততই বাড়ছে। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক ও পরিবেশের বিবেচনায় মৎস্যচাষ প্রযুক্তিকে শুধুমাত্র গতানুগতিক চাষ ব্যবস্থাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সঠিক হবে না। মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনাকে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক ও শক্তিশালী করতে হলে চাষ প্রযুক্তির সাথে সমান গুরুত্ব দিয়ে মৎস্যচাষ প্রকৌশলের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

নির্বাহী প্রকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

গলদা চিংড়ির আগাম ব্রুড উৎপাদনে গ্রীন হাউজ প্রযুক্তি

Early Brood Development of Galda using Green House Technology

ড. এস. বি. সাহা

Abstract

The freshwater prawn *(Macrobrachium rosenbergii)*, locally called galda, currently offers a good potential for large scale commercial aquaculture. The main constraint of production of galda is the late availability of seed, lack of supply of quality seed, and relatively larger culture period (at least six months) to become marketable. Generally, broods of galda become available in nature in late March to April and it needs about 40 days to produce post larvae of this species. That means post larve of galda becomes available in late May for stocking and after 4-5 months rearing, temperature of water decreased to a level (<20°C), which becomes uncongenial for the growth of this prawn. As a result, it becomes sometimes difficult to produce galda with good marketable size. If supply of broods of galda can be ensured in February, it will be possible to make post larvae available for stocking in late March and farmers will get sufficient time with optimum climatic conditions to produce marketable prawn. Bangladesh Fisheries Research Institute developed technology for early production on galda using green house concept. This has paved the way of early production of galda post larvae in the hatchery.

বাংলাদেশে বিদ্যমান চাষযোগ্য বাৎসরিক ও মৌসুমি স্বাদুপানি জলাশয়, এবং বাগদা চিংড়িতে ভাইরাসজনিত রোগের আক্রমণ বিবেচনায় উপকূলীয় অল্প লবণাক্ত ঘেরসমূহে বাণিজ্যিকভাবে গলদা চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং এ চিংড়ি চাষের প্রসারতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সময়মত মজুদের জন্য গুণগত মানসম্পন্ন পোনার অভাবে চাষের মাধ্যমে গলদা চিংড়ির উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাজারজাতকরণোপযোগী গলদা চিংড়ি উৎপাদন করতে সাধারণত ৬-৮ মাস সময় লাগে। সাধারণত মার্চের শেষ হতে এপ্রিল মাসে গলদার ব্রুড সহজপ্রাপ্য হয় এবং এরপর পোনা তৈরিতে প্রায় ৪০ দিন সময় লাগে। এতে চাষিদের কাছে গলদার পোনা মে মাসের শেষ নাগাদ সহজপ্রাপ্য হয় এবং এরপর পোনা হতে বাজারজাত উপযোগী চিংড়ি তৈরির জন্য ৪-৫ মাসের বেশি সময় পাওয়া যায় না। কারণ নভেম্বর মাস হতে পানির তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং এতে গলদা চিংড়ির বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। এর ফলে চাষি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদি ফেব্রুয়ারি মাসে গলদার ব্রুড সহজপ্রাপ্য করা যায়, তাহলে মার্চের শেষ নাগাদ চাষিদের কাছে পোনা সহজপ্রাপ্য করা যাবে। এতে চাষি বাজারজাত উপযোগী গলদা চিংড়ি তৈরির জন্য যথেষ্ট সময় পাবে। গলদা চিংড়ির প্রজনন অঙ্গের পরিপক্কতার জন্য সাধারণত ২৮-৩২° সে. তাপমাত্রা প্রয়োজন হয়। কিন্তু শীত মৌসুমে (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি) পানির তাপমাত্রা কম থাকার কারণে গলদা চিংড়ির ডিম্বাশয় পরিপক্ব হয় না। গবেষণায় দেখা যায় যে, শীত মৌসুমে পুকুরের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে গলদা চিংড়ির ব্রুড উৎপাদনের জন্য গ্রীন হাউজ প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর।

পুকুর নির্বাচনের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ
(Factors to be considered for pond selection)

- যে এলাকায় পুকুরের পানি প্রয়োজনবোধে পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা যায়, সে এলাকায় গ্রীন হাউজ পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ির ব্রুড উৎপাদন পুকুর নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়।
- গ্রীন হাউজ পুকুরের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করা আবশ্যক, যেখানে সার্বক্ষণিক সূর্যের আলো থাকে।
- পুকুরের আকৃতি আয়তাকার এবং আয়তন ছোট (১৮০-২০০ বর্গমিটার) হলে গ্রীন হাউজ তৈরি এবং এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়।

পুকুরে গ্রীন হাউজ তৈরি
(Construction of Green House on the Pond)

পুকুরের উপরে গ্রীন হাউজ তৈরির জন্য বাঁশ এবং বাঁশের চটা দিয়ে একটি কাঠামো তৈরি করা যেতে পারে। কাঠামোটি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে, যাতে কাঠামোর মাঝ বরাবর পানি হতে কাঠামোর দূরত্ব ১৮০-২০০ সেন্টিমিটার থাকে। কাঠামোর উপরে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যাতে কোথাও কোন ফাঁক না থাকে এবং প্রয়োজনে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য দুপাশে কিয়দংশ খুলে দেয়া যায়। এতে গ্রীন হাউজের ভিতরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে। পলিথিনের পুরুত্ব ০.৪-০.৫ মিলিমিটার হলে নির্দিষ্ট মাত্রায় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সুবিধা হয়। অধিক পুরু পলিথিন ব্যবহারের ফলে তাপমাত্রার অতিবৃদ্ধিতে চিংড়ির পীড়ন হতে পারে। আবার অধিক পাতলা পলিথিন ব্যবহারের ফলে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখা সম্ভব হবে না। পলিথিন যাতে বাতাসে উড়তে না পারে সেজন্য একটি বাঁশের চটার তৈরি কাঠামো পলিথিনের উপরে স্থাপন করা যেতে পারে।

চিত্র: পুকুরের উপরে গ্রীন হাউজ সেড

পুকুর প্রস্তুতি (Pond Preparation)

চাষকালীন পুকুরের পরিবেশ অনুকূল রাখার জন্য পুকুরের তলার ৬-৮ সেন্টিমিটারের অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলে মাটিতে পাথুরে চুন (১ কেজি/৪০ বর্গমিটার) ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর পুকুরে ১.০-১.৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত পানি সরবরাহ করে পানিতে ২৫ পিপিএম হারে ডলো চুন প্রয়োগ করতে হবে। পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য অপর্যাপ্ত হলে ২.০-২.৫ পিপিএম হারে ইউরিয়া এবং ২.৫-৩.০ পিপিএম হারে টিএসপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। পুকুরে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ২/৩ স্থানে ঝোঁপ তৈরি করা যেতে পারে, যা চিংড়ির খোলস পাল্টানোর সময় আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করবে।

চিংড়ি মজুদ ও খাদ্য সরবরাহ (Stocking of Pond and Feeding)

নভেম্বর মাসে সাধারণত: পুকুরের পানির তাপমাত্রা কমতে শুরু করে। এ সময়ে গ্রীন হাউজযুক্ত পুকুরে চিংড়ি মজুদ করতে হবে। পানিতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের পর প্রতি দুই বর্গমিটারে ১টি অর্থাৎ প্রতি শতাংশে ২০টি হারে বাছাইকৃত সুস্থ সবল চিংড়ি মজুদ করা যেতে পারে। মজুদকৃত স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়ির অনুপাত হবে ৪-৫:১। উভয় প্রকার চিংড়ির আকার বড় হলে ভাল। স্ত্রী চিংড়ির ওজন যত বেশি হবে তত ডিমের পরিমাণ ও বাজার মূল্য বেশি হবে। পুরুষ চিংড়ি সাধারণত তিন জাতের হয়। এর মধ্যে নীল ও লম্বা দ্বিতীয় চলন পদযুক্ত পুরুষ চিংড়ি প্রজনন প্রক্রিয়ায় অধিকতর সক্রিয় থাকে। তাই এজাতীয় পুরুষ চিংড়ি পুকুরে মজুদ করা বাঞ্ছনীয়। মজুদের পূর্বে চিংড়িগুলোকে ২০ পিপিএম ফরমালিনযুক্ত পানিতে গোছল করিয়ে জীবাণুমুক্ত করা ভাল। গলদা চিংড়ির ব্রুড তৈরির জন্য ৪৫% প্রোটিনসমৃদ্ধ দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। প্রতিদিন সকালে ও বিকালে মোট মজুদকৃত চিংড়ির ওজনের ৩-৪% হারে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। প্রতি কেজি চিংড়ির খাদ্যে ১২ মিলি হারে কড লিভার তৈল মিশিয়ে নিয়ে প্রয়োগ করলে ডিম পরিপক্বতা ত্বরান্বিত হতে সহায়ক হয়।

পানি ব্যবস্থাপনা (Water Management)

পুকুরের পানি ব্যবস্থাপনা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ পানির গুণগতমান খারাপ হলে চিংড়ি সহজে পরিপক্ব হবে না এবং বিভিন্ন রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। পানির গুণগতমানের মধ্যে তাপমাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ পানির তাপমাত্রা নির্দিষ্ট পর্যায়ে না উঠলে একদিকে যেমন চিংড়ির পরিপক্বতা বাধাগ্রস্ত হবে, অন্যদিকে তাপমাত্রা অধিক হলে চিংড়ি পীড়িত হতে পারে। তাই প্রত্যেকদিন সকাল-দুপুর-বিকেলে পুকুরের পানির তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। কোনো কারণে যদি পানির তাপমাত্রা ৩২° এর বেশি হয়ে যায় তাহলে পলিথিনের কিয়দংশ খুলে দিয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পিএইচ-সহ পানির অন্যান্য গুণাগুণ যথাযথ মাত্রায় রাখার জন্য প্রতি পনের দিন অন্তর পানিতে ১০-১৫ পিপিএম হারে ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে। পানির স্বচ্ছতা যদি ৩০ সেন্টিমিটারের চেয়ে কমে যায় তাহলে পুকুরের ১০-১৫% পানি পরিষ্কার স্বাদু কিংবা অল্প লোনা (২৩ পিপিটি) পানি দিয়ে পরিবর্তন করতে হবে। অধিক লবণাক্ত পানি চিংড়ির পরিপক্বতায় বিলম্ব ঘটাতে পারে। এছাড়া প্রতি পনের দিন অন্তর পানিতে চুন প্রয়োগের পূর্বে কিছু পানি পরিবর্তন করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। তবে কোনোভাবেই একবারে ১০% এর বেশি পানি পরিবর্তন করা উচিত হবে না। চিংড়ির গায়ে কালো দাগ বা শ্যাওলা পরিলক্ষিত হলে, ৩.০-৪.০ পিপিএম হারে জিওলাইট প্রয়োগ করা যেতে পারে।

চিংড়ির পরিপক্বতা (Gonad Development of Prawn)

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ শীত মৌসুমে পুকুরে গ্রীন হাউজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গলদা চিংড়ির প্রজননক্ষম ব্রুড উৎপাদন করা সম্ভব। মজুদের এক মাস পর থেকে প্রতি সাত দিন অন্তর ঝাঁকি জাল টেনে চিংড়ির পরিপক্বতা পরীক্ষা করতে হবে। চিংড়ির পেটে কমলা রংয়ের ডিম পরিলক্ষিত হলেই সে চিংড়ি ধরে পোনা উৎপাদনের জন্য হ্যাচারিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

চাষি পর্যায়ে গবেষণা (On-farm Research)

কেন্দ্র পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে Winrock International এর আর্থিক সহায়তায় বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলার চিলা বাজারস্থ দু'জন চাষির পুকুরে গ্রীন হাউস পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ির আগাম ব্রুড তৈরির উপর গবেষণা করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত খোলা পুকুরে কোনো চিংড়ির পেটে ডিম আসেনি কিংবা ডিম্বাশয় পরিপক্ব হয়নি। অন্যদিকে, গ্রীন হাউস পুকুরে জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে চিংড়ির ডিম্বাশয় পরিপক্ব হতে শুরু করে এবং ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে পেটে ডিমওয়ালা চিংড়ি পাওয়া যায়।

উপসংহার (Conclusion)

গ্রীন হাউজ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পুকুরের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে গলদা চিংড়ির আগাম ব্রুড তৈরি প্রযুক্তি জলজ চাষ ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন সংযোজন। উল্লিখিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে বর্তমান গলদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনায় অধিকতর উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য মাছসমূহের আগাম ব্রুড উৎপাদন গবেষণায়ও এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

চিত্র : ব্রুড গলদা চিংড়ি

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

বাংলাদেশের কাঁকড়া ও এর উন্নয়ন সম্ভাবনা

Crab of Bangladesh and its Development Potential

ড. বিনয় কুমার চক্রবর্তী

Abstract

Mud crab specially *Scylla serrata* aquaculture has been practiced for many years in Southern area of Bangladesh, based primarily on capture and fattening of juvenile crabs from the wild. The importance of live mud crab as an export commodity has opened up great opportunities for crab farming. Considering the increasing demand of mud crab in international markets, it has been gaining popularity among the coastal communities in greater Khulna, Barisal and Chittagong regions. Gravid female with full orange-red egg masses are in great demand in seafood restaurants of the South-east Asian countries. Due to its high price, people practiced to culture immature female crabs in some kind of enclosures and fed them until the gonads developed and filled the mantle cavity. Pens and floating cages made of bamboo, polyethylene netting and galvanized wire netting are used in coastal waters, shallow lagoons and ponds for mud crab fattening. This culture should be practiced on production and cost-benefit by following mud crab fattening, which will be changed the socio-economic status of the participatory communities. Considering all the above mention potentials and possibilities of crab, Department of Fisheries is going to implement a project for culture and management of crab in the selected area of coastal region. Thinking about the available water bodies and human resources in the country and their potentials for future expansion, lessons learned from the crab culture, this particular project has been designed and proposed. If the project is implemented properly, it will boost up total crab production, generate income and employment, and enhance export and foreign earnings.

বাংলাদেশে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলাভূমিগুলোর জীববৈচিত্র্য, ইকোসিস্টেম, পানি প্রবাহ ইত্যাদি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাদের জীবিকার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রকৃতি থেকে কাঁকড়া সংগ্রহ এবং প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট অন্যান্য কারণে এদের আবাসস্থল ধ্বংস হচ্ছে। ফলে প্রকৃতিতে এদের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। তারপরও বিদেশে কাঁকড়ার প্রচুর চাহিদা থাকায় উপকূলীয় এলাকায় কাঁকড়া চাষ পদ্ধতি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে । কিন্তু দেশে কাঁকড়ার সিডলিং উৎপাদনের জন্য কোনো সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারি গড়ে না উঠায় প্রকৃতি থেকেই অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁকড়ার পোনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। পোনা সংগ্রহের সময় প্রচুর পরিমাণে প্রজননক্ষম কাঁকড়া ও অন্যান্য প্রজাতির জলজ প্রাণী ধরা পড়ে বিনষ্ট হচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে বহির্বিশ্বে যে পরিমাণ কাঁকড়া রপ্তানি হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণই উপকূলীয় অঞ্চলের খুলনা, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলা হতে আহরিত হয়। কাঁকড়া এবং কাঁকড়ার পোনা আহরণের ক্ষেত্রগুলো হলো সমুদ্র উপকূলীয় নদী-নালা ও সুন্দরবন এলাকা। বর্তমানে আহরিত মৎস্যসম্পদের মধ্যে কাঁকড়া আহরণ অধিক লাভজনক। বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত মৎস্যসম্পদের মধ্যে চিংড়ির পরেই কাঁকড়ার স্থান। বাংলাদেশের মোট ১১ প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায়। যার মধ্যে সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত পানিতে ১১ প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রজাতির কাঁকড়ার মধ্যে শীলা কাঁকড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এরা চাষযোগ্য ও দ্রুত বর্ধনশীল এবং বাণিজ্যিকভাবে ফ্যাটেনিংযোগ্য। কাঁকড়া ০২-৫০ পিপিটি লবণাক্ততা ও ১২-৩৫° সে. পর্যন্ত তাপমাত্রায় বেঁচে থাকতে পারে। চাষযোগ্য প্রধান কাঁকড়া হলো শীলা কাঁকড়া বা শীল কাঁকড়া (*Scylla serrata*)। এর ইংরেজি নাম Mud crab/Mangrove crab/Green crab। কাঁকড়ার অন্যান্য প্রজাতিগুলো হলো *Scylla olivacea, Scylla tranquebarica* ও *Scylla paramamosain.*

চিত্র: *Scylla serrata*

চিত্র: *Scylla olivacea*

চিত্র: *Scylla paramamosain*

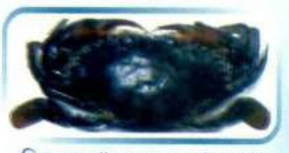

চিত্র: *Scylla tranquebarica*

চিত্র: *Mitten crab*

চিত্র: *Swimming crab*

চিত্র: *Blue crab*

চিত্র: *Dungeness crab*

চিত্র: *Red crab*

প্রাপ্তিস্থান ও প্রাপ্তির কারণ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, চকরিয়া, সন্দ্বীপ, ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, সুন্দরবন ইত্যাদি অঞ্চলে কাঁকড়া বসবাস করে। উপকূলীয় এ পরিবেশে প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান; তাই কাঁকড়া বসবাসের উপযোগী। কাঁকড়ার চাহিদা এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ফলে এসব অঞ্চলে কাঁকড়ার চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠী ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং বা মোটাতাজাকরণ করে দেশে ও বিদেশে সরবরাহ করছে। দরিদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষিরা জলাশয়ে ছোট পয়েন্ট তৈরি করে, পুকুর, খাল ও ছোট নদীতে খাঁচা ফেলে দিনে মাত্র এক-দুই ঘণ্টা শ্রম ব্যয় করে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং করে। এশিয়ার চীন, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, জাপান, হংকং এবং আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে লোনাপানিতে উৎপাদিত এ কাঁকড়া রপ্তানি হচ্ছে। বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭৪২৮.০ মে.টন কাঁকড়া ১৬৯.৪৯ কোটি টাকা মূল্যে রপ্তানি করা হয় এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৭৭০৭ মে.টন কাঁকড়া ১৬৪.৭৫ কোটি টাকা মূল্যে রপ্তানি করা হয়েছে। কিন্তু বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরের চেয়ে ২৭৯ মে.টন অতিরিক্ত কাঁকড়া রপ্তানির পরও বাজার দর ও ডলারের মূল্য উঠানামার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার আয় কম হয়েছে।

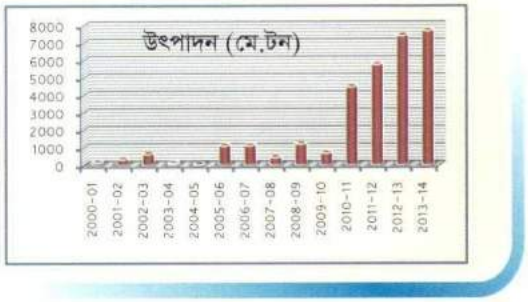

চিত্র: বিগত ১৪ বছরের কাঁকড়া উৎপাদনের বিবরণী

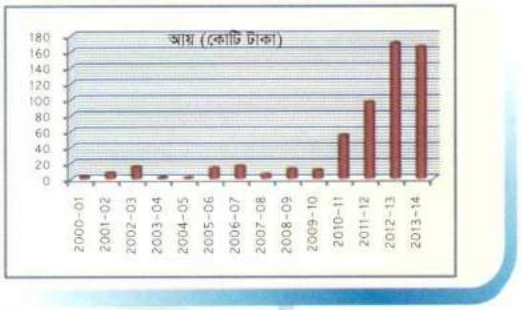

চিত্র: বিগত ১৪ বছরের কাঁকড়া থেকে আয়ের বিবরণী

তথ্য সূত্র:ফিশ ইয়ার বুক ২০১৩-১৪: পৃষ্ঠা নং ৫৪।

চিত্র: কাঁকড়া রপ্তানির একটি প্যাকেট

কাঁকড়া চিহ্নিতকরণ: পুরুষ কাঁকড়া দেখতে ইংরেজি অক্ষর ইউ এর মতো এবং স্ত্রী কাঁকড়া দেখতে ইংরেজি অক্ষর ভি এর মতো।

চিত্র: পুরুষ কাঁকড়া চিত্র: অপরিপক্ব স্ত্রী কাঁকড়া চিত্র: পরিপক্ব স্ত্রী কাঁকড়া

কাঁকড়া প্রজনন ও জীবনচক্র: কাঁকড়া ১৮-২০ মাসে পরিপক্ব হয়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস এদের প্রজননকাল। সাধারণত ২০০-২৫০ গ্রাম ওজনের একটি স্ত্রী কাঁকড়া ৮,৫০,০০০-১৫,০০,০০০ টি ডিম দিয়ে থাকে। এরা গভীর সমুদ্রে ডিম দিয়ে থাকে। ডিম ফোটার পর লার্ভাল পর্যায় পর্যন্ত এরা গভীর সমুদ্রে বসবাস করে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে যে লার্ভিটি দেখা যায় তা Zoea নামে পরিচিত। এরা খুব ছোট অবস্থায় সাঁতার কাটতে শুরু করে

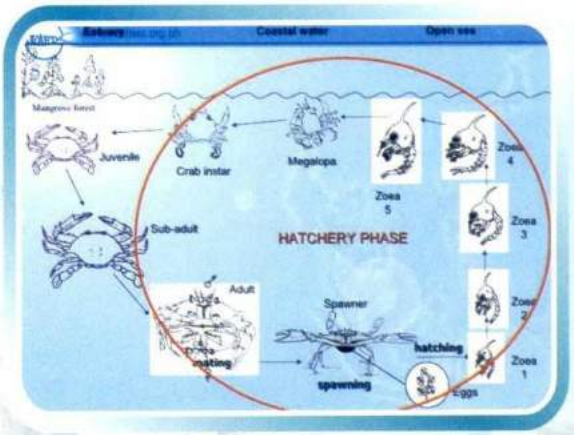

চিত্র: কাঁকড়ার জীবন চক্র

এবং সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে ভাসতে থাকে। এরা এভাবে সমুদ্র স্রোতে ৪-৫ সপ্তাহ ভাসতে থাকে। এ পর্যায়ে এরা

ফাইটোপ্লাংকটন খায়। ডিম থেকে Zoea রূপান্তর হতে সাত থেকে আট বার খোলস পাল্টায়। পরবর্তীতে এরা ২য় পর্যায়ে megalopa তে উপনীত হয়। Zoea পর্যায় থেকে megalopa পর্যায়ে উপনীত হতে এরা ৬-৭ বার খোলস পাল্টায়। Megalopa পর্যায়ে এরা দুর্বল থাকে এবং পানির স্রোতে ভাসতে থাকে। এ সময় এরা জুওপ্লাংকটন খায়। এ পর্যায়ে এরা এক সপ্তাহ সময় কাটায়। অতঃপর খোলস পাল্টিয়ে জুভেনাইলে পরিণত হয়। জুভেনাইল থেকে কিশোর কাঁকড়ায় রূপান্তর হতে ২০ বার খোলস পাল্টায়। ডিম থেকে কাঁকড়া হতে মোট ৩৫-৪০ দিন সময় লাগে। জুভেনাইল কাঁকড়া অগভীর অঞ্চল দিয়ে সাঁতার কেটে শত্রুমুক্ত স্থান দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্য দিয়ে সমুদ্র তীরের দিকে আসতে থাকে। কিশোর কাঁকড়া হতে পরিপক্ব কাঁকড়া হতে ১৬-১৮ মাস সময় লাগে।

ব্যবসায়িক চেইন: আহরণকারী (উপকূলীয় অঞ্চলের নদী হতে ধৃত কাঁকড়া) এবং সংগ্রহকারী (স্থানীয় ঘের, নদী-নালা, খাল ও জলাশয় হতে ধৃত কাঁকড়া) থেকে সরাসরি বাজার (ডিপো ও ফড়িয়া) এবং চাষি (মোটা তাজাকরণকারী চাষি)। ফড়িয়া থেকে ডিপো। বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে ডিপো থেকে রপ্তানির উদ্দেশ্যে সরবরাহকারী। সরবরাহকারীর উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে ভোক্তা এবং বিদেশে ভোক্তার কাছে কাঁকড়ার সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশে কাঁকড়া পৌঁছে দেয়া। বিদেশে রপ্তানি করার চাহিদা প্রায় ১০০% এবং কাঁকড়া ব্যবসার ক্ষেত্রে এটাই মুখ্য। দেশে ভোক্তার চাহিদা এবং মূল্য অনেক কম এবং এটা ব্যবসায়িকভাবে খুব একটা আমলে নেয়া হয় না। তাই সরবরাহকারী হতে রপ্তানিকারকের প্রতিনিধি; রপ্তানিকারকের প্রতিনিধি হতে রপ্তানিকারক; রপ্তানিকারক হতে বিদেশে বাজার এবং বিদেশে বাজার হতে ভোক্তার নিকট একটি চেইন আকারে পৌঁছায়।

কাঁকড়া চাষ: বাংলাদেশে কাঁকড়া চাষ বলতে প্রকৃত পক্ষে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ বোঝায়। কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ দু'ভাবে করা যায়। একটি পদ্ধতি হলো জলাশয়ের চিংড়ি ঘেরে পেন তৈরি করে এবং অন্যটি হলো বাক্সে/খাচায় কাঁকড়া চাষ। জুভেনাইল বা কিশোর/তরুণ (১০০-২৫০ গ্রাম) শীলা কাঁকড়াকে বাক্সে/খাঁচা বা ঘেরে আবদ্ধ রেখে খাদ্য সরবরাহ করে ৩০০-৫০০ গ্রাম আকারে পরিণত করার পর আহরণ করা হয়। গোনাড পরিপুষ্ট হয়নি এমন অপরিপক্ব কাঁকড়া ১.৫-৪.০ সপ্তাহ পর্যন্ত খাঁচায় বা বক্সে বা ঘেরে বা পয়েন্ট তৈরি করে তাতে রেখে পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ করে এগুলোকে পরিপক্ব গোনাডে পরিপুষ্ট করা যায়। কাঁকড়া ফ্যাটেনিং-এর জন্য এমন ঘের বা পুকুরে স্থান নির্বাচন করতে হবে যেন বছরে ৮-১০ মাস ৫ পিপিটির ওপর লবণাক্ততা থাকে। মাটি হতে হবে নরম ও দো-আঁশ এবং এসিড সালফেট ও অ্যামোনিয়া গ্যাসমুক্ত, জৈব পদার্থ থাকবে ৭-১২%, পরিবেশ হতে হবে হালকা শেওলা ও জলজ আগাছাযুক্ত, পানির লবনাক্ততা ২৫ পিপিটি, তাপমাত্রা ২২-৩০° সে., পিএইচ ৭.৫-৮.৫ এবং দ্রবীভূত অক্সিজেন >৪ পিপিএম থাকবে।

চিত্র: ঘেরের পেনে কাঁকড়ার চাষ

চিত্র: প্লাস্টিকের বক্সে কাঁকড়ার চাষ

চিত্র: বাঁশ দিয়ে তৈরি বক্সে কাঁকড়ার চাষ

পুকুর প্রস্তুতি: পুকুরের মাটি শুকানোর পর মাটির উপরের অম্ল ও বিষাক্ত পদার্থ অপসারণের জন্য তলদেশ জোয়ারের পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে। পানি সরবরাহ করে ১ দিন পর পানি ছেড়ে ধৌত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। পুকুরের তলদেশ চাষ করলে ভাল হয়। তারপর শতাংশে ০১ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হয়। তবে পিএইচ মাত্রার ওপর চুন প্রয়োগের মাত্রা নির্ভর করে। অবাঞ্ছিত প্রাণীর অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ০.২৫ মিমি ছিদ্রযুক্ত নাইলন জাল দিয়ে ছেঁকে ৩০ সেমি পর্যন্ত পানি উত্তোলন করতে হবে। সাত দিন পর ৫০০ কেজি/হেক্টর সরিষার খৈল প্রয়োগ করা যেতে পারে। চার দিন পর টিএসপি ও ইউরিয়া ৩:১ অনুপাতে হেক্টর প্রতি ৩৫ কেজি হারে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। এ সময় পানির গভীরতা থাকবে এক মিটার।

খাঁচা তৈরি: পরিপক্ব বাঁশ ১.৫-২.০ সেমি মোটা ফালি করে চিকন সুতা দিয়ে বানা তৈরি করতে হবে। বানাগুলোকে পাশাপাশি সংযুক্ত করে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট বড় আকারের খাঁচা তৈরি করতে হবে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের আয়তন ১০´´×১০´´×১২´´ হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে নদীর কম স্রোতসম্পন্ন অংশে পুকুর/ঘেরে বাঁশের খাঁচা স্থাপন করতে হবে। খাঁচার চারপাশে শক্ত বাঁশ/কাঠের খুটি পুঁতে দিতে হবে এবং প্রয়োজনে কয়েকটি প্লাস্টিকের ড্রাম খাঁচার উপরিভাগে বিভিন্ন স্থানে বেঁধে দিতে হবে। খাঁচা পানির উপরে ১.৫-২.০ ইঞ্চি ভেসে থাকবে। জোয়ার-ভাটায় খাঁচা উপরে নিচে উঠানামা করবে। অপরিপক্ব গোনাড সম্পন্ন, সুস্থ ও সবল সকল পা-সহ স্ত্রী কাঁকড়া ১৮০ গ্রাম/তদূর্ধ্ব খাঁচার প্রতিটি প্রকোষ্ঠে মজুদ করতে হবে।

এটা সর্বোচ্চ গ্রেডভুক্ত ও বিদেশে রপ্তানিযোগ্য। আবার অপরিপক্ব গোনাড সম্পন্ন, সুস্থ ও সবল, সকল পা-সহ ১৭৫ গ্রাম ওজন সম্পন্ন স্ত্রী কাঁকড়া ও খাঁচার প্রতিটি প্রকোষ্ঠে মজুদ করা যেতে পারে।

খাদ্য প্রয়োগ: মাংসাশী খাবার যথা- শামুক, ঝিনুক, চিংড়ি ও মাছ খেতে পছন্দ করে। এছাড়া ২৫% তেলাপিয়া ও ৭৫% গরু ছাগলের ভুড়ি বা ৫০% তেলাপিয়া এবং ৫০% ট্রাস ফিস (চিত্র ২০) প্রতিদিন কাঁকড়ার দৈহিক ওজনের ৪-৫% হারে দু'বেলা প্রয়োগ করতে হবে। পানির গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারের সময় ৪-৭ দিন ৩০-৪০% হারে ঘের/পুকুরে পানি পরিবর্তন করা আবশ্যক।

চিত্র: কাঁকড়ার খাবার ট্রাস ফিস

আহরণ: ১৪-১৬ দিনের মধ্যে কাঁকড়ার গোনাড পরিপক্ব হলে এ সময় হাত দিয়ে সরাসরি বা স্কুপনেট দিয়ে বা জলাশয় হতে খাঁচা তুলে কাঁকড়া ধরতে হবে এবং আহরিত কাঁকড়াকে সাবধানে বিশেষ নিয়মে প্লাস্টিকের ফিতা/নাইলন রশি দিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে। ধৃত কাঁকড়াকে গ্রেডিং অনুযায়ী বিক্রয় করতে হবে।

চিত্র: গোনাড পরিপক্ব কাঁকড়া

আয়-ব্যয়: উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে ছয় মাস (ফেব্রুয়ারি-জুলাই) যে লবণাক্ততা পাওয়া যায় পর্যায়ক্রমে কমপক্ষে প্রতি মাসে ০২টি ব্যাচ হিসেবে মোট ১২টি ব্যাচে কাঁকড়ার চাষ সম্ভব। এ পদ্ধতিতে এক শতক আয়তনের ঘেরে/পুকুরে কাঁকড়া ব্যয়-আয়ের অনুপাত হতে পারে ১:৬২।

খাঁচায় কাঁকড়া ফ্যাটেনিং-এর সুবিধা

প্রতি প্রকোষ্ঠে একটি করে কাঁকড়া মজুদ করা হয়। ফলে মজুদকৃত কাঁকড়ার মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা হয় না এবং খাবারের অপচয় রোধ করা সম্ভব। পানি দূষণ থেকে রক্ষার জন্য জোয়ার-ভাটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানে খাঁচা স্থাপন করতে হবে। গোনাডের পরিপক্বতা তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব। বাঁচার হার সঠিকভাবে নিরূপণ করা সহজ। খাঁচায় খাবার দেয়া, আহরণ ও পরিচর্যা সহজেই করা যায়। চাষি একই জলাশয়ে সাদা মাছের চাষও করতে পারে।

কাঁকড়া চাষ এবং রপ্তানি সম্প্রসারণে করণীয়: জলবায়ুর পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে উপকূলীয় জলাভূমির জীববৈচিত্র্য থেকে অনেক প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে। সেসাথে দিনে দিনে কাঁকড়ার আবাসস্থল ধ্বংস হচ্ছে। ফলে প্রকৃতিতে এদের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে মৎস্য অধিদপ্তর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়ার চাষ এবং গবেষণা' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রকৃতি হতে কাঁকড়া আহরণ করে বাণিজ্যিকভাবে কাঁকড়া চাষ হচ্ছে এবং কাঁকড়া চাষের জন্য যে অঞ্চলের জলাশয় পরিবেশগতভাবে উপযুক্ত উপকূলীয় এমন ২৭টি উপজেলা নির্বাচিত করা হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ২.৫-৩.০ লক্ষ নারী-পুরুষ কাঁকড়া আহরণ ও বিপণন করে জীবিকা নির্বাহ করছে। তাই এ সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে:

- দেশের উপকূলীয় এলাকায় কাঁকড়া চাষ জনপ্রিয় করা;
- উন্নত সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাঁকড়া এবং তার বাসস্থান সম্পর্কে নিজস্ব জ্ঞান আহরণ ও তা প্রয়োগ করা;
- কাঁকড়া চাষ ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগীদের নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে দক্ষতা উন্নয়ন করা;
- গরীব সুফলভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা;
- কাঁকড়ার অধিকতর সফল ব্যবস্থাপনার জন্য এর জলজ পরিবেশের ইকোসিস্টেম উন্নয়ন করা; এবং
- কাঁকড়া রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম হলো নিম্নরূপ

- কাঁকড়া চাষ এবং ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে দক্ষতা উন্নয়ন;
- উপকূলবর্তী এলাকায় পাইলট আকারে কাঁকড়ার প্রদর্শনী স্থাপন করা;
- সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে কাঁকড়ার হ্যাচারি নির্মাণ ও পোনা উৎপাদন করা;
- পাইলট আকারে প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে নতুন প্রযুক্তি প্যাকেজ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা; এবং
- কাঁকড়া রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

উপসংহার (Conclusion)

কাঁকড়া চাষ এবং ব্যবসা সংক্রান্ত সামগ্রিক গবেষণা জোরদারকরণ করতে হবে। পরিবেশবান্ধব কাঁকড়া চাষ উন্নয়নে সরকারি নীতিমালা এবং আইন তৈরি করতে হবে। বন বিভাগ শুধুমাত্র তার নিজস্ব সুন্দরবন এলাকায় যেখান থেকে কাঁকড়া আহরণ করা হয় অথবা তার এলাকায় কোনো খামার প্রতিষ্ঠা করলে শুধুমাত্র সেখানেই তারা আধিপত্য বিস্তার করবে। চিংড়ির ঘেরে গড়ে উঠা কাঁকড়ার খামার বা সমুদ্র উপকূলে গড়ে উঠা বা ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে এমন কাঁকড়া খামারের তদারকিসহ খামারের লাইসেন্স প্রদান, সরকারি কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা এবং আইন প্রক্রিয়ায় পরিবেশবান্ধব কাঁকড়া চাষ পদ্ধতিসহ সকল কার্যক্রম মৎস্য বিভাগের হাতে ন্যস্ত করতে হবে। জীবন্ত কাঁকড়া রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে গণ্য করে পরিবহনজনিত মৃত্যুরোধে উন্নত পদ্ধতি চালু করা জরুরি। কাঁকড়া চাষ মৎস্য সেক্টরের একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। তাই কাঁকড়া চাষই ঘুচাতে পারে দারিদ্র্য এবং বদলে দিতে পারে মৎস্য সেক্টরের বৈদেশিক আয়ের চিত্র।

প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও গবেষণা প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মৎস্য সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

Women's Participation in Fisheries and Development Potentials

ড. মোহাঃ সাইনার আলম[১] ও শবনম মোস্তারী[২]

Abstract

The scope and magnitude of women's participation in fisheries and aquaculture interventions in Bangladesh are influenced to a large extent by the level of aquaculture technology as well the role and status of women in the society. But during the recent past years, women are directly or indirectly involved in various capacities in fish production through aquaculture due to several socio-friendly initiatives of the government. Traditionally, women have been involved in small-scale aquaculture in different stages of operation. They are active 'caretakers' of fish in homestead ponds, nurseries, cages, and even in rice fields. It is only now that there is a growing recognition of the ability and potential of women in contributing to the national economy in the fisheries sector. Rice farming is traditionally the domain of men, however, women had a tremendous role in influencing men to give up pesticide usage and undertake fish cultivation with the rice. Cage culture is another activity that has been successfully introduced in Bangladesh and several women are engaged in this activity. Women's groups have been able to nurse the fish in cages using various types of waste materials and ensured effective cage management. Through creating access to water bodies even those women who do not have any land or pond can take part in cage culture. The increase in cage culture, particularly by women groups, has helped to increase the consumption of fish. In Bangladesh, women have proven to be competent in adopting aquaculture technologies, despite the fact that their role in aquaculture growth has not been sufficiently recognized and remains inadequately addressed. To ensure sustainability in aquaculture, it is necessary to understand related issues and develop gender sensitive interventions.

সারা বিশ্বে আজ উৎপাদনমূলক কাজে নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উন্নয়নের এক মূল পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যদিও অনুন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশে সামাজিক ও প্রজনন বিষয়ে নারীর ভূমিকা যতটা দৃশ্যমান, ততটা নয় উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, গ্রামীণ এলাকায় উৎপাদন ও আয়মূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণে প্রয়োজনীয় সুযোগ ও সচেতনতার অভাব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের মূল জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারীদের সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করে নারীকে সার্বিক উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, নারীদের অংশগ্রহণ অধিকতর বৃদ্ধির পক্ষে সমর্থন যোগানো, তাদের অবদানকে সর্বার্থে ও সর্বক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিয়ে এ সমর্থন বাড়ানো, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে প্রযোজ্য কর্মক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানের পাশাপাশি সচেতনতা সৃষ্টির ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নারীর অংশগ্রহণের নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র।

বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার নারীর উন্নয়নের স্বার্থে CEDAW ও বেইজিং ডিক্লারেশন প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করছে এবং তা বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নারীর ক্ষমতায়ন, সমসুযোগ, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় উন্নয়নে মূল স্রোতধারায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ:

- নারী উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে চিহ্নিতকরণ।
- সরকারি সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিওসমূহ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের জন্য একটি সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রদান।
- নারী উন্নয়নের জন্য গৃহীত বর্তমান কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে সুষ্ঠু সমন্বয়ের কর্মসূচি প্রদান।
- নারী উন্নয়ন ও নারী অধিকারের স্বপক্ষে প্রণীত দেশীয় আইন, নীতি এবং আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিলসমূহের বাস্তবায়ন।
- সার্বিকভাবে জাতীয় উন্নয়নে নারীদের অবদানের স্বীকৃতি দেয়া।

জাতীয় নীতি ও নারী উন্নয়ন (National policies and women development)

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ৩৬.৩ নম্বর অনুচ্ছেদে কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ প্রদান করার বিষয়ে উল্লেখ আছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর আলোকে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ পরিকল্পনার আওতায় মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা (১৫%) অর্জিত হয়েছে বলে প্রাথমিক তথ্যে প্রতীয়মান হয়। মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণে ২০% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

তাছাড়া ২০২০-২১ সালের মধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমে নারী সুফলভোগীদের ৩০% অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মৎস্য সেক্টরের সকল প্রতিবন্ধকতার অবসান করে মৎস্যসম্পদের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮ প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮ ও জাতীয় মৎস্য কৌশল ২০০৬-এর আলোকে ইতোমধ্যেই গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কৌশল বা নীতিমালায় মৎস্যচাষ ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকাণ্ডে সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ অগ্রাধিকার ও সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। জাতীয় মৎস্য নীতির উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে অন্যতম হলো:

- মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন; এবং
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন, মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে নারীর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ রয়েছে। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার সাথে সম্মিলিতভাবে বাড়ির আঙ্গিনাস্থ পুকুরে পুষ্টিসমৃদ্ধ ছোট মাছ চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি, মহিলা/শিশুদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও সামাজিকভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

মৎস্য শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ
(Fisheries education, research and extension)

মৎস্যবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে দেশের প্রথিতযশা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউটে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক বিরাট অংশ দখল করে আছে নারী শিক্ষার্থীরা। এ বিষয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণার ক্ষেত্রে দেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহসহ অন্যান্য দু'টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি বেসরকারি কলেজে তাৎক্ষণিকভাবে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, বর্তমানে মৎস্যবিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে অধ্যয়নরত মোট ১১৩৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই (৪৭.৯৭ শতাংশ) নারী। এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত দেশের একমাত্র সরকারি মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট (চাঁদপুর)-এ অধ্যয়নরত মোট ১১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ২৩.৪৮ শতাংশ নারী।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অপার সম্ভাবনাময় মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন নারীর পদচারণাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০১৫-এ প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারির মধ্যে মহিলার শতকরা হার যথাক্রমে ১৩.৪২ ও ১১.০৪। সেখানে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মধ্যে মহিলা কর্মীর হার ১৩.০৮ শতাংশ। তাছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল সংকট এবং মৎস্য সেবা কার্যক্রমের বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক সময়ে দু'টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২৭১৪ জন স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মী বা লিফ উন্নয়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১১০ জন মহিলা কর্মী।

মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নারীর কর্মসংস্থান
(Fisheries resources management and women employment)

প্রযুক্তিভিত্তিক মৎস্যচাষ পদ্ধতি সম্প্রসারণ, মুক্ত জলাশয়ে জৈবিক ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন, আবাসস্থল সংস্কার ও উপযুক্ত জলাশয়ে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে মাছের উৎপাদন ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫.৪৮ লক্ষ মে.টনে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মৎস্যচাষ ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে নারী অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করায় ক্রমান্বয়ে নারীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদেশের নারীরা ক্ষুদ্র আকারে মৎস্যচাষ কার্যক্রমে

অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য খাতের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে দেশের প্রায় ১১ শতাংশ বা ১৭৮ লক্ষ লোক তাঁদের জীবন-জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য উপখাতের ওপর নির্ভরশীল। মৎস্য সেক্টর সংশ্লিষ্ট এ জনগোষ্ঠীর (১৭৮ লক্ষ) মধ্যে প্রায় ১৪ লক্ষ নারী, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক শতাংশ। এছাড়াও উল্লিখিত সময়ে অর্থাৎ বিগত পাঁচ বছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অতিরিক্ত বার্ষিক প্রায় ৬ লক্ষাধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; সেখানে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অতিরিক্ত বার্ষিক প্রায় ০.৫ লক্ষাধিক।

নারী উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ
(Areas relevant to women development)

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার নিমিত্ত চিংড়ি/মৎস্য উৎপাদন, বিপণন, সরবরাহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রায় প্রতিটি স্তরে নারীদের সম্পৃক্ত করার সরকারি-বেসরকারি

উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। আশা করা যায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারিত হওয়ায় সাথে সাথে এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধিত হবে। মৎস্য সেক্টরে নারী কর্মসংস্থানের সুযোগ ও আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত

গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ তথা ক্ষমতায়ন অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য সেক্টরের অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রসমূহ, যেখানে আরো অধিকসংখ্যক নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে, হলো:

- বসতবাড়ি সংলগ্ন পুকুরে সমন্বিত ও পরিবেশবান্ধব মাছ ও চিংড়ি চাষ এবং পোনা প্রতিপালন;
- সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও খাঁচায় মাছ চাষ;
- জলমহাল ব্যবস্থাপনা, বিল নার্সারি স্থাপন ও পরিচালনা;
- মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম তৈরি ও বিপণন;
- হাওর-বাঁওড় ও খাল-বিলে মাছ ধরার মৌসুমে অতিরিক্ত মাছ ও চিংড়ির স্বাস্থ্যসম্মত শুটকিকরণ;
- পারিবারিক পর্যায়ে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ও সহজলভ্য উপকরণের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকরণ;
- মাছ ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় কর্মী হিসেবে; এবং
- সেক্টর-সংশ্লিষ্ট বিকল্প কর্মসংস্থান।

এ ক্ষেত্রসমূহে নারীর পদচারণা যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের উদ্দেশ্যে আপামর নারী কর্মীগণকে চাহিদাভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গৃহীত পদক্ষেপ
(Institutional steps towards women development)

মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

ক. উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ: মৎস্য অধিদপ্তরের সকল স্তরে উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরীয় প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নারী কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অবস্থান

সুদৃঢ় থাকায় উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে। দেখা যায় বিগত চার বছরে বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারে যোগদানকৃত প্রথম শ্রেণির মোট ১৮৫ জন কর্মকর্তাগণের মধ্যে প্রায় ২৬.৪৯ শতাংশ মহিলা কর্মকর্তা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় মৎস্য শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বেশি।

খ. জেন্ডারসহিষ্ণু কর্মপরিবেশ সৃষ্টি: সরকারের বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারি নির্বিশেষে সকল নিয়োগে মহিলা কোটা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রশিক্ষণসহ সকল দক্ষতা উন্নয়নমূলক কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অধিদপ্তরীয় সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীবান্ধব পরিবেশ বজায় রয়েছে।

গ. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ: দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় মৎস্যখাতের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে সমাজের সুবিধা-বঞ্চিত, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুঃস্থ নারী, যাদের পুকুর/ডোবা আছে বা মাছ চাষ বা ব্যবস্থাপনা করার জন্য অনুরূপ কোনো উৎসে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে, তাঁদেরকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ফলে দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল স্রোতধারায় নারীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মৎস্যচাষের মত আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে বিধায় নারীর কর্মসংস্থান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মৎস্য সেক্টরে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হলো:

১. জনবল নিয়োগ ও দক্ষতা উন্নয়ন: বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক নির্ধারিত মহিলা কোটায় জনবল নিয়োগ করা হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে মহিলা প্রায় ২১ শতাংশ। তাছাড়া নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরে কর্মরত সকল পর্যায়ের মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারিকে বিভিন্ন কার্যকর ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন।

২. মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তকরণ: বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুঃস্থ নারী, যাদের পুকুর/ডোবা আছে বা মাছ চাষ বা ব্যবস্থাপনা করার জন্য অনুরূপ কোনো উৎসে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে তাঁদেরকে মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ।

৩. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুফলভোগী নির্বাচনে: বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিতে নারীদের মধ্য থেকে সাধারণভাবে ২০-২৫ শতাংশ সুফলভোগী নির্বাচন করা হয়ে থাকে। মৎস্যখাতের **ভিশন ২০২১**-এর আওতায় গৃহীত মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ ২৫-৩০ শতাংশে উন্নীত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪. মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানায় কর্মসংস্থান: চিংড়ি ও হিমায়িত মৎস্য উৎপাদন, সরবরাহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন অর্থাৎ সাপ্লাই চেইনের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নারীদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, বর্তমানে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকের শতকরা ৮০ ভাগই নারী। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত নারীর উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।

৫. বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি: সাম্প্রতিক সময়ে ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে জাটকা মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি একটি অন্যতম উৎপাদনমুখী ও সময়োপযোগী কার্যক্রম বলে ইতোমধ্যেই প্রতীয়মান হয়েছে। এর ফলে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্যজীবী পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে মহিলাদের বিকল্প আয়ের ক্ষেত্রসমূহ হয়েছে প্রসারিত এবং হ্রাস পেয়েছে মৎস্যজীবীদের আকস্মিক ঝুঁকি। বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিসহ বিবর্ধিত প্রাণিজ আমিষের একটি অংশ নারীরা ভোগ করবে, যা তাঁদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করবে।

৬. পারিবারিক পুষ্টি যোগান: বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে নারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টির অধিকতর নিশ্চয়তা বিধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দেখা যায় মৎস্য সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলে চাষিদের, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণি ও দুঃস্থ নারীদের জীবনযাত্রায় সার্বিকভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পে নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টির অধিকতর নিশ্চয়তা বিধানের প্রচেষ্টাও অনেকাংশেই সফল হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পাধীন এলাকায় পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, পুকুরে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে চাষিদের মাছ খাওয়ার পরিমাণ বেড়েছে ২৮%, যেখানে পুরুষ মৎস্যচাষির (২৭%) চেয়ে মহিলা মৎস্যচাষির (৩৯%) বেলায় মাছ খাওয়ার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি হয়েছে।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধতা
(Barriers in women development)

বহুবিধ কারণে এদেশে নারীর সামাজিক সুবিধার পরিধি অত্যন্ত সীমিত হলেও সাম্প্রতিক সময়ে এর সুস্পষ্ট ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেখানে নারী নিজেকে জড়িত করতে পেরেছেন বা সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই সাফল্য দেখাতে পেরেছেন। এ সুযোগ সৃষ্টিতে যেসব বাঁধা এখনও বিদ্যমান তার মধ্যে অন্যতম হলো সামাজিক রক্ষণশীলতা, খাস জলাশয় ইজারা প্রদানে বৈষম্য ও অশিক্ষা বা নিরক্ষরতা। বর্তমানে মাছ চাষ একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হলেও গ্রামীণ এলাকায় নারীশিক্ষার অগ্রগতির হার তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া নারীর জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ না থাকা, নারীর সহপ্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক বাঁধা, মহিলা সুফলভোগী নির্বাচণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনীয় সুযোগ ও সচেতনতার অভাব। সর্বোপরি নারীবান্ধব উন্নয়ন নীতির প্রয়োগে প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাব।

উপসংহার
(Conclusion)

সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল স্রোতধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুঃস্থ নারী, উদ্যোগী মহিলা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ঈপ্সিত প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা কৌশল (পিআরএ) অনুসরণ করা যেতে পারে। ফলশ্রুতিতে মাছের উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও আয় বৃদ্ধি অনেকাংশেই নিশ্চিত হবে। ভিশন ২০২১-এর আওতায় মৎস্যবিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ ২৫-৩০ শতাংশে উন্নীত করার প্রচেষ্টা সফল করার লক্ষ্যে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় নিয়োজিত নারী কর্মীর ন্যায় অন্যান্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রেও নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ফলে পরিবার ও সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির সাথে সাথে মৎস্য সেক্টরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জেন্ডার সমতাকরণের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জিত হবে।

[১]সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[২]সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ইউএসএআইডি - অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্পের পোনা উৎপাদন কার্যক্রম ও অর্জিত ফলাফল

Seed Interventions of USAID-Aquaculture for Income and Nutrition Project and Key Outcomes

মোঃ শহিদুল ইসলাম,[১] মোঃ রফিকুল ইসলাম খান[২] ও Hendrik Jan Keus[৩]

Abstract

In order to improve availability of quality seed of fish, shrimp and crab, the USAID-Aquaculture for Income and Nutrition (AIN) project is conducting research in cooperation with DoF, BFRI and the private sector. USAID-AIN and BFRI, Cox's Bazar, conducted induced breeding of mud crab (*Scyla serrata*) and crablets were produced for the first time in Bangladesh. The project provided technical support to a private sector hatchery as a result of which the reproduction technology of nona tengra (*Mystus gulio*) was improved and 3.6 million seeds were produced. Several hatcheries are planning to produce tengra seed in 2015. In 2014, with support of USAID-AIN, induced breeding of gold spot mullet, *Liza parsia* was carried out at BFRI, Paikgachha of Khulna district and 600 fingerlings were produced from 9 brood fishes. At the end of 2015 a new cycle with higher production is planned. The USAID-AIN project has supported several private sector hatcheries to set up a Tilapia Breeding Nucleus (TBN) from which GIFT tilapia seeds are produced, which are used as brood stock in satellite hatcheries. The project worked closely with two prawn hatcheries to reduce mortality in seed production of freshwater prawn (*M. rosenbergii*). Based on experiments it was found that biosecurity and good water treatment are the main factors for success. The project is supporting the DOF PCR testing laboratory in Cox's Bazar. Under this initiative, from 2012-14, a total of more than 1100 million White Spot Syndrome Virus (WSSV) free black tiger (*P. monodon*) shrimp seeds have been distributed to farmers. Further research in cooperation with Government, NGOs and the private sector is needed to provide farmers in Bangladesh, through the production of quality seed, with a variety of aquaculture options from which farmers can choose the best, based on their conditions.

মৎস্য সেক্টর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এবং জনগণের পুষ্টি ও কর্মসংস্থানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাগুলোর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা মৎস্যচাষ। মৎস্যচাষের সফলতা নির্ভর করে সঠিক সময়ে চাহিদা মাফিক গুণগত মানসম্পন্ন পোনা প্রাপ্তির ওপর। সঠিক সময়ে পরিমাণমত পোনা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন কাঙ্ক্ষিত প্রজাতির হ্যাচারি উৎপাদন। তাই অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছ, চিংড়ি বা কাঁকড়া চাষের জন্য হ্যাচারি উৎপাদন খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে মূলত রুইজাতীয় মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সফলভাবে সম্পাদিত হচ্ছে। কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চলে আরও কিছু মাছ ও কাঁকড়া রয়েছে যেগুলো অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কৃত্রিম প্রজনন বা হ্যাচারি উৎপাদন শুরু হয়নি। আবার গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় হ্যাচারি উৎপাদন কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।

মাছ ও চিংড়ির পোনার গুণগত মান উন্নত করার জন্য আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ডফিস-এর ইউএসএআইডি- অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্প পোনা উৎপাদনের বিভিন্ন কলাকৌশল নিয়ে গবেষণা করছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় নোনা টেংরা, মুলেট মাছ এবং শীলা কাঁকড়ার কৃত্রিম প্রজনন ও গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন জোরদারকরণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তেলাপিয়া মাছের ব্রুডস্টক উন্নয়ন ও ভাইরাসমুক্ত বাগদা চিংড়ির পোনা উৎপাদনেও প্রকল্পটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

১. শীলা কাঁকড়ার কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন

(Artificial breeding and fingerling production of mud crab)

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ির পরই কাঁকড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে মোট ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া আছে যার মধ্যে ১১টি সামুদ্রিক প্রজাতি। এ সামুদ্রিক প্রজাতিগুলোর মধ্যে শীলা কাঁকড়া (*Scylla serrata*) খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্ববাজারে চাহিদা ও মূল্য বেশি। এ কাঁকড়া মূলত জীবিত অবস্থায় বিভিন্ন দেশে (যেমন: চীন, জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান ইত্যাদি) রপ্তানি করা হয়। কাঁকড়া রপ্তানির হার বছর বছর বেড়েই চলেছে। গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ হতে প্রায় ২৩.১২ মিলিয়ন ডলার মূল্যের কাঁকড়া রপ্তানি হয়। এসব কাঁকড়া প্রাকৃতিক উৎস হতে ধরা হয় এবং কিছু অংশ মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়।

বিশ্ববাজারে প্রবল চাহিদা ও ভাল দামের কারণে কাঁকড়া চাষ এখন বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো কাঁকড়া চাষের সকল পোনা প্রাকৃতিক উৎস (যেমন: সুন্দরবন-প্যারাবন ম্যানগ্রোভ, মোহনা ইত্যাদি) হতে সংগ্রহ করা হয় কারণ দেশে এখনও কাঁকড়ার কোনো হ্যাচারি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অধিক হারে আহরণের ফলে কাঁকড়ার প্রাকৃতিক উৎস প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পড়েছে। এ চাপ কমানোর জন্য এবং সময়মত ও চাহিদামত পোনা প্রাপ্তির জন্য কাঁকড়ার কৃত্রিম প্রজনন ও হ্যাচারি উৎপাদন খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। হ্যাচারিতে কাঁকড়ার কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইউএসএআইডি- একুয়াকালচার ফর

ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্পটি ওয়ার্ল্ডফিস এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট যৌথভাবে কক্সবাজারে লোনা পানি কেন্দ্রে গত ডিসেম্বর ২০১৪ - জানুয়ারি ২০১৫ সময়ে কাঁকড়ার কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং সাফল্যের সাথে পোনা উৎপাদন কার্যক্রম শেষ করে যা সে সময়ের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। উক্ত কার্যক্রমে উপকূলীয় মোহনা হতে ব্রুড কাঁকড়া সংগ্রহ করে তা কক্সবাজারের বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাথে কক্সবাজারস্থ লোনা পানি কেন্দ্রে কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়। উৎপাদিত কাঁকড়ার পোনাগুলো মোট ৬টি পর্যায় (zoeai-iv ও মেগালোপা) অতিক্রম করে ক্র্যাবলেট পর্যায়ে পৌছায়। কাঁকড়ার এ কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন বাংলাদেশে প্রথম। শীলা কাঁকড়ার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পোনা উৎপাদনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

২. নোনা টেংরা মাছের পোনা উৎপাদন
(Fingerling production of nona tengra)

নোনা টেংরা (*Mystus gulio*) বাংলাদেশের একটি অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছ। উপকূলীয় পানিতে এর প্রাকৃতিক পোনা পাওয়া যায় যা চিংড়ির পোনার সাথে ঘেরে প্রবেশ করে এবং কৃষক বাড়তি ফসল হিসেবে পায়। নোনা টেংরা মাছের কোনো হ্যাচারি প্রতিষ্ঠিত হয়নি বিধায় কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনের জন্য ইউএসএআইডি- অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্পটি ২০১১ সালে ম্যানগ্রোভ হ্যাচারিকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। উক্ত কার্যক্রমের ফলে ৩৬ লক্ষ পোনা উৎপাদিত হয় এবং প্রতি হাজার পোনা ৫০০-৬০০ টাকা দরে বিক্রয় করা হয়। হ্যাচারি উৎপাদিত পোনা চাষ করে কৃষকগণ ভাল ফল পেয়েছেন।

৩. মুলেট মাছের পোনা উৎপাদন
(Fingerling production of mullet)

বাংলাদেশের উপকূলীয় নদীগুলোতে মুলেট মাছ পাওয়া যায়। এ মাছটির বাজারে যথেষ্ট চাহিদা আছে এবং খেতেও সুস্বাদু। ইউএসএআইডি-অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্পের সহায়তায় ২০১৪ সালে খুলনার পাইকগাছায় অবস্থিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট গোল্ড স্পট মুলেট (*Liza parsia*, যা পার্সে নামে পরিচিত) এর কৃত্রিম প্রজনন করে। এ প্রজননের আওতায় ৯টি স্ত্রী মাছ হতে প্রায় ৬০০টি পোনা উৎপাদন সম্ভব হয়। এ বছরের জানুয়ারি মাসে আরেকটি অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন স্ট্রাইপ'ড মুলেট (*Mugil cephalus*) এর প্রথম কৃত্রিম প্রজনন করা হয়।

৪. তেলাপিয়া ব্রিডিং নিউক্লিয়াস প্রতিষ্ঠাকরণ
(Set up of Tilapia Breeding Nucleus- TBN)

তেলাপিয়ার উন্নত ব্রুডস্টক তৈরি ও সম্প্রসারণের জন্য ইউএসএআইডি-অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্প দু'টি 'তেলাপিয়া ব্রিডিং নিউক্লিয়াস (টিবিএন)' প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও মালয়েশিয়ার জিত্রা স্টেশন থেকে সংগৃহীত গিফ্‌ট (GIFT) স্ট্রেইনের ১৪তম জেনারেশন ব্যবহার করে এসব টিবিএন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। টিবিএন দু'টির একটি সরকারি মৎস্য খামার, বেজপাড়া, যশোর এবং আরেকটি জেনেটিক হ্যাচারি, নোয়াপাড়া, যশোর এলাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব টিবিএন-এ অধিক উৎপাদনশীল তেলাপিয়ার ব্রুডস্টক তৈরির জন্য সিলেকটিভ ব্রিডিং ও রোটেশনাল ব্রিডিং কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। এসব টিবিএন হতে উৎপাদিত ব্রুড তেলাপিয়া ইউএসএআইডি-অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্পের সহায়তাপুষ্ট তেলাপিয়া হ্যাচারিতে ব্রুড উন্নয়নের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে।

গত বছর এসব টিবিএন হতে ০.২৫ মিলিয়নেরও বেশি পোনা উৎপাদন করা হয়েছে। পরবর্তীতে দেখা গেছে এসব ব্রুডস্টক হতে উৎপাদিত পোনার বৃদ্ধির হার সাধারণ পোনা হতে ৩০% বেশি।

৫. গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন জোরদারকরণ
(Enhancement of PL production of freshwater prawn)

বিশ্ববাজারে গলদা চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ২০০০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে গলদা চিংড়ির চাষ দ্রুত বাড়তে থাকে এবং চাষ ক্ষেত্র দ্রুত বৃদ্ধির কারণে চাহিদার বিপরীতে গলদা চিংড়ি পোনার যোগান কমতে থাকে। UNIDO-BEST (২০১২) প্রজেক্টের হিসাবে দেশে মোট গলদার ঘের সংখ্যা ১,৭৯,০০০টি এবং মোট চাষ ক্ষেত্র প্রায় ৬০,০০০ হেক্টর। Winrock International (২০০৭-২০০৮)-এর জরিপ মতে বাংলাদেশে প্রতিবছর গলদা পোনার মোট চাহিদা প্রায় ১০০ কোটির উপরে।

ইউএসএআইডি-অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্পটি ২০১৩ সাল থেকে ছোট পরিসরে গলদা হ্যাচারি নিয়ে কাজ করছে। উক্ত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো সফলভাবে পোনা উৎপাদনের পাশাপাশি দক্ষ জনবল তৈরি করা; যাতে হ্যাচারিগুলোতে পোনা উৎপাদন ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং পর্যায়ক্রমে তা আরও বৃদ্ধি পায়। প্রকল্পটির ২টি পার্টনার হ্যাচারিতে উন্নতমানের উপকরণ ব্যবহারের

পাশাপাশি বিদেশি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও পদ্ধতি অনুসরণ করে আশানুরূপ পোনা উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেক ব্যবহার করেও ২টি হ্যাচারিতে প্রায় ৮ মিলিয়ন পিএল উৎপাদিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্পটি হ্যাচারি মালিক, হ্যাচারি টেকনিশিয়ান ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বরিশাল ও খুলনাতে ২টি অভিজ্ঞতা বিনিময় সভার আয়োজন করে। একই বছর ১৭টি হ্যাচারির ২৫ জন মালিক ও টেকনিশিয়ান নিয়ে সপ্তাহব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

২০১৪ সালে অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্প ৫টি হ্যাচারির সাথে কাজ করে এবং কিছু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ১টি চক্র থেকে প্রায় ১০ মিলিয়ন বা এক কোটি পিএল উৎপাদিত হয়। পরবর্তীতে ১৫টি হ্যাচারির ২২ জন মালিক ও টেকনিশিয়ানের জন্য দুই দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

২০১৫ সালে গলদা হ্যাচারির চলমান সমস্যা খতিয়ে দেখার জন্য থাইল্যান্ড থেকে একজন বিশেষজ্ঞ আনা হয় যিনি হ্যাচারির চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি হ্যাচারিতে ব্যবহৃত পানি ও লার্ভার বিভিন্ন পর্যায়ের নমুনা সংগ্রহ করে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করেন। তবে এ চলমান সমস্যার প্রকৃত কারণসমূহ চিহ্নিত করে গলদা হ্যাচারিগুলোকে সাফল্যজনকভাবে উৎপাদনে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ। এক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে এবং ওয়ার্ল্ডফিসসহ অন্যান্য সংস্থা সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. পিসিআর টেস্টের মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত বাগদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন (Virus free shrimp PL production through PCR test)

বাগদা চিংড়ি চাষে রোগ একটি মারাত্মক সমস্যা, বিশেষ করে হোয়াইট স্পট ডিজিজ। এর ফলে চিংড়ি চাষিগণ ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। বাগদা চিংড়ি চাষিদের এ ক্ষতি হ্রাস করার জন্য ইউএসএআইডি-অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্পটি কাজ করছে। ভাইরাসমুক্ত চিংড়ির পোনা সরবরাহের জন্য প্রকল্পটি কক্সবাজার এলাকায় বর্তমানে ২০টি বাগদা চিংড়ি হ্যাচারির সাথে কাজ করছে। এসব হ্যাচারিতে পিসিআর (PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত ব্রুড চিংড়ি নির্বাচন ও প্রজনন করানো হয়। এর জন্য কক্সবাজারে প্রকল্পটি একটি পিসিআর টেস্টিং ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেছে। পাশাপাশি সকল হ্যাচারি টেকনিশিয়ান, মৎস্য বিভাগ ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

এ পিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমে চিংড়ির রোগ সৃষ্টিকারী ৮ প্রজাতির ভাইরাস এবং ২ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

বিগত ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে পিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমে যথাক্রমে ১৭৯ মিলিয়ন, ১৮০.৩৪ মিলিয়ন ও ৭৫০ মিলিয়ন হোয়াইট স্পট ডিজিজ (WSSV) ভাইরাসমুক্ত বাগদা চিংড়ির পোনা চিংড়ি চাষিদের মাঝে সরবরাহ করা হয়। এসব ভাইরাসমুক্ত চিংড়ির পোনা উৎপাদন মনিটরিং করা হয়। দেখা যায়, এসব ভাইরাসমুক্ত চিংড়ির পোনা হতে উৎপাদন ২৭০ কেজি/হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০২ কেজি/হেক্টর এ উন্নীত হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রদর্শনী পুকুরে এ উৎপাদন আরও বেশি (৬১৭কেজি/হেক্টর)।

উপসংহার (Conclusion)

মাছ ও চিংড়ি পোনার গুণগত মান উন্নত করার জন্য উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো ইউএসএআইডি-অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্পের মহতী উদ্যোগ। উক্ত কার্যক্রমসমূহের বিশেষ করে মুলেট ও শীলা কাঁকড়ার কৃত্রিম প্রজননের ব্যাপক সফলতা পাবার জন্য এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরও গবেষণা প্রয়োজন। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং প্রাইভেট সেক্টরকে এগিয়ে আসতে হবে।

[১]সমন্বয়কারী, ত্রেল প্রকল্প, ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ
[২]প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইউএসএআইডি-অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্প, ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ
[৩]চীফ অব পার্টি, ইউএসএআইডি-অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্প, ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ

বিএফএফই পরিচালিত 'চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্প' : বাগদা চিংড়ি উৎপাদনে একটি সাফল্য
BFFEA Pilot Project on Awareness of Shrimp Production : Success in Shrimp Production

এস এম মোরশেদ জাফর

Abstract

Shrimp is an agro-product of our economy, that has a lot of potentials. About five million people are involved in this sector. In the year 1972 the country had USD 24 million in export earnings from the sector. During last financial year (2013-2014) the country earned about 500 crore taka through exporting shrimps and fish. There are about 0.7 million acres of shrimp cultivable land in Bangladesh, from which the country produces about 135000 MT shrimps yearly, ie, about 140 kg per acre. On the other hand our competitors in the global market like Vietnam, Thailand and India produce more than 3000 kg shrimps per acre. A very traditional/conventional way of shrimp culture has put the country at the bottom of the list. Presently the processing capacity of our factories is about four lac metric tons. Due to this acute infirmity in the shrimp production, about 80 percent of the capacity of the factories remains unutilized. As a result most of them have become sick and some are bankrupt. The only way to come out of this situation is through increased production of shrimps and it can only be achieved by introducing scientific culture known as the semi-intensive method, in a large scale. If the Government owned shrimp culture zone at Chakaria having 7000 acre of land in 10 and 11 acre plots, can bring under scientific culture, the fish processing factories of Chittagong zone shall be able to fulfill the procurementr demand. On the other hand Government intension of creating that specific zone shall also be materialized.

দেশে গতানুগতিক পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে। নব্বই দশকের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর গত কয়েক বছর ধরে খুলনা, সাতক্ষীরা ও কক্সবাজারে ব্যক্তিগত উদ্যোগে খুবই সীমিত আকারে বদ্ধ পানিতে আধানিবিড় পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ির চাষ আবার শুরু হয়েছে। বিভিন্ন কারণে এ চাষ পদ্ধতি সাধারণ চিংড়ি চাষিদের তেমন আকৃষ্ট করতে পারেনি। গতানুগতিক কর্মধারার বাইরে এসে বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ) ২০১৪ সালে কক্সবাজারের খুরুসকুল এলাকায় ৫.২৫ একর জমি লীজ নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ প্রকল্প শুরু করে। প্রকল্পটির নাম দেয়া হয়েছে- 'চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধকরণ প্রদর্শনী প্রকল্প (PPASP)'। মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় উক্ত প্রকল্পে গত বছর মার্চ মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে চিংড়ির পোনা অবমুক্ত করেন।

দেশে যেখানে বাগদা চিংড়ির গড় উৎপাদন একর প্রতি ১৪০ কেজি, সেখানে এ প্রকল্পে ২০১৪ সালে দুটি ফসলে (crop) একর প্রতি উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৩৩০০ কেজি। চলতি বছরের মার্চ মাসে আবার প্রকল্পে পোনা মজুদ হয়েছে। পিসিআর ল্যাব পরীক্ষিত ভাইরাসমুক্ত পোনার দুস্প্রাপ্যতার কারণে এ বছর প্রকল্পে দু'টির স্থলে একটি ফসলে বাগদা চাষ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার বাগদা চিংড়ি চাষিদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে প্রকল্পটি পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আশা করা যায়, এ প্রকল্পটির সূত্র ধরে অচিরেই কক্সবাজার অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ ব্যাপক হারে সম্প্রসারিত হবে, বিশেষ করে চকরিয়ার সরকারি চিংড়ি জোনে। এজন্য দরকার অবকাঠামো উন্নয়ন, সরকারি প্রণোদনা, দিকনির্দেশনা, নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় পুঁজির সংস্থান।

দেশে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বর্তমান অন্তরায়সমূহ

- আধানিবিড় (semi-Intensive) কিংবা উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে (improved traditional) চিংড়ি চাষ না করে গতানুগতিক (traditional) পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা;
- উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক জোয়ার-ভাটা নির্ভর জীবাণুযুক্ত পানিতে চিংড়ি চাষ;
- চিংড়ি ঘেরের পানির অপ্রতুল গভীরতা;
- ঘেরের পানিকে জীবাণুমুক্ত না করা;
- চাষে জীবাণুমুক্ত পোনা ব্যবহার না করা;
- মানসম্পন্ন চিংড়ি খাদ্য ব্যবহার না করা;
- বায়ো-সিকিউরিটি-এর ব্যবস্থা না করা; এবং
- ঘেরে উপযুক্ত অবকাঠামো ও নিরাপত্তার অভাব।

বিএফএফইএ পরিচালিত প্রদর্শনী প্রকল্পে গৃহীত চাষ ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্ত ফলাফল

বিএফএফইএ পরিচালিত প্রদর্শনী প্রকল্পে গৃহীত চাষ ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

- প্রকল্পের মোট আয়তন: ৫.২৫ একর
- চাষের চারটি পুকুরের জলায়তন: ৩.৮৬ একর
- পোনা মজুদের ঘনত্ব (পিস/বর্গ মি.):
  - আধানিবিড়: ১৬-১৮
  - উন্নত সনাতন: ০৭
- পোনা বাঁচার হার: ৮৮%
- চাষের সময়কাল: ১২০ - ১৩০ দিন
- চিংড়ির গড় ওজন: ৩৫ গ্রাম
- দুটি ফসলে মোট উৎপাদন: ১২,৬০০ কেজি

বদ্ধ পুকুরে উন্নত সনাতন ও আধানিবিড় পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষের এ সাফল্যের জন্য যেসব বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

পুকুর প্রস্তুতকরণ

- প্রতিটি পুকুর আয়তাকার এবং এক একরের মধ্যে।
- প্রথমে পুকুরের পানি সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশন এবং পুকুরের সঙ্গে সংযুক্ত সকল পানির প্রবেশ পথ ও নির্গমন পথ বন্ধ করা।
- তলা থেকে পাড়ের উপরিভাগ পর্যন্ত পুকুরের গভীরতা ৭ ফুট পর্যন্ত রাখা।
- পুকুরের তলার মাটি রোদে ফেটে না যাওয়া পর্যন্ত শুকানো।
- পুকুরের পাড়, তলা ও পাড়ের স্লোপ ভালভাবে ড্রেসিং করা।

প্রকল্পের বেষ্টনি (বেড়া)

- পুকুর তৈরির কাজ শেষে পুকুরের চারদিকে কাঁটা তারের নিরাপত্তা বেষ্টনি তৈরি এবং পুকুরের চারপাশে শক্ত ঘন নাইলন নেট দিয়ে এমনভাবে বেষ্টনি তৈরি, যাতে বাইরে থেকে কোনো প্রকার জীবাণুবহনকারী প্রাণী (কাঁকড়া, সাপ, ইঁদুর ইত্যাদি) প্রকল্পে প্রবেশ করতে না পারে।
- প্রকল্পের ওপর বার্ড ফেন্সিং-এর ব্যবস্থাসহ প্রকল্পটিকে একটি বায়ো-সিকিউরিটি'র আওতায় নিয়ে আসা।

পানি প্রস্তুতকরণ

- উন্নত সনাতন ও আধানিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের প্রয়োজনে পাঁচটি পুকুরের চারটিতে চাষের ব্যবস্থা এবং একটি পুকুরকে রিজার্ভার হিসেবে রাখা।
- পুকুর প্রস্তুতির সকল কার্য সম্পাদনের পর জোয়ারের পরিষ্কার পানি ঘন ফিল্টার নেটের মাধ্যমে পুকুরে ঢুকানো।
- পুকুরে পানি ঢুকানোর পূর্বে প্যাডেল হুইল অ্যারেটর, ফিডিং প্লাটফর্ম, ফিডিং রোপ ইত্যাদি স্থাপনের কাজ সম্পন্নকরণ। অতঃপর ১.৫ মিটার গভীরতায় পানি ঢুকানোর ৭২ ঘণ্টা পরে পানি জীবাণুমুক্ত করার জন্য ৬০-৬৫ পিপিএম মাত্রায় ব্লিচিং পাউডার ভালোভাবে গুলিয়ে পানিতে প্রয়োগ।
- ক্লোরিনেশনের সময় সবক'টি প্যাডেল হুইল চালু রেখে ব্লিচিং ভালোভাবে পানির সঙ্গে মিশিয়ে পানিকে জীবাণুমুক্তকরণ।
- কাঁকড়ার গর্ত, পুকুরের পাড়, স্লোপ ইত্যাদিতে জীবাণুনাশক ব্যবহার, যাতে করে কাঁকড়া, সাপ, কুচিয়া ইত্যাদি মরে যায়।
- ক্লোরিনেশনের পর থেকে চিংড়ি প্রকল্পের বেষ্টনির ভেতরের এলাকা জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ব্যবহার।
- বেষ্টনির প্রবেশ পথে একটি জীবাণুনাশক পানির পাত্র রাখা, যাতে করে বাইরের কেউ প্রকল্পে ঢুকার সময় হাত-পা জীবাণুমুক্ত করে প্রবেশ করতে পারে।
- পোনা মজুদের পূর্বে পানিতে প্রয়োজনীয় প্ল্যাংকটন উৎপাদনের জন্য ফার্মেন্টেড রাইসব্র্যান, ঝোলা গুড়, ইস্ট পাউডার ইত্যাদির নির্যাস ব্যবহার। এছাড়া প্ল্যাংকটন উৎপাদনের সহায়ক হিসেবে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক এবং উপকারী ব্যাকটেরিয়া উৎপাদনের জন্য প্রোবায়োটিক ব্যবহার।
- পানিতে প্ল্যাংকটন উৎপাদন ও পানির অন্যান্য গুণাগুণ পরিমিত পর্যায়ে আসার পর পোনা মজুদকরণ।

পোনা নির্বাচন ও মজুদকরণ

- ওয়ান মাদার-ওয়ান ট্যাংকে উৎপাদিত পিসিআর ল্যাব দ্বারা পরীক্ষিত ভাইরাসমুক্ত (negative) পোনা পুকুরে মজুদ করা হয়। প্রতি বর্গ মিটারে উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে ৭টি ও আধানিবিড় পদ্ধতিতে ১৬-১৮টি পোনা মজুদ করা হয়।
- পুকুরের পানির লবণাক্ততা, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, ক্ষারত্ব ইত্যাদি অনুকূল পর্যায়ে আছে কিনা, পোনা ছাড়ার পূর্বেই তা নিশ্চিতকরণ। পোনা ছাড়ার সময় পোনাকে পুকুরের পানির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়া।
- পোনার প্রাথমিক বাঁচার হার জানার জন্য প্রতিটি পুকুরে স্থাপিত হাপার মধ্যে কমপক্ষে ১০০টি পোনা ৭২ ঘণ্টা রেখে পোনার প্রাথমিক বাঁচার হার নির্ণয়।

পুকুরে পানির ব্যবস্থাপনা

- চিংড়ির বৃদ্ধি ও চিংড়ির বাঁচার ভালো হার লাভের জন্য পুকুরের পানির পিএইচ, অক্সিজেন, ক্ষারত্ব, পানির গভীরতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় মাত্রায় রাখার জন্য অ্যারেটর ও উপযোগী কেমিক্যাল ও প্রোবায়োটিকের পরিমিত ব্যবহার।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

- খাদ্য ব্যবস্থাপনা চিংড়ি চাষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনায় রেখে মানসম্পন্ন চিংড়ি খাদ্যের পরিমিত ব্যবহার।
- লিফট নেট দিয়ে চিংড়ির খাদ্য গ্রহণ ও স্বাস্থ্য নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা।

চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি ও আহরণ

- প্রতি ৭ দিন পরপর চিংড়ির ওজন নিয়ে সঠিক দৈহিক বৃদ্ধি পরীক্ষা করা এবং ওজন অনুযায়ী খাদ্য প্রয়োগ।
- আহরণের জন্য পুকুরের পানি কমিয়ে ঝাঁকি ও টানা জালের ব্যবহার, অতঃপর পানি পাম্প করে পুকুর সম্পূর্ণ শুকিয়ে চিংড়ি ধরা।

উপসংহার (Conclusion)

সনাতন বা গতানুগতিক পদ্ধতির বিপরীতে উন্নত সনাতন পদ্ধতি অবলম্বনে চিংড়ির ফলন বাড়ে ছয় গুণের বেশি এবং আধানিবিড় পদ্ধতি অবলম্বনে বাড়ে ১৪ গুণেরও অধিক। বর্তমানে দেশে চিংড়ির চাষ উপযোগী প্রায় ৭ লক্ষ একরের মত জমির মধ্যে যদি ৩০% জমিতে আধানিবিড় পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়, তাহলে বছরে ৪,২০,০০০ মে.টন চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব হবে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৩০,০০০ কোটি টাকা। বর্তমানে যেখানে গড়ে বছরে মাত্র ৫৫ হাজার মে.টন চিংড়ি (finished products) রপ্তানি করা হচ্ছে, তা প্রায় সাত গুণের অধিক বৃদ্ধি করা সম্ভব। সে অনুযায়ী রপ্তানি আয়ও বর্তমানের ৬৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫০০ মিলিয়ন (৪.৫ বিলিয়ন) মার্কিন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব।

সচিব, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন

মৎস্য প্রজাতি শনাক্তকরণে ডিএনএ বারকোডিং প্রদ্ধতির প্রয়োগ
Application of DNA Barcoding in Fish Species Identification

ওয়াহিদা হক[১], পূজা বৈদ্য[২] ও শংকর চন্দ্র মন্ডল[৩]

Abstract

Bangladesh is affluent with more than 800 freshwater and marine fish, shrimp and prawn species. The taxonomic identification of these species are mainly based on traditional morphometric and meristic characters. But due to the vast diversity and similar morphological appearance accurate identification becomes very much difficult. This taxonomic problem can be reduced to a greater extent through molecular technique. DNA barcoding is the molecular technique that can easily, rapidly and accurately identify the species. The partial sequence of COI (Cytochrome Oxidase subunit I) gene is analyzed for species identification and phylogenetic relationship determination. DNA barcoding technique involves several steps such as tissue collection, DNA extraction from tissue sample, amplification of target portion of DNA (COI) by PCR, DNA quantification and qualitative analysis, sequencing of amplified portion of DNA, submission of sequence to the database at Barcode of Life Data System or GenBank. The highest percent pairwise identity of the consensus sequence from each species blasted against NCBI (National Center for Biotechnlogy Information) are compared to the percent specimen similarity scores of the consensus sequence from each species within the BOLD (Barcode of Life Data) Identification System. For sequence comparisons, pairwise genetic distances is quantified based on the Kimura 2-parameter (K2P) distance model using MEGA software. A Maximum Parsimony (MP) tree using Close-Neighbour-Interchange algorithm is constructed to display a graphical view of the species. Partial sequences of the COI gene can efficiently identify the species of fish and shellfish in Bangladesh, indicating the usefulness of mtDNA-based approach in species identification.

ডিএনএ বারকোডিং-এর ইতিহাস
(History of DNA barcoding)

ডিএনএ বারকোড হলো একটি ডিএনএ সিক্যুয়েন্স যা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি প্রজাতিকে শনাক্ত করতে পারে। আর এটি প্রজাতি শনাক্ত করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড। ২০০৩ সালে কানাডার University of Guelph-এর গবেষক Paul Hebert ও তাঁর দল 'Biological Identification Through DNA Barcodes' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এরপর থেকে ডিএনএ বারকোডিং বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সঠিক ও দ্রুত প্রজাতি শনাক্তকরণ বিষয়টি শ্রেণিবিন্যাসবিদ, জীনবিজ্ঞানী এবং বিবর্তনীয় বিজ্ঞানীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পরবর্তীতে ২০০৪ সালে ডিএনএ বারকোডিং সম্পর্কিত দু'টি গবেষণামূলক কর্মশালা এবং পরের বছর লন্ডনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২০০৭ সালের জুন মাসে United Nations of Barcoding গঠনের উদ্দেশ্যে ২৫টি দেশের প্রতিনিধি Guelph ভ্রমণ করেন। বহুকোষীয় জীবদের জন্য 'DNA Barcode Reference Library' গঠন করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। সম্মেলনের আলোচনার প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক ছিল এবং গবেষকদের তত্ত্বাবধান ও তহবিল গঠনের লক্ষ্যে প্রতিটি দেশে একটি করে কমিটি গঠনের প্রচেষ্টা শুরু করা হয়। অতঃপর এর দ্রুতই অগ্রগতি হয় এবং ২০০৯ সালের জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক বারকোড অব লাইফ (iBOL) প্রকল্পের প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও গবেষণা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। ২০১০ সালের অক্টোবরে iBOL-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

মৎস্যক্ষেত্রে ডিএনএ বারকোডিং পদ্ধতির প্রয়োগ
(Application of DNA barcoding in fisheries)

মাছ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্যময়। পৃথিবীতে ৩০ হাজারের বেশি মৎস্য প্রজাতি আছে। তাদের উচ্চ বৈচিত্র্যময়তা এবং জীবনচক্রের গভীর পরিবর্তনের কারণে প্রজাতি শনাক্তকরণ খুবই কষ্টসাধ্য।

সাধারণত মাছের বাহ্যিক আকৃতি যেমন- শরীরের আকার, রং এর ধরন, আঁইশের আকার, প্রকার ও সংখ্যা, পাখনার আপেক্ষিক অবস্থান ও অন্যান্য আপেক্ষিক পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে মাছের প্রজাতি শনাক্ত করা হয়। মাছের ফুলকা র‍্যাকারের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ মাছের প্রজাতি আলাদা করা হয়। মাছের অনেক প্রজাতি আছে যেগুলো খুবই কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং বাহ্যিকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন সামুদ্রিক ক্যাটফিস, মিঠাপানির পুঁটি, ট্যাংরা মাছের অনেক প্রজাতি খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে গতানুগতিক পদ্ধতিতে শনাক্তকরণে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাছাড়া অনেক সময় মাছের বাহ্যিক অঙ্গসমূহ প্রক্রিয়াজাতকালীন বা সংরক্ষণের সময় নষ্ট হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে প্রজাতি শনাক্ত করা যায় না। এছাড়া মাছের লার্ভা অবস্থায় বাহ্যিক অস্পষ্টতার কারণে চিরাচরিত নিয়মে শনাক্তকরণ কষ্টসাপেক্ষ এবং সময়সাপেক্ষ। এসব সমস্যা সমাধানে ডিএনএ বারকোডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ডিএনএ বারকোডিং-এর মূলনীতি
(Principles of DNA barcoding)

১৯৫৩ সালে ওয়াটসন ও ক্রিক ডিএনএ-এর আণবিক গঠন আবিষ্কারের পর থেকেই বস্তুত আণবিক বংশগতিবিদ্যার যুগ শুরু হয়। জীবদেহের জীন সকল জীবতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের নীলনকশা এবং উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবসমূহের বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী। আর তাই কোনো জীবে জীনসমূহ হলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও একক সমন্বয়। কোনো জীবের সকল জেনেটিক ইনফরমেশনকে একসঙ্গে জিনোম বলে। ডিএনএ বারকোডিং জিনোমের সবচেয়ে পরিবর্তনশীল ছোট একটি অংশের ওপর

নির্ভর করে। প্রাণীদের ক্ষেত্রে কোষের মাইটোকন্ড্রিয়াল সিক্যুয়েন্সগুলো পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (পিসিআর)-এর মাধ্যমে সহজেই অ্যামপ্লিফাই করা যায়। এমনকি ক্ষুদ্র বা নষ্ট হওয়া নমুনা থেকে কোষ নিয়েও তা অ্যামপ্লিফাই করা যায়। মাইটোকন্ড্রিয়াল কোষের Cytochrome Oxidase subunit I (COI) জীন প্রাণীদের বারকোডিং-এ ব্যবহৃত হয়। দেখতে একই রকম প্রাণীদের পৃথক করতে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ এর উপযোগিতা গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত। মাইটোকন্ড্রিয়াল প্রোটিন কোডিং জীনে সাধারণত রাইবোজোমাল জীনের তুলনায় বেশি পার্থক্য বিদ্যমান থাকে যা সাদৃশ্যপূর্ণ প্রজাতিকে সহজেই আলাদা করতে বা শনাক্ত করতে পারে। চিত্রে মাইটোকন্ড্রিয়াল কোষে COI জীনের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

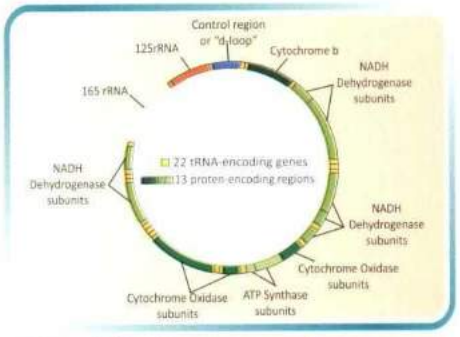

চিত্র: মাইটোকন্ড্রিয়া কোষে COI জীনের অবস্থান

মাছের ডিএনএ বারকোডিং পদ্ধতি (DNA barcoding process of fish)

মাছের বারকোডিং-এর জন্য নিম্নলিখিত ধাপ অনুসরণ করা হয়:

নমুনা সংগ্রহ: যে মাছের বারকোডিং করতে হবে সেই মাছের নমুনা সংগ্রহ করে তার একটি রঙিন ও উচ্চ রেজ্যুলেশন সম্পন্ন ছবি তুলতে হবে। এরপর বিভিন্ন মরফোমেট্রিক ও মেরিস্টিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে প্রাথমিকভাবে মাছটি শনাক্ত করা হয়।

টিস্যু সংগ্রহ ও ডিএনএ এক্সট্রাকশন: মাছের টিস্যু, আঁইশ বা পাখনা থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করা যেতে পারে। টিস্যু, আঁইশ বা পাখনা অ্যাসেপটিক্যালি সংগ্রহ করে -২০° সে তাপমাত্রায় বা ১০০% অ্যালকোহলে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যেতে পারে। সংরক্ষিত নমুনা থেকে লাইসিস পদ্ধতিতে লাইসিস বাফার ব্যবহার করে ডিএনএ এক্সট্রাকশন করা হয়।

পিসিআর অ্যামপ্লিফিকেশন: মাইটোকন্ড্রিয়াল সিওআই জীন এর ৫' প্রান্তকে অ্যামপ্লিফাই করার করার জন্য উপযুক্ত প্রাইমার ব্যবহার করা হয়। সাধারণত fishfi (TCAACCAACCACAAAGACATTGGCAC) এবং fishr1 (TAGACTTCTGGGTGGCCAAAGAATCA) প্রাইমার ব্যবহার করা হয়। এ প্রাইমার দ্বারা সাধারণত ৬৫০ বিপি থেকে ৭৫০ বিপি পর্যন্ত অ্যামপ্লিফাই করা হয়। পিসিআর পদ্ধতিতে সঠিকভাবে ডিএনএ অ্যামপ্লিফাই হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য পিসিআর দ্রব্যটি ১% অ্যাগারোজ জেল-এ ইলেকট্রোফোরেসিস ১০% ইথিডিয়াম ব্রোমাইডসমৃদ্ধ করা হয় এবং ইউ ভি-ভিজ্যুয়ালাইজারে দেখা হয়। অ্যামপ্লিফাইকৃত পিসিআর দ্রব্যে অন্য কোনো অপ্রত্যাশিত পদার্থ থাকলে তা Exo-SAP পদ্ধতিতে দূর করে পিসিআর দ্রব্যটি পরিশুদ্ধ করা হয়। পরিশোধিত পিসিআর দ্রব্যটি BigDyeTerminator V.301 Cycle sequencing kit ব্যবহার করে লেভেল করা হয়। পরবর্তীতে Sequence-PCR দ্রব্যটি Ethanol/EDTA Precipitation পদ্ধতিতে পরিশোধন করা হয়।

সিক্যুয়েন্সগুলো DNASTER Lasergene SeqMan V. ৭.০ সফটওয়্যার ব্যবহার করে ম্যানুয়ালি অ্যাসেম্বল করা হয়। অতঃপর অ্যাসেম্বলকৃত সিক্যুয়েন্সগুলো FASTA ফরম্যাটে রূপান্তর করা হয়। পরবর্তীতে FASTA ফরম্যাটের সিক্যুয়েন্সগুলো BOLD অথবা GenBank-এ নিউক্লিয়োটাইড ডাটাবেইজে BLAST করা হয়। এ নিউক্লিয়োটাইড জাজ এভাবে সর্বোচ্চ হোমোলগ নির্ণয় করে প্রজাতি নির্ধারণ করা হয়। নির্ণয়কৃত প্রজাতিগুলোর মধ্যে জীনগত সাদৃশ্য ও নিউক্লিয়োটাইড দূরত্ব MEGA V ৫.০ বা ৬.০ সফটওয়্যার ব্যবহার করে নির্ণয় করা হয়। এছাড়া এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে সিক্যুয়েন্সগুলোর ফাইলোজেনেটিক ট্রি গঠন করা হয়।

বাংলাদেশে ডিএনএ বারকোডিং পদ্ধতি প্রয়োগের সূচনা (Application of DNA barcoding in Bangladesh)

ডিএনএ বারকোডিং পদ্ধতি প্রথম প্রয়োগ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. বদরুল আমিন ভূইঁয়া। তিনি ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে ইউএসডিএ-এর অর্থায়নে প্রথম ইনসেক্ট-এর শনাক্তকরণে বারকোডিং পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তিনি Agromyzidae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত *Liriomyza sativae* ইনসেক্ট শনাক্ত করে ২০১১ সালে জার্নালে প্রকাশ করেন যা বাংলাদেশে ডিএনএ বারকোডিং-এর প্রথম প্রয়োগ।

পরবর্তীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন চট্টগ্রাম ভেটেরেনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রাণী যেমন ইনসেক্ট, মৎস্য প্রজাতির ডিএনএ বারকোডিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে শনাক্ত করা হয়। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তত্ত্বাবধানে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে HEQEP-এর আওতায় বাংলাদেশের মৎস্য প্রজাতি শনাক্তকরণে ডিএনএ বারকোডিং পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগে ডিএনএ বারকোডিং পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য প্রজাতির শনাক্তকরণে একাধিক প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে বেশ কিছু মৎস্য প্রজাতি ডিএনএ বারকোডিং পদ্ধতিতে শনাক্ত করা হয়েছে। অধ্যাপক ড. বদরুল আমিনের তথ্য মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫টি কলেজ এবং ৪টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শতাধিক গবেষক ডিএনএ বারকোডিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে 'বাংলাদেশ বারকোড অব লাইফ ফোরাম' গঠন করা হয়েছে যা দেশের বারকোডিং বিষয়ক গবেষণা প্রকাশ করে থাকে। অদূর ভবিষ্যতে এ পদ্ধতি আরো ব্যাপকতা লাভ করবে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

[১]সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারপারসন, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
[২]শিক্ষার্থী, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
[৩]সহকারী অধ্যাপক, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইউএসএআইডি-অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্প ঃ মৎস্যচাষে স্থানীয় সেবাদানকারীদের ভূমিকা

USAID - Aquaculture for Income and Nutrition Project : Role of Local Service Providers in Aquaculture

মোঃ মাহবুবুল ইসলাম,[১] Hendrik Jan Keus[২] ও মোঃ জাকির হোসেন[৩]

Abstract

The 'Local Service Providers' (LSP) has very important and dynamic role in aquaculture. LSPs are responsible for ensuring efficient delivery of the new systems and services, and carry out community's requirements in a sustainable manner. It can be mentioned that LSPs are playing silence revolutionary role on increasing fish production in Bangladesh. Considering the importance of LSPs in aquaculture, USAID supported Aquaculture for Income and Nutrition (AIN) project is being implemented with the goal of "Increasing Aquaculture productivity and improving nutritional status" in the South-west part of Bangladesh since 2011. LSPs are mostly related with different producer groups mainly include agriculture, aquaculture, livestock etc. in the local rural communities. It acts in cooperation and partnership with the producers, private companies, local enterprises and other line agencies. With field operation experiences, it is decided to undertake a program with LSPs to establish liaison between farmers and different types of private input producing companies; focusing on the areas of scientific knowledge-based services, capacity building and develop trust-worthy sustainable relation between service recipients farmers and LSPs. In this process related government departments (DoF and others) have been closely working in partnership, to continue the initiatives beyond the project implementation phase. Many LSPs are identified related with aquaculture value chain actors, initially AIN has given emphasize to work with 5 of them: Nurserers (carp and tilapia), hatchery owners (carp, tilapia, prawn and shrimp), fish feed traders; semi-auto fish feed millers, and shrimp depot holders. Capacity building in LSP program is a three stages trainings model: (i) Trainers' Pool (AIN and DoF staffs); (ii) Master Trainer (LSPs, EF and CF); (iii) Farmers. After receiving training from Trainers' pool, master trainers deliver trainings to farmers. It is planned to train and develop a total of 380 local service providers to delivery training to 10,240 farmers (510 batches) in 4 regions of AIN command area (Khulna, Jessore, Barisal and Faridpur). AIN has supported 124 hatcheries, 363 nurseries, 970 fry hawkers/patilwala, 62 semi-auto feed millers and 236 feed traders so far through providing better service delivery and better aquaculture practices. Improving access to quality seed produced by the hatcheries, a total of 991,536 farmers were able to increase their fish production, who had not received training from the project. AIN has been operating its activities through four components, in all the components LSPs has made an effective linkage in the supply chain, involving different aquaculture value chain actors. In the community the role of LSPs has been symbolizes as an assurance of quality, either it is fish seed, feed or shrimp PL. This confidence is important for sustainability and expansion of the business of respective LSPs.

ইউএসএআইডি - অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন (AIN) প্রকল্প মৎস্যচাষে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান উন্নয়ন (increasing aquaculture productivity and improving nutritional status)-এর লক্ষ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছে। AIN প্রকল্পে ৪টি কম্পোনেন্ট আছে। এছাড়াও প্রকল্পের রয়েছে বিভিন্ন ক্রসকাটিং বিষয় যার মধ্যে অন্যতম হলো লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) বা স্থানীয় সেবাদানকারী কার্যক্রম। অ্যাকোয়াকালচার ভ্যালু চেইন অ্যাক্টরে স্থানীয় সেবাদানকারীদের ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশে মৎস্যচাষ সম্পর্কিত প্রযুক্তি ও সম্প্রসারণে এরা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১১ সালে প্রকল্পের শুরু থেকেই ইউএসএআইডি-এআইএন প্রকল্প এলএসপির সাথে কাজ করে আসছে।

স্থানীয় সেবাদানকারীরা মূলত গ্রামের কৃষি, মৎস্যচাষ এবং প্রাণিসম্পদের সাথে জড়িতদের প্রত্যক্ষভাবে সেবা দিয়ে থাকে। এরা মূলত বিভিন্ন উৎপাদক দল (producer group), ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানি, স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় ও যৌথভাবে সেবা প্রদান করে থাকে। এলএসপিদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে দক্ষতার সাথে নতুন কোনো প্রযুক্তি বা সেবা চাষিদের চাহিদা মাফিক পৌছে দেয়া এবং ওই প্রযুক্তি টেকসই করার জন্য সহায়তা করা।

ইউএসএআইডি-এআইএন প্রকল্প পারিবারিক মৎস্যচাষ (কার্প ও তেলাপিয়া), বাণিজ্যিক মৎস্য ও চিংড়ি চাষের (কার্প/চিংড়ি) কারিগরি সহযোগিতা এবং গুণগত মানের বীজ উৎপাদনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চাষিদের সাথে কৃষি উপকরণ উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যোগসূত্র স্থাপনের জন্যই এলএসপি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক সেবা, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের সাথে সাথে চাষি ও এলএসপির মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য টেকসই সম্পর্ক গড়ে তোলাও অন্যতম উদ্দেশ্য। এলএসপির সমস্ত কার্যক্রম স্থানীয় সরকারি লাইন ডিপার্টমেন্ট (যেমন DoF এবং অন্যান্য)-এর নিবিড় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে যা প্রকল্প শেষেও চলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সমস্যা ও সম্ভাবনা (Problems and Prospects)

প্রকল্পের শুরুতেই মৎস্যখাতের বিভিন্ন সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও চাহিদা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এখাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ভ্যালুচেইন অ্যাক্টর যেমন চাষি, হ্যাচারি মালিক, নার্সারার, পোনা বিক্রেতা, ফিড ডিলারদের সাথে এআইএন প্রকল্প আলোচনা করেছে। মাঠ পর্যায়ের অ্যাক্টরদের সঙ্গে আলোচনায় মৎস্যখাতের অনেক ধরনের সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও স্থানীয় সেবাদানকারীদের সেবার চাহিদার ধরনসহ বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। প্রকল্প পরিকল্পনায় এসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়েছে।

চাষি, হ্যাচারি মালিক এবং নার্সারি মালিকের মতে, গুণগতমান সম্পন্ন খাবারের অভাব মৎস্যখাতের অন্যতম সমস্যা। হাতের কাছে বিকল্প না থাকায় তাদের বাজার থেকে চড়া দামে নিম্নমানের খাবার কিনতে হচ্ছে। অন্যদিকে খাদ্য বিক্রেতার মতে, বেশি চাহিদার সময় বাজারে খাদ্য সরবরাহ কম থাকে। এছাড়াও গুণগতমানের খাদ্যের বাজারমূল্য বেশি হবার কারণে চাহিদাও কম। খাদ্য বিক্রেতারা মনে করেন, গুণগতমানের খাদ্যের ব্যাপারে চাষিদের সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি খাদ্য বিক্রেতা ও চাষিদের মধ্যে যোগাযোগ আরো বাড়াতে হবে।

মৎস্য হ্যাচারি মালিকরা গুণগতমানের ব্রুড মাছের অভাব এবং উৎপাদিত রেণুর কম দাম অন্যতম সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছেন। এ সমস্যা সমাধানের জন্য তারা কারিগরি সহায়তার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে হ্যাচারি অ্যাসোসিয়েশন গঠনের মাধ্যমে এক সাথে সচেতনতামূলক কাজ করার প্রস্তাবনা দিয়েছেন। অন্যদিকে অসময়ে রেণু সরবরাহ করা এবং পোনা চুরি বড় সমস্যা বলে মনে করছেন নার্সারি মালিকরা। তারা এ বিষয়ে কারিগরি সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। পাতিলে পোনা পরিবহনকারীদের (পাতিলওয়ালা) মতে, নার্সারি থেকে নিম্নমানের পোনা সরবরাহ করার কারণে পোনার মৃত্যুহার অনেক বেশি হয়ে থাকে। কম খরচে কার্যকর পরিবহন প্রযুক্তির প্রয়োজন আছে বলে পাতিলওয়ালারা মনে করেন।

সময়মত প্রয়োজনীয় গুণগতমানের পোনা (মাছ ও চিংড়ির) হাতের কাছে পাওয়া যায় না বলে চাষিরা অভিমত দিয়েছেন। পাশাপাশি পলিব্যাগে সরবরাহকৃত পোনা সংখ্যায় কম পাওয়া যায় এবং পরিবহনের সময় অনেক পোনা মারা যায়। তারা মনে করেন, গুণগতমানের পোনা ও খাদ্য উৎপাদন, মাছ ও চিংড়ি চাষের উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং ক্রস ভিজিটের মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব। সংশ্লিষ্ট সকলেই বাকিতে মালামাল বা পোনা বিক্রয় এ সেক্টরের অন্যতম সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছেন ।

ইউএসএআইডি - এআইএন প্রকল্পে এলএসপি কার্যক্রম

শুরুর দিকে ইউএসএআইডি - এআইএন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক প্রচারণা অনুষ্ঠান ও চাষিদের সঙ্গে অন্যান্য অ্যাক্টরদের সম্পর্ক স্থাপনের কাজ খুবই ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসে। সংশ্লিষ্টদের দাবির প্রেক্ষিতে প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে এলএসপি কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা হাতে নেয়। মোটাদাগে অ্যাকোয়াকালচার ভ্যালু চেইন সংশ্লিষ্ট ৮ ধরনের এলএসপি চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন- কার্প ও তেলাপিয়া নার্সারার, পাতিলওয়ালা, সেমি-অটো ফিড মিল মালিক, মৎস্য খাদ্য ব্যবসায়ী, ডিপো মালিক, হ্যাচারি মালিক (কার্প, তেলাপিয়া, গলদা ও বাগদা), কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর (প্রকল্পের কৃষক দলের নেতা), সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন তথ্যকেন্দ্রসমূহ (এআইসিসি, ফিয়াক এবং ইউআইএসসির)। এদের মধ্যে এআইএন প্রকল্প প্রাথমিকভাবে ৫ ধরনের সেবাদানকারীদের সাথে কাজ শুরু করেছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সেবাদানকারীদেরও এ কার্যক্রমের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। ৫টি প্রধান ভ্যালু চেইন অ্যাক্টর হলো:

১. নার্সারার (কার্প ও তেলাপিয়া);
২. হ্যাচারি মালিক (কার্প, তেলাপিয়া, গলদা ও বাগদা);
৩. মৎস্য খাদ্য ব্যবসায়ী;
৪. সেমি-অটো ফিড মিল মালিক; এবং
৫. চিংড়ি ডিপো মালিক।

এলএসপি কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

এআইএন প্রকল্পের ভূমিকা

- কারিগরি ও বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক টিওটি প্রদান;
- এলএসপি সহায়ক প্রশিক্ষণ ও সহায়ক উপকরণ তৈরি;
- এলএসপি'র জন্য উপযোগী সচেতনতামূলক উপকরণ প্রস্তুত করা, পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া;
- যোগাযোগ সহায়ক উপকরণ তৈরি; এলএসপি'র ভূমিকা;
- কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি জ্ঞান প্রদান;
- কৃষকের জন্য মাঠ পর্যায়ে উন্নত ইনপুট নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কমিউনিটিতে সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক পরিধি ও আয়বৃদ্ধি; এবং
- সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতে সচেতনতা বৃদ্ধি ও যোগাযোগ স্থাপন।

এআইএন প্রকল্পের ৪টি প্রধান কর্মএলাকা থেকে মোট ৩৮০ জন স্থানীয় সেবা প্রদানকারীগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা হবে যারা স্থানীয় পর্যায়ে মোট ১০,২৪০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ সহায়তা দেবে।

প্রশিক্ষণ মডেল

স্থানীয় সেবা প্রদানকারীগণকে সক্ষমতা তৈরির কার্যক্রমটি একটি তিন স্তর বিশিষ্ট প্রশিক্ষণের নিম্নে মডেল চিত্রে উপস্থাপন করা হলো:

(১) প্রশিক্ষকদের পুল (এআইএন ও ডিওএফ স্টাফ); (২) মাস্টার প্রশিক্ষক (এলএসপি, ইএফ এবং সিএফ); (৩) কৃষকগণ। প্রশিক্ষকদের পুল হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মাস্টার প্রশিক্ষক কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

চিত্র: এআইএন প্রকল্পের তিন স্তরবিশিষ্ট এলএসপি প্রশিক্ষণ মডেল

এলএসপি কার্যক্রমে অন্যান্য কারিগরি সহায়তা

প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের অংশ হিসেবে এআইএন প্রকল্প হতে এলএসপিদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কারিগরি ও ইনপুট সম্পর্কিত সহায়তাগুলো নিম্নরূপ:

- ২০১৫ সালে ২০০ মৎস্য নার্সারি এআইএন প্রকল্প হতে সহায়তা পেয়েছে। পাশাপাশি অন্য ৩০০ নার্সারি ব্যবস্থাপনার ওপর কারিগরি, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে এআইএন প্রকল্পের সফল এলাকায় প্রদর্শনীমূলক ভিজিটের (cross visit) আয়োজন করা হবে।
- এআইএন প্রকল্প ও মিল মালিকদের মধ্যে ৫০% হারে অর্থ সাহায্যের ভিত্তিতে ৫০টি নতুন সেমি অটো ফিডমিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- প্রকল্প বিভিন্ন ধরনের ভ্যাল্যু চেইন অ্যাক্টরের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনীমূলক ভিজিটের আয়োজন করেছে। এ ভিজিটের মাধ্যমে ১২০ জন চাষি, নার্সারার, হ্যাচারি মালিক সমন্বিত মৎস্য ও চিংড়ি চাষ সম্পর্কে বাস্তব ধারণা নিতে পারবেন।

এলএসপি কার্যক্রমের মূল্যায়ন

এলএসপি কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট, ইমপ্যাক্ট অ্যানালাইসিস এবং মূল্যায়ন (evaluation) এর কাজটি করবেন প্রকল্পের এম অ্যান্ড ই টিম। চাষিদের ডাটাবেইজ থেকে স্যাম্পল নিয়ে তারা ৪টি ত্রৈমাসিক সার্ভে করবেন।

পাতিলওয়ালা ও কমিউনিটি ফ্যাসিলিটিটেটর-এর মাধ্যমে ১০০,০০০ চাষিদের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করে ২০১৫ সালের মধ্যে স্থানীয় সেবাদানকারীদের সহায়তা পেয়েছেন এমন চাষিদের ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে।

এলএসপি কার্যক্রমের ফলাফল

এখন পর্যন্ত এআইএন প্রকল্পের সহায়তায় ১২৪টি হ্যাচারি, ৩৬৩টি নার্সারি, ৯৭০ জন পাতিলওয়ালা, ৬২ জন সেমি অটো ফিড মিলার এবং ২৩৬ জন ফিড ট্রেডার উন্নত মৎস্যচাষের জন্য প্রযুক্তি ও সেবা দিয়ে আসছে। আর এসব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্থানীয় সেবাদানকারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পের সামগ্রিক ফলাফলের সঙ্গে স্থানীয় সেবাদানকারীদের ভূমিকা জড়িত থাকলেও নিচের বিষয়গুলোতে তা সুস্পষ্ট আকারে রয়েছে:

- ২০১৪ সালে ব্যক্তি মালিকানাধীন হ্যাচারিগুলোতে ৫৬ মে.টন উন্নত জাতের ব্রুড বিতরণ করা হয়েছে এবং এ ব্রুডের মাধ্যমে ৫১,৩৪০ কেজি পোনা উৎপাদিত হয়েছে। এ পোনার পুরোটাই কৃষকরা নার্সারি ও পাতিলওয়ালাদের মাধ্যমে কিনেছেন।
- প্রকল্পের সহায়তাপুষ্ট ৯৭০ জন পাতিলওয়ালার মধ্যে ২০১৫ সালে সেরা ৪০০ জনকে স্থানীয় সেবাদানকারী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। তারা প্রকল্পভুক্ত ও প্রকল্পের বাইরের চাষিদেরকে নার্সারি থেকে উন্নতমানের পোনা সরবরাহ করছে।
- প্রকল্পভুক্ত ৩৬৩ কার্প নার্সারির মধ্যে সেরা ২০০ জনকে পাতিলওয়ালাদের মাধ্যমে উন্নত পোনা সরবরাহের জন্য স্থানীয় সেবাদানকারী নির্বাচন করা হয়েছে।
- প্রকল্প থেকে কোনো প্রশিক্ষণ ব্যতীত কেবলমাত্র হ্যাচারি উৎপাদিত উন্নত পোনা ব্যবহারের মাধ্যমে ৯৯১,৫৩৬ জন কৃষক তাদের মাছের উৎপাদন বাড়িয়েছেন।
- ২০১৪ সালে প্রকল্পের সহায়তায় ১০টি সেমি অটো ফিডমিল স্থানীয়ভাবে সর্বমোট ১২০ মে.টন খাবার উৎপাদন করেছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে আরও ৫২টি ফিডমিল স্থাপন করা হয়েছে। কম দামে মানসম্মত খাবার উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রদর্শনীর জন্য এর মধ্যে ১৩টি ফিডমিলকে নির্বাচন করা হয়েছে।
- প্রকল্প সহায়তায় স্থাপিত পিসিআর ল্যাবের মাধ্যমে চিংড়ি হ্যাচারিগুলো ৯০২ মিলিয়ন ডব্লিউএসএস ভাইরাস মুক্ত চিংড়ি পোনা পরীক্ষা (পিসিআর পদ্ধতিতে) করিয়েছে। এ পোনা স্থানীয় সেবাদানকারীদের (পোনা ব্যবসায়ী) মাধ্যমে চিংড়ি চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

কার্যক্রমের শিখন ও পরবর্তী পদক্ষেপ

৪টি কম্পোনেন্টের মাধ্যমে এআইএন প্রকল্পটি এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর প্রতিটি অংশেই মাছচাষ সংশ্লিষ্ট সাপ্লাই চেইনে বিভিন্ন ভ্যালু চেইন অ্যাক্টরদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে এলএসপিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কমিউনিটিতে গুণগত মানসম্পন্ন মাছ বা চিংড়ি পোনা কিংবা মাছের খাদ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় সেবাদানকারীরা আস্থার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংশ্লিষ্ট এলএসপি'র টিকে থাকা ও ব্যবসার সম্প্রসারণের জন্য এ আস্থাটুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় এলএসপি কার্যক্রমের সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়টুকুতে বেশ কিছু প্রদর্শনীমূলক ভিজিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে অসংখ্য এলএসপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিষয়টি বিবেচনা করে এবং মাছ চাষ ভ্যালু চেইনে এদের অগ্রণী ভূমিকার কথা বিবেচনা করে এআইএন প্রকল্প বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের হ্যাচারি মালিক (তেলাপিয়া), নার্সারার (কার্প, তেলাপিয়া), পাতিলওয়ালা, মৎস্য খাদ্য ব্যবসায়ী/মিল মালিক, ডিপো মালিকদের সাথে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটি ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকলে, এটি এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় এলএসপিদেরকে নিয়ে আরও বড় পরিসরে সকল অ্যাক্টরকে সাথে নিয়ে কাজ করার বিষয়টি যুক্ত করবে, যা বাংলাদেশের মাছ চাষ সংশ্লিষ্ট খাতে একটি টেকসই পন্থা হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

[২]পোর্ট-ফোলিও কো-অর্ডিনেটর, ইউএসএআইডি-অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্প, ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ
[৩]চীফ অব পার্টি, ইউএসএআইডি-অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্প, ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ
[৪]প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইউএসএআইডি-অ্যাকোয়াকালচার ফর ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন প্রকল্প, ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ

ওয়ান মাদার ওয়ান ট্যাংক : WSS ভাইরাসমুক্ত পিএল উৎপাদনের একটি আদর্শ পদ্ধতি

One Mother One Tank : A Standard System for WSS Virus Free PL Production

সৈয়দ এম ইসতিয়াক[১], Aung Kyaw Mra[২] ও মোঃ মাহফুজ ইকবাল[৩]

Abstract

Outbreak of White Spot Syndrome Virus (WSSV) is one of the principal detriment in the farm and hatchery of tiger shrimp (Peneaus monodon). The deadly diseases destroys the entire crop in few days. Up till now, sixty one shrimp hatcheries of Bangladesh coast have heavily suffered from scarcity of WSSV negative shrimp brood and PL because all the brood collected from wild sources that is Bay of Bengal. Present hatchery infrastructure system offered owners to stock 40-50 broods (either WSSV positive or negative) into a brood maturation tank. Current hatchery system practices are greatly responsible for contamination of WSSV negative nauplii/PL by WSSV positive ones. But, the present hatchery structures are not as much as suitable to produce WSSV free PL even it wouldn't be cost effective. Considering all those things, The Zam Zam Hatchery, Kolatali, Cox's Bazar was selected to conduct this experiment for producing WSSV free PL. In October 2012, Zamzam Hatchery was constructed One Mother One Tank system to produce WSSV free PL. The system offered to use one population of WSSV negative brood/mother for single HT,ST,LT,NT, etc throughout the production period with provision to test WSSV by PCR machine after each production step.In four batches of experiments, 22-55% PCR test negative shrimp PL was found.

বিগত ২০১১-১২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৯২,৪৭৯ মে.টন মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রায় ৪,৭০৪ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে যার মধ্যে হিমায়িত চিংড়ির (গলদা ও বাগদা) পরিমাণ ৪৮,০০৭ মে.টন এবং আয়কৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৩,৬৪০ কেটি টাকা। রপ্তানিকৃত মৎস্যজাত পণ্যের মধ্যে প্রায় ৭৭% হিমায়িত চিংড়ির অবদান। প্রায় ৮.৩৩ লক্ষ চিংড়ি চাষি ২,৭৫,২৩২ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ করে থাকে যেখানে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৭১৩ কেজি (মৎস্য অধিদপ্তর ২০১৩)। বিগত ১৯৯৪ সাল থেকে চিংড়ি সেক্টর হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে বিশেষ করে বাগদা চিংড়ি (*Peneaus monodon*) উৎপাদন দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ৬১টি বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার প্রতিটিই ভাইরাসমুক্ত মা চিংড়ি (ব্রুড শ্রিম্প) প্রাপ্তির নিশ্চয়তা না পাওয়ার কারণে ভাইরাসমুক্ত পিএল উৎপাদন করতে পারছে না। এসব হ্যাচারির প্রায় প্রতিটিই পিএল উৎপাদনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বড় বড় আকারের (২৮ মে.টন) সিমেন্ট ট্যাংক ব্যবহার করে যার ধারণক্ষমতা প্রায় ৩০-৪০টি ব্রুড/৪০-৫০ লক্ষ পিএল। কোনো একটি ভাইরাস আক্রান্ত মা/পিএল ট্যাংকের সকল বংশধরদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। শুধু তাই নয়, এ ভাইরাস সুপ্ত অবস্থায় বাহিত হতে পারে এবং অনুকূল পরিবেশ সাপেক্ষে সম্পূর্ণ খামারের চিংড়ি ভাইরাস আক্রান্তের মাধ্যমে চাষির অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এসব সনাতন পদ্ধতির হ্যাচারির ব্রুড/পিএল বায়াস বা আন-বায়াস যে পদ্ধতিতেই পিসিআর পরীক্ষা করা হোক না কেন, হ্যাচারির সকল ব্রুড/পিএল ভাইরাসমুক্ত তা বলার কোনো অবকাশ নেই। গুণগতমানের ভাইরাসমুক্ত ব্রুড না পাওয়ার কারণে চিংড়ি শিল্প কাঙ্ক্ষিত হারে বিকশিত হতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১১ এর ধারা ৯(৪)-এর আওতায় হ্যাচারি সার্টিফিকেশন কার্যক্রমের অধীনে ২৪ ডিসেম্বর, ২০১২ সালে সরকার একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকল হ্যাচারিকে ভাইরাসমুক্ত পিএল উৎপাদন এবং সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পিএল বিক্রির সময় 'ভাইরাসমুক্ত পিএল' এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করার নির্দেশনা দিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে হ্যাচারিগুলো কি আসলেই ভাইরাসমুক্ত পিএল উৎপাদনে সক্ষম? এ প্রেক্ষিতে ভাইরাসমুক্ত পিএল উৎপাদনের জন্য নিম্নরূপ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

উদ্দেশ্য
(Objectives)

- WSS ভাইরাস নেগেটিভ পিএল উৎপাদন করার জন্য ওয়ান মাদার ওয়ান ট্যাংক পদ্ধতির কার্যকারিতা ও সফলতা পরীক্ষা করা।
- ক্লোজড সিস্টেম পদ্ধতিতে বছরে ২বার বাগদা চিংড়ি চাষ পদ্ধতির কার্যকারিতা ও সফলতা পরিক্ষার জন্য খুরুসকুল এলাকায় অবস্থিত ৫টি পুকুরে ভাইরাসমুক্ত পিএল সরবরাহ করা।

পদ্ধতি
(Methodology)

কক্সবাজারের ৫ (পাঁচ) জন হ্যাচারির মালিক এবং টেকনিশিয়ানের সাথে প্রত্যক্ষ ভিজিটের মাধ্যমে কলাতলীতে অবস্থিত জমজম হ্যাচারিকে ওয়ান মাদার ওয়ান ট্যাংক পদ্ধতির কার্যকারিতা ও সফলতা পরীক্ষা করার জন্য নির্ধারণ করা হয়। জমজম হ্যাচারি ২ মে.টন আকারের ২টি কোয়ারেন্টাইন ট্যাংক, ২০টি ৫০০ লিটার আকারের ফাইবারের তৈরি স্পনিং এবং হ্যাচিং ট্যাংক, ১০টি ৭.৫ মে.টন আকারের সিমেন্টের তৈরি নার্সারি ও লার্ভাল ট্যাংক সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করা হয়।

পরীক্ষণটি চারটি ব্যাচে চার চক্র (সাইকেল)-এ পরিচালিত হয়। প্রতি চক্রে ৭বার ওয়ার্ল্ডফিস, প্রান্তিক এবং মৎস্য অধিদপ্তরের ল্যাবে WSS ভাইরাসের উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। ব্রুড সাপ্লাইয়ারের মাধ্যমে সমুদ্র থেকে সংগৃহীত ব্রুড প্রথমে ১টি কোয়ারেন্টাইন ট্যাংকে রাখা হয় এবং বাহ্যিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পরিপক্ব (গ্রাভিড) ব্রুড-কে ২য় কোয়ারেন্টাইন ট্যাংকে নেওয়া হয় এবং প্লিয়োপড সংগ্রহ করে পিসিআর পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়।

চিত্র: কোয়ারেন্টাইন ট্যাংক

চিত্র: কোয়ারেন্টাইন ট্যাংকে বাছাইকৃত ব্রুড

একই দিন বিকেল বেলা প্রতিটি ব্রুড আলাদা আলাদা স্পনিং ট্যাংকে স্থানান্তর করা হয়। পিসিআর পজেটিভ ব্রুড ধ্বংস করে ফেলা হয়। একইভাবে প্রতিটি ব্রুডের ডিম, নপ্‌লি, লার্ভি এবং পোস্ট লার্ভি আলাদা আলাদা ট্যাংকে স্থানান্তর করা হয়। প্রতিবার স্থানান্তরের সময় প্রত্যেকটি পপুলেশন থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক নমুনা নিয়ে পিসিআর পরীক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। পিসিআর পজেটিভ ট্যাংকের সব পপুলেশন ধ্বংস করে ফেলা হয়।

চিত্র: পরিপক্ব ব্রুড

ফলাফল (Results)

বিগত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ জমজম হ্যাচারির দক্ষ টেকনিশিয়ান মি. অং ভোরবেলায় ৯৫টি ব্রুড সংগ্রহ করে যার গড় ওজন ছিল ১১০ গ্রাম। বাহ্যিক ম্যাচুরিটি দেখে ২০টি ব্রুড স্পনিং -এর জন্য বাছাই করে ১ম কোয়ারেন্টাইন ট্যাংকে রাখা হয়।

চিত্র: প্রজনন ট্যাংক

বাছাইকৃত ব্রুড থেকে প্লিয়োপড সংগ্রহ করে ১ম পিসিআর পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় এবং ১৬টি ব্রুড ২য় কোয়ারেন্টাইন ট্যাংকে রাখা হয়। বাছাইকৃত ব্রুড থেকে প্লিয়োপড সংগ্রহ করে ২য় পিসিআর পরীক্ষার জন্য পাঠানোর হয় এবং ব্রুডগুলো স্পনিংয়ের জন্য সন্ধ্যাবেলা আলাদা

চিত্র: লার্ভা রিয়ারিং ও নার্সারি ট্যাংক

আলাদা স্পনিং ট্যাংকে স্থানান্তর করা হয়। ২য় পিসিআর ফলাফলের ভিত্তিতে আরও ৫টি ভাইরাসযুক্ত ব্রুড নষ্ট করে ফেলা হয় এবং বাকী ১১টি ব্রুডের থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রায় ৫৬ লক্ষ ডিম হ্যাচিংয়ের জন্য আলাদা আলাদা হ্যাচিং ট্যাংকে স্থানান্তর করা হয়।

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রায় ৫৫% ভাইরাসমুক্ত ব্রুড প্রথম ব্যাচে ব্যবহার করা হয়েছে। ২০ ফেব্রুয়ারি প্রায় ৪৫ লক্ষ নপ্‌লি লার্ভা ট্যাংকে স্থানান্তর করা হয় এবং প্রতিটি ট্যাংক থেকে নমুনা নিয়ে ৩য় পিসিআর টেস্টের জন্য পাঠানো হয়। লার্ভা ট্যাংকে ১৪ দিন লালনের পর প্রায় ৩৬ লক্ষ প্রাথমিক পর্যায়ের পিএল ৬ মার্চ নার্সারি ট্যাংকে স্থানান্তর করা হয়। ইতোমধ্যে ৪র্থ ও ৫ম পিসিআর টেস্টে সবগুলো ট্যাংককে ভাইরাসমুক্ত পাওয়া যায়। নার্সারি ট্যাংকে আরও ৮ দিন লালনের পর মোট ২৪ দিন পরে পিএল স্টেজ-১৩ এ প্রায় ১৩ লক্ষ পিএল বিক্রি করে দেয়া হয়। পিএল বিক্রির

পূর্বে ৬ষ্ঠ এবং ৭ম টেস্টের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে প্রতিটি পিএল WSS ভাইরাসমুক্ত। দ্বিতীয় ব্যাচ ২৩ মার্চ

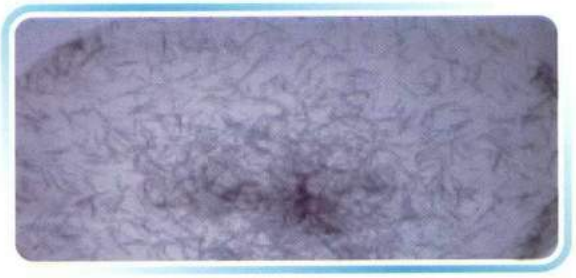

চিত্র: ডব্লিউএসএস ভাইরাসমুক্ত পিএল

২০১৩, তৃতীয় ব্যাচ ২০ জুন এবং চতুর্থ ব্যাচের ব্রুড তোলা হয় ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তে। প্রতি ব্যাচেই প্রথম ব্যাচের অনুরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ব্যাচে যথাক্রমে ৩৩%, ২৫% এবং ২৫% ভাইরাসমুক্ত ব্রুড পাওয়া যায়। সার্বিক কার্যক্রমটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ইকোনমিক গ্রোথ প্রোগ্রাম প্রকল্প থেকে পরিচালিত হয়।

চিত্র: বাণিজ্য সচিব ওয়ান মাদার ওয়ান ট্যাংক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

পর্যালোচনা
(Discussion)

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৬৫% প্রাকৃতিক ব্রুড WSS ভাইরাসযুক্ত। তন্মধ্যে ব্যাচ-৩ এবং ব্যাচ-৪ প্রায় ৭৫% ভাইরাসযুক্ত অর্থাৎ জুন থেকে সেপ্টেম্বরের ব্যাচের ব্রুড বেশি ভাইরাসযুক্ত। ওয়ার্ল্ডফিস থেকে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, অগভীর স্থান থেকে আহরিত ব্রুড গভীর স্থান থেকে আহরিত ব্রুডের চেয়ে অনেক বেশি ভাইরাসযুক্ত। সমুদ্র থেকে সংগৃহীত ব্রুডের মধ্যে মাত্র ১৬% ব্রুড স্পনিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। সনাতন পদ্ধতিতে উৎপাদিত পিএল ভাইরাস নেগেটিভ হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চাষি পর্যায়ে সে সব ভাইরাস অনুকূল আবহাওয়া সাপেক্ষে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সমস্ত ফসল ধ্বংস করে দিতে পারে। WSSV একটি ডিএনএ ভাইরাস। এ কারণে নপ্‌লি, জুইয়া, মায়োসিস এবং পিএল স্টেজেও এর প্রাদুর্ভাব হতে দেখা গেছে। সনাতন পদ্ধতি যেহেতু বড় বড় ট্যাংকে করা হয়, সেখানে ১২/১৪ ব্রুড পপুলেশনের মধ্যে ক্রস কন্টামিনেশনের আশঙ্কা অনেক বেশি। চাষি এসব কন্টামিনেটেড পিএল নিয়ে চাষ করায় রোগও বেশি হয়। অনেক বড় ট্যাংক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনাও কঠিন, ব্যয়সাধ্য এবং ঝুঁকি বেশি অর্থাৎ বেশি পপুলেশন বেশি ঝুঁকি বয়ে নিয়ে আসে (Granvile D.T, Joe. M.F, ১৯৯৩)। বিশ্লেষণে দেখা যায়, নপ্‌লি থেকে পিএল-১৩ পর্যন্ত চারটি ব্যাচের পিএলই ১০০% ভাইরাসমুক্ত। তবে এভাবে পিএল উৎপাদনে সনাতন বা প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে উৎপাদন ব্যয় প্রায় ১০০% বেশি। এ পদ্ধতিতে যদি কোনো ট্যাংকে ভাইরাস শনাক্ত করা হয় তাহলে কম খরচে সেই ট্যাংকের পপুলেশন সরিয়ে ফেলা যায় কিন্তু সনাতন বা বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে এটা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ; এমনকি ঐ বছরের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের ব্যাচে ডিম থেকে পিএল উৎপাদনের হার খানিকটা বেশি।

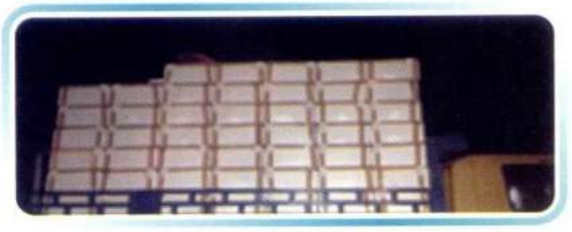

চিত্র: পিএল পরিবহন

সনাতন বা প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎপাদিত পিএল ভাইরাসমুক্ত এ মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করলে চাষির জন্য একটা বড় বিপর্যয় নেমে আসবে। আর এ পদ্ধতিতে ট্রেসিবিলিটিও সম্ভব না। ওয়ান মাদার ওয়ান ট্যাংক পদ্ধতিতে যেমন পিএলগুলো ট্রেসিবেল হয়, ভাইরাসমুক্ত পিএল উৎপাদন নিশ্চিত হয়, কম পপুলেশন হওয়ায় ব্যাকটেরিয়ার লোড কম থাকে এবং পিএলগুলো শক্তিশালী ও সুস্থ হয়। এ পিএল ব্যবহার করে ক্লোজড সিস্টেম পদ্ধতিতে খুরুসকুলে অবস্থিত ৫টি পুকুরে একটি কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যেখানে উৎপাদিত চিংড়িতে ৯২% বাঁচার হার পাওয়া যায়। চলতি ২০১৪ সালে ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন বাকখালী নদীর তীরে খুরুসকুলে আরেকটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যেখানে একটি হ্যাচারি থেকে ওয়ান মাদার ওয়ান ট্যাংক পদ্ধতিতে উৎপাদিত পিএল সরবরাহ করা হয়।

চিত্র: WSS ভাইরাসমুক্ত পিএল উৎপাদন প্রক্রিয়া

উপসংহার
(Conclusion)

ওয়ান মাদার ওয়ান ট্যাংক পদ্ধতিতে পিএল উৎপাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা প্রণিধানযোগ্য:

- প্রতিটি হ্যাচারিকে ওয়ান মাদার ওয়ান ট্যাংক পদ্ধতিতে পিএল উৎপাদনের জন্য রিকনস্ট্রাক্ট করা;
- ভাইরাসযুক্ত ব্রুড ব্যবহার বন্ধ করা;
- প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎপাদিত পিএল ভাইরাসমুক্ত নিশ্চিত হয়েই কেবল 'ভাইরাস মুক্ত' প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা;
- ব্যাংক যেন পুনরায় হ্যাচারিতে অর্থলগ্নী করে সরকারকে সে বিষয়ে সহযোগিতা করা;
- পদ্ধতিটি ভ্যালিডেট/দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য আরও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত করা;
- ভাইরাসমুক্ত ব্রুড প্রাপ্তির স্থান নিশ্চিত করার জন্য বঙ্গোপসাগরে ব্রুড ম্যাপিং করা;
- অগভীর স্থান থেকে ব্রুড সংগ্রহ বন্ধ করা;
- সরকারি পর্যায়ে কোয়ারেন্টাইন এবং পিসিআর টেস্ট করে ভাইরাসমুক্ত ব্রুড সরবরাহের জন্য ব্রুড ব্যাংক তৈরি করা;
- নিয়মিতভাবে পিসিআর টেস্ট করা;
- ভাইরাস পজিটিভ পিএল অনত্র ব্যবহার না করে ধ্বংস করে ফেলা;
- বায়ো-সিকিউরিটি ও স্যানিটেশন কন্ট্রোল ব্যবস্থা জোরালো করা;
- স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা; এবং
- ওয়ান মাদার ওয়ান ট্যাংক পদ্ধতি পরিচালনার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

চিত্র: WSS ভাইরাসমুক্ত পিএল উৎপাদন সমীক্ষাস্থল

ইলিশ ও জেলে

মোঃ এমরুল হোসাইন

ইলিশ নিয়ে হিসেব নিকেশ
ইলিশ নিয়ে কল্পনা,
প্রজননের মৌসুমে হয়
নানান রকম জল্পনা।

মহাজনী ব্যবসাটা তো
হয়নি আজও ছিন্ন,
জেলেদেরকে জিম্মি করে
করছে ছিন্ন ভিন্ন।

পেটের দায়ে ধরছে ইলিশ
মিথ্যে কোনো গল্প না,
সংখ্যাটা ভাই লক্ষ লক্ষ
একেবারে স্বল্প না।

চাই যে ওদের পুনর্বাসন
যথাযথ নিয়ন্ত্রণ,
তা না হলে মা ইলিশকে
ধরবে ওরা মণকে মণ।

হারিয়ে যাবে মা ইলিশ
বিলীন হবে বংশ,
আগুন হবে ইলিশ বাজার
সুনাম হবে ধ্বংস।

আর যদি ভাই কয়েকটা দিন
বিধি-নিষেধ মানা হয়,
মিলবে ইলিশ হাসবে জেলে
করবে ইলিশ বিশ্বজয়।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

অ্যাকোয়াকালচার কনসালট্যান্ট, ইকোনমিক গ্রোথ প্রোগ্রাম প্রকল্প, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

ইকোফিস-বিডি প্রকল্প : পদ্মা-মেঘনা অববাহিকায় ইলিশসহ অন্যান্য মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন ও মৎস্যজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সরকারি-বেসরকারি-দাতাদের যৌথ প্রয়াস

ECOFISHBD Project : A Joint Initiative of Government-Non-government-Donor for Hilsa and other Fisheries Resources Conservation, Productivity Improvement and Strengthening Fishers Capacity

ড. এম জলিলুর রহমান[১], ড. এম এ ওহাব[২] ও ড. ক্রেইগ এ মেইসনার[৩]

Abstract

The Enhanced Coastal Fisheries (ECOFISHBD) project is a five-year, USAID-funded initiative designed to improve the resilience and governance of the Padma-Meghna river-estuarine ecosystem and livelihood of communities reliant on Hilsa fisheries, implemented jointly by WorldFish and Department of Fisheries (DoF) started on June 01, 2014. The project is using a collaborative mode of implementation to support the use of science based decisions in fisheries management; help build the capacity of relevant government and non-governmental partners, as well as the fisher communities to strengthen enforcement in fish sanctuaries; establish fisheries co-management; and support the socio-ecological resilience of fisher's livelihoods, specially women. The project is also designed to enhance the biodiversity of aquatic animals and Hilsa fishery in Bangladesh by reducing overexploitation and threats to the habitat which will provide multiple benefits, including: (1) a sustainable supply of fish that is high-quality protein affordable to the poor; (2) nutrition and income benefits that improve the quality of life of all members of small-scale fishing communities; and (3) healthy marine and coastal ecosystems that can cope with climate change and provide essential ecosystem goods and services to underpin both livelihoods and a resilient Hilsa fishery.

নদীমাতৃক বাংলাদেশে প্রায় ২২১৫৫ কিমি ব্যাপী ৭০০টি নদ-নদী, উপ-নদী বা শাখা-নদী বিস্তৃত রয়েছে যার মধ্যে নদীর সংখ্যা প্রায় ২০০টি। নদ-নদীর এ সমাহারে একদিকে যেমন এক সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের সমারোহ ঘটেছে অন্যদিকে এ জনপদের বিপুল জনগোষ্ঠীর (প্রায় ১.৪ মিলিয়ন) জীবন-জীবিকা এসব নদ-নদীর ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। নদী ও তৎসংলগ্ন স্বাদুপানির জীববৈচিত্র্যের মধ্যে প্রায় ২৬৫টি মৎস্য প্রজাতি রয়েছে। অন্যদিকে মোহনা ও সমুদ্র এলাকায় আছে প্রায় ৫০০ প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি। জনপ্রিয়তা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিচারে এ বিচিত্র মৎস্যকূলের শীর্ষে আছে আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ যা এককভাবে মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১৭.২৭% অবদান রাখে। পদ্মা-মেঘনা অববাহিকা এবং তৎসংলগ্ন মোহনা ও সমুদ্র এলাকাই ইলিশের প্রধান চারণভূমি ও আহরণ স্থান। নদী, মোহনা ও সমুদ্র সকল স্থানে ইলিশের বিস্তৃত উপস্থিতি ও এককভাবে বাৎসরিক ৩.৮৫ লক্ষ মে.টন উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও এ মাছের চাহিদা ও বাজারদর সকল মাছের শীর্ষে অবস্থান করছে। ফলে এ বিস্তৃত জলরাশির উপকূলে বসবাসরত বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার কেন্দ্রবিন্দুতে ইলিশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। খাদ্যমান বিচারেও দেখা যায়, এটা উন্নতমানের আমিষ, ওমেগা-৩ যুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ, যথেষ্ট ভিটামিন ও খনিজ উপাদানযুক্ত অত্যন্ত সুস্বাদু একটি মাছ। তাছাড়া মাছটি জড়িয়ে আছে বাঙালি সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও আচার অনুষ্ঠানে।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিপ্রয়াণশীল এ ইলিশ মাছের জীবনের বেশির ভাগ সময় সাগরের লবণাক্ত পানিতে অতিবাহিত হলেও এদের জন্ম, পদ্মা-মেঘনা অববাহিকার মিঠা বা স্বাদুপানিতে। জন্মের পরও পোনা বা জাটকা থাকা অবস্থায় কয়েক মাস এসব নদীর অপেক্ষাকৃত অগভীর ও কম স্রোতময় এলাকায় বিচরণ করে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এসব এলাকাকে লালনক্ষেত্র বা বিচরণক্ষেত্র বলা হয়। বর্ষার শুরুতেই জাটকা এসব লালনক্ষেত্র পরিত্যাগ করে ক্রমান্বয়ে মোহনা হয়ে সাগরের লবণাক্ত পানিতে বসবাস করে পরিপক্ব হয়ে প্রজননের জন্য অর্থাৎ ডিম ছাড়ার জন্য স্বাদুপানিতে পুনরায় ফিরে আসে ও জাটকার জন্ম দেয়। এভাবে ইলিশের জীবনচক্র সম্পন্ন হয়। কিন্তু ইলিশের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিশেষ করে পরিভ্রমণপথে ক্রমবর্ধমান বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বাধাগুলোর মধ্যে রয়েছে- লালনক্ষেত্র থেকে নির্বিচারে জাটকা নিধন, ডিমওয়ালা ইলিশের অতিআহরণ, পরিভ্রমণ পথে নানা রকম জাল, বাঁশের বানা স্থাপন, ফারাক্কা বাঁধের ফলে পদ্মা নদী বিধৌত এলাকায় নাব্যতা হ্রাস, বিভিন্ন ব্রিজ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন, কৃষি ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য নদীভরাট, নদীতে পলি ও বালু জমার ফলে চর পড়া ও গতিপথ পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান হারে কৃষি, শিল্প ও পয়ঃপ্রণালির দ্বারা দূষণ, উপকূল এলাকায় বিষ প্রয়োগে মৎস্য আহরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব। এসব প্রতিকূল অবস্থার প্রেক্ষাপটে পূর্বে যেখানে প্রায় ১০০টি নদীতে ইলিশ পাওয়া যেত বর্তমানে এগুলোর অনেকটিতে হয় ইলিশের পরিমাণ কমে গেছে বা একেবারেই পাওয়া যায় না। অবশ্য এসব প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করে যদি অন্তত ৩ বছর একটি ইলিশ বেঁচে থাকে তা হলে আমরা আমাদের প্রত্যাশিত এক কেজি বা অধিক ওজনের মূল্যবান ইলিশ মাছ পেতে পারি।

উল্লিখিত সকল বাধা অতিক্রম বা অপসারণ করা বাস্তবে সম্ভব নয়। তবে বাংলাদেশ সরকার প্রথম ৩টি বাধা উপশমের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। পদ্মা-মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত ৫টি প্রধান বিচরণক্ষেত্রকে অভয়াশ্রম (sanctuary) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বরিশালের হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ এলাকায় আরও একটি অভয়াশ্রম ঘোষণার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে তা নিম্নে চিত্রে দেখানো হলো। আন্ধারমানিক নদীর অভয়াশ্রমে নভেম্বর-জানুয়ারি, ৩

মাস ও অন্যান্য অভয়াশ্রমে মার্চ-এপ্রিল, ২ মাস জাটকাসহ অন্যান্য সকল মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়; যা ইলিশ ও অন্যান্য মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া, ভরা প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা ইলিশ ধরা কমানোর লক্ষ্যে অক্টোবর মাসের পূর্ণিমার দিন ও তৎপূর্বে ও পরে ৫ দিন করে সর্বমোট ১১ দিন ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে জেলেরা এ সময় মাছ না ধরলে তাদের জীবন-জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এ বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সরকার খাদ্য সহায়তা হিসেবে সংশ্লিষ্ট এলাকার আইডি কার্ডধারী জেলেদের প্রতি মাসে ৪০ কেজি করে চাল প্রদান, বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সচেতনতামূলক কর্মসূচি ইত্যাদি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কিন্তু বিশাল এ কর্মযজ্ঞ সীমিত সম্পদ দ্বারা সরকারের একার পক্ষে সুচারুরূপে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন, সরকারি, বেসরকারি, আন্তর্জাতিক সংস্থা, দাতাসংস্থা ও সর্বোপরি মৎস্যজীবীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমন্বিত উদ্যোগ। উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে, পদ্মা-মেঘনা অববাহিকায় ইলিশ ও অন্যান্য মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, আবাসস্থল ও প্রতিবেশের (ecosystem) রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন ও মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি-দাতাদের যৌথ প্রয়াসে 'ইকোফিস-বিডি, এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিসারিজ ইন বাংলাদেশ (ECOFISHBD, Enhanced Coastal Fisheries in Bangladesh)' প্রকল্প নামে ৫ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পটি বিগত জুন ২০১৪ মাস থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটিতে অর্থায়নের জন্য একক দাতাসংস্থা হিসেবে এগিয়ে এসেছে আমেরিকার জনগণের অর্থে পরিচালিত US Agency for International Development (USAID)। সংশ্লিষ্ট সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে ইলিশ ও অন্যান্য মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, প্রতিবেশের উন্নয়ন ও মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
(Goal and objectives of the project)

ইকোফিস-বিডি প্রকল্পের লক্ষ্য হলো পদ্মা-মেঘনা অববাহিকায় ইলিশ ও অন্যান্য মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, আবাসস্থল ও প্রতিবেশের (ইকোসিস্টেম) রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং এ প্রতিবেশের ওপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবীদের রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধি করে তাঁদের আর্থসামাজিক ও সামাজিক-প্রতিবেশে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন।

উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে অবশ্যই ৪টি মধ্যবর্তী ফলাফল (Intermediate Results, IR) লাভ করতে হবে বা উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যগুলো হলো:

আইআর-১: মৎস্য ব্যবস্থাপনায় উন্নততর বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

আইআর-২: উপযুক্ত মৎস্য সহ-ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;

আইআর-৩: মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক এবং সামাজিক-প্রতিবেশ বিষয়ে রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধিকরণ; এবং

আইআর-৪: নীতিমালা, ক্ষমতা এবং প্রণোদনা জোরদারকরণ।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা
(Implementation organization)

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নেতৃত্বে যৌথভাবে আছে সরকারি সংস্থা- মৎস্য অধিদপ্তর এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা- ওয়ার্ল্ডফিস। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে এ দুটি সংস্থাকে সহায়তার জন্য সাব-পার্টনার হিসেবে বর্তমানে ৮টি সংস্থা কাজ করছে। এগুলো হলে কোডেক (CODEC), কোস্ট-ট্রাস্ট (COAST Trust), সিএনআরএস (CNRS), আইডিই (iDE), আইআইইডি-বিসিএএস (iiED/BCAS), সিআরসি, ইউআরআই (CRC, URI) ও বিএফআরআই (BFRI)। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এ প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বাস্তবায়ন এলাকা
(Implementation area)

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন এলাকা হলো পদ্মা-মেঘনা অববাহিকা ও তৎসংলগ্ন মোহনাঞ্চল যা প্রধানত ৯টি উপকূলীয় জেলায় অবস্থিত। জেলাগুলো হলো বরিশাল, বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর ও শরীয়তপুর।

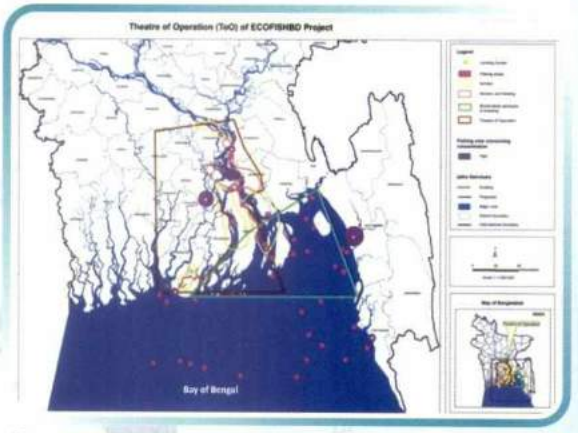

চিত্র: প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা, অভয়াশ্রম, লালনক্ষেত্র ও প্রজননক্ষেত্র, মৎস্য অবতরণকেন্দ্র ও মৎস্য আহরণস্থল

বাস্তবায়ন কৌশল
(Implementation techniques)

সংশ্লিষ্ট সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সমন্বিত যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাস্তবায়নের সময় লক্ষ্য রাখা হচ্ছে যাতে বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা

করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ নিশ্চিত করা যায়; সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি পার্টনারদের এবং সাথে সাথে মৎস্যজীবীদেরও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা যাতে করে মৎস্য অভয়াশ্রম বাস্তবায়ন জোরদার করা যায় ও উপযুক্ত সহ-ব্যবস্থাপনা (co-management) প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে মহিলাদের আর্থসামাজিক ও সামাজিক-প্রতিবেশ সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। এ প্রকল্পে যে গবেষণা পরিচালিত হবে তা উন্নয়নের মধ্যে গবেষণা (Research in Development) ধাচে সম্পন্ন হচ্ছে যা ইলিশ ও অন্যান্য মৎস্যকূলের টেকসই বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে, সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনমানেরও উন্নয়ন ঘটাতে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান নিশ্চিত করবে।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম/পদক্ষেপ (Implementation activities)

- পদ্মা-মেঘনা অববাহিকা ও তৎসংলগ্ন মোহনা প্রতিবেশের জীববৈচিত্র্য নিরূপণ ও সংরক্ষণ;
- বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্য মজুদ নিরূপণ ও উপযুক্ত সহ-ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন;
- মজুদ বৃদ্ধির মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় মৎস্যজীবীদের সক্ষমতার উন্নয়ন;
- অংশগ্রহণমূলক কার্যমুখী গবেষণার মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের সংযুক্ত করা;
- দরিদ্র মহিলাদের জন্য অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে করে তারা বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে;
- টেকসই বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের জীবিকার ক্ষেত্রসমূহ বহুমুখীকরণ;
- বহু-অংশীদারিত্বের সম্মতিতে নীতিমালা প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা ত্বরান্বিত করা;
- প্রমাণনির্ভর টেকসই প্রতিবেশ সেবার জন্য মূল্য প্রদান পদ্ধতি (PES) উদ্ভাবন; এবং
- সুবিধাজনক মৎস্যজীবীবান্ধব আইন বাস্তবায়ন কৌশল প্রবর্তন।

প্রত্যাশিত ফলাফল ও তার প্রভাব (Expected outcomes and its impact)

ইকোফিস-বিডি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হলে ফলাফল: পদ্মা- মেঘনা অববাহিকায় ইলিশ ও অন্যান্য মৎস্যসম্পদ অধিকতর সংরক্ষিত হবে, আবাসস্থল ও প্রতিবেশের রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়বে, অন্যদিকে এ প্রতিবেশের ওপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবীদের রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থসামাজিক ও সামাজিক-প্রতিবেশে খাপ খাইয়ে চলার সক্ষমতা বাড়বে ও জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে। আর এসবের প্রভাবে পদ্মা-মেঘনা অববাহিকায়-

- ইলিশ ও অন্যান্য মৎস্যসম্পদের প্রাচুর্য ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে;
- মৎস্য ও অন্যান্য জলজ জীববৈচিত্র্য বেড়ে যাবে;
- টেকসইভাবে উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন আমিষ প্রধান খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি পাবে;
- দরিদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের আয় ও পুষ্টির উন্নয়নের মাধ্যমে তাঁর ও তাঁর পরিবারের জীবনযাত্রার মান বাড়বে; এবং
- টেকসইভাবে পদ্মা-মেঘনা নদী ও মোহনাঞ্চলে সুস্থ এবং রেজিলিয়েন্ট পরিবেশ ও প্রতিবেশ গড়ে উঠবে যা উপহার দেবে রেজিলিয়েন্ট ইলিশ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতি যা প্রকারান্তরে উপহার দেবে রেজিলিয়েন্ট মৎস্যজীবী।

উপসংহার (Conclusion)

পদ্মা-মেঘনা নদী ও মোহনাঞ্চলে সুস্থ এবং রেজিলিয়েন্ট পরিবেশ ও প্রতিবেশ গড়ে এ অববাহিকায় ইলিশ ও অন্যান্য মৎস্যসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং এর ওপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে জীবনমান উন্নয়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি-দাতাদের যৌথ প্রচেষ্টায় যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে ইলিশ ও অন্যান্য মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, প্রতিবেশের উন্নয়ন ও মৎস্যজীবীদের জীবনমান বৃদ্ধিতে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)

লেখকবৃন্দ প্রকল্পটিতে এককভাবে অর্থায়নের জন্য USAID Bangladesh-এর অবদানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে। লেখাটির মানোন্নয়নের জন্য ড. বিনয় কুমার বর্ম্মন, ওয়ার্ল্ডফিস এবং ড. মোহাঃ সাইনার আলম, মৎস্য অধিদপ্তর যেসব পরামর্শ দিয়েছেন তা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করা হচ্ছে।

[১]সায়েন্টিস্ট (ফিস পপুলেশন বায়োলজি), ইকোফিস-বিডি, ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ
[২]প্রজেক্ট লিডার, ইকোফিস-বিডি, ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ
[৩]কান্ট্রি ডিরেক্টর, ওয়ার্ল্ডফিস, বাংলাদেশ

মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি, প্রভাব ও অভিযোজন
Risk and Effect of Climate Change to Fisheries Sector

ড. আলী মুহম্মদ ওমর ফারুক[১], মোঃ হুমায়ুন কবির[২] ও ড. মোহাঃ সাইনার আলম[৩]

Abstract

Bangladesh is recognized as one of the country's most vulnerable to the adverse impacts of climate change. There are some places which are in more dangerous condition due to the impacts of climate change. These are called climate change hotspots. In Bangladesh, natural hazards, predominantly climate induced have a long history of devastating impact on the land and people, claiming lives, damaging infrastructure, destroying valuable assets, sources of income and affecting livelihoods. Diversified fisheries ecosystems and fishing-based livelihoods are subjected to a wide range of climate-related variability, from extreme weather events such as- floods, droughts, changes in aquatic ecosystem structure and productivity to changing patterns and abundance of fish stocks. Human induced climate change is likely to cause major shifts in ocean system productivity and surface freshwater availability. The impact of long-term trends in climate change is less understood in fisheries sector. However, global ocean circulation patterns, sea level rise, changes in ocean salinity and pH, and rise in inland water and sea surface temperature and extreme event all of which would affect the enriched biological properties and distribution of aquatic species. Department of Fisheries has taken initiatives to address the climate change paradigm through intervening various socio-eco-friendly interventions, viz. habitat restoration, establishment and rehabilitation of fish sanctuary, introduction of saline tolerant and fast-growing species, expansion of small-scale aquaculture, expansion of cage and pen farming in, beel nursery operation, stocking of indigenous fish species, etc. Moreover, various social safety net programmes like introduction of VGF and AIGAs along with distributing eco-friendly fiber re-enforced plastic (FRP) boats, mass awareness, introduction of VTMS and capacity enhancement at different stakes are initiated.

বাংলাদেশ প্রকৃতিগতভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী নানা বিরূপ পরিবর্তন ও প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে যা মানুষের জীবন-জীবিকার জন্যে মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের যেসব দেশ এ ঝুঁকির প্রতি বেশি সংবেদনশীল, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। মানুষের জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতের মতো এ দেশের মৎস্য খাতও এ ঝুঁকির ফলে বিপন্ন। ইতোমধ্যেই মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক উৎসে মাছের প্রজনন, প্রাচুর্য ও জীববৈচিত্র্য ব্যাহত হচ্ছে, অন্যদিকে মাছ চাষেও এর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাওয়ায় বিপন্ন হচ্ছে এ খাতে সংশ্লিষ্ট মানুষের জীবন ও জীবিকা। এ দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, সম্ভব এর ঝুঁকি হ্রাস করা। তাই প্রয়োজন আজ জলবায়ু পরিবর্তন, ঝুঁকি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অভিযোজন বিষয়ে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও দুর্যোগ থেকে দেশের মৎস্যসম্পদকে রক্ষার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change)

কোনো নির্দিষ্ট এলাকার তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, বায়ু প্রবাহ ইত্যাদির সম্মিলিত রূপই হলো আবহাওয়া যা অঞ্চল ও ঋতুভেদে পরিবর্তনশীল। আর দীর্ঘমেয়াদি সময়ের কোনো নির্দিষ্ট এলাকার আবহাওয়ার গড়ই হলো জলবায়ু। যেমন- জলবায়ু হচ্ছে কোনো এলাকা বা অঞ্চলের কমপক্ষে ৩০ বছরের গড় আবহাওয়া। এ দীর্ঘমেয়াদি সময়ের মধ্যে আবহাওয়ার গড়মানের যে পরিবর্তন হয়, তাই জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তনের একাধিক প্রভাবক রয়েছে। তন্মধ্যে তাপমাত্রাকেই প্রধান প্রভাবক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও বিপন্নতা (Risk and vulnerability in fisheries sector)

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সারা দেশের সামগ্রিক কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থা, ভূমির ব্যবহার পদ্ধতি, জীবনধারণের কৌশল ও জীবিকা যেমন ঝুঁকিপ্রবণ ঠিক তেমনই বাংলাদেশের মৎস্য খাতও মারাত্মকভাবে ঝুঁকিপ্রবণ ও বিপন্ন। বাংলাদেশের মৎস্য খাতের সার্বিক ঝুঁকি ও বিপন্নতাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- জলজ আবাস ও জীববৈচিত্র্যের ক্রমাবনতি;
- মাছের প্রজনন, নার্সারি ও উৎপাদন এলাকার পর্যায়ক্রমিক হ্রাস;
- প্লাবনভূমিসহ বিল ও অন্যান্য জলাশয়ের পানি শুকিয়ে যাওয়া;
- নদীতে পানির প্রবাহ কমে যাওয়া;
- ভূ-নিম্ন পানির স্তরের নিম্নগামিতা;
- বিল-বাঁওড়ের সাথে নদীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া;
- মাছের অভিপ্রয়াণ পথ ভরাট ও বন্ধ হওয়া;
- দিবা-রাত্রি ও ঋতুভেদে তাপমাত্রার অতি পার্থক্য/বৃদ্ধি;
- বৃষ্টিপাতের মাত্রা, তীব্রতা, সময় ও ধরনে পরিবর্তন;
- বন্যা, খরা, ঝড়, তাপদাহ, সাইক্লোনের মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি; এবং ঋতুবৈচিত্র্যে, পানির গুণাগুণ এবং পরিমাণে পরিবর্তন।

মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
(Climate change impact in fisheries sector)

জলবায়ু পরিবর্তনে মৎস্যখাতে প্রভাব প্রধানত তিনটি পর্যায়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে প্রথমত উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রভাব; দ্বিতীয়ত মাছ চাষের উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রভাব; এবং তৃতীয়ত মাছের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের জীবিকায় প্রভাব। মৎস্য খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়: উন্মুক্ত জলাশয়ের সার্বিক মাছ উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য জলবায়ু পরিবর্তনের সুস্পষ্ট বিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা সমগ্র মৎস্যখাতের জন্য উদ্বেগজনক। উল্লেখযোগ্য প্রভাব হলো-

- নদীসহ সকল সংযোগ খালের নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় পানির প্রবাহ বন্ধ বা অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়া;
- আবাসস্থল নষ্ট বা সংকুচিত হওয়ার কারণে মাছের প্রজনন কম হওয়ায় উন্মুক্ত জলাশয়ে নতুন মজুদ কমে যাচ্ছে;
- পলি জমাটের হার বৃদ্ধির কারণে পানি কমে বা শুকিয়ে যাওয়ায় অভিপ্রয়াণ বা স্বাভাবিক বিচরণ বিঘ্নিত হচ্ছে;
- উন্মুক্ত জলাশয়ে পানির অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি; তাপমাত্রার অতি পার্থক্য; বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণে তারতম্য হওয়ার কারণে পানির ভৌত-রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলির ক্রমাবনতি হচ্ছে;
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে নদীর উজানে লোনা পানির অনুপ্রেবেশের ফলে স্বাদুপানির জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে;
- উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে এ অঞ্চলের মাছের প্রজননসহ স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে।
- উপরোক্ত বিবিধ কারণে মাছের পরিপক্কতায় ও প্রজননকাল পরিবর্তন হচ্ছে এমন কি অঞ্চলভেদে কোনো কোনো মাছ তাদের প্রজননের উপযুক্ত পরিবেশ না পাওয়ায় প্রজনন করে না; এবং
- মাছের জীববৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে, কোনো কোনো মাছ বিপন্ন অবস্থায় আছে।

২. বদ্ধ জলাশয়: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানান কারণের ফলে মাছ চাষে সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়ছে যা মৎস্যখাতের জন্য সতর্কতামূলক। মাছ চাষে উল্লেখযোগ্য প্রভাবের ক্ষেত্র ও কারণসমূহ নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো:

- **হ্যাচারির উৎপাদন ব্যবস্থা:** প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি, উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রা এবং দিবা-রাত্র তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে হ্যাচারিতে ব্রুড মাছসহ পোনার উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে এমনকি কোনো কোনো এলাকায় হ্যাচারি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
- **মাছ চাষ উৎপাদন ব্যবস্থা:** পুকুরসহ চাষ উপযোগী সকল জলাশয়ের পানি ধারণক্ষমতা ও পানি ধারণকাল হ্রাস; ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া; পানির ভৌত-রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলির অবনতি এবং উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রার অতি উঠা-নামার কারণে মাছের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় মাছ চাষিরা বিপাকে রয়েছেন।

৩. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ

- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে নদীর উজানে লোনা পানির অনুপ্রেবেশ।
- উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে এ অঞ্চলের মাছের প্রজননসহ স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে।
- সাগর ও উপকূলে ইলিশ মাছের প্রজননক্ষেত্র ও বিচরণক্ষেত্রের পরিবর্তন।
- উপকূলীয় এলাকায় মাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য ও প্রাপ্যতায় পরিবর্তন।
- ফিসিং গ্রাউন্ড পরিবর্তন।
- সামুদ্রিক মাছ অন্যান্য জলজ প্রাণীর প্রজনন ও লালনক্ষেত্র পরিবর্তন ও নষ্ট।

৪. জীবন-জীবিকা

উন্মুক্ত জলাশয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সার্বিক মাছ উৎপাদন ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়ায় প্রতিদিনের মাছ আহরণের গড়হার ক্রমাবনতির ফলে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী যেমন- জেলে সম্প্রদায়ের জীবিকা বিপন্ন। দেশব্যাপী জেলে সম্প্রদায়ের প্রায় ১৫% ইতোমধ্যেই তাদের আদি জীবিকা পরিবর্তন করে অন্য জীবিকা ধারণের চেষ্টা করছে।

মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলায় করণীয়
(Steps to address climate change impact in fisheries sector)

মৎস্যখাতের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলায় করণীয় ও দায়িত্ব সকলেরই। তাই প্রয়োজন এ খাতে স্থিতিশীল উন্নয়ন উপযোগী মৎস্য ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখা:

- উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের আবাসস্থলের উন্নয়নসহ মাছের প্রাচুর্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ;
- নদী, খাল ও বিলসহ সকল প্লাবনভূমির সংযোগ খাল উন্নয়নের মাধ্যমে অবাধ পানি প্রবাহের কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- পানির গুণগতমান ও পরিমাণের ঘাটতি এবং তাপমাত্রার পার্থক্য মোকাবেলায় হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ ও কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিরূপ পরিবেশে ও স্বল্প সময়ে চাষ করা যায় এমন মাছের প্রজাতির চাষ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
- এলাকাভিত্তিক উপযোগী স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলা;
- জলাধার নির্মাণ ও যথাযথ ব্যবহার করা;

- ভূগর্ভস্থ পানির নিয়ন্ত্রিত উত্তোলন ও পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- লবণাক্ততা সহনশীল প্রজাতির চাষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
- মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও করণীয় সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা এবং অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন বিষয়ক অনুমোদিত অনুস্বাক্ষরিত দলিলপত্রের সাথে সমন্বয়করণ।

মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন
(Adaptation in fisheries sector due to climate change)

পরিবর্তিত পরিস্থিতে টিকে থাকার জন্য খাপ খাওয়ানোই হচ্ছে অভিযোজন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকায় যে নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, পরিবর্তিত এ পরিস্থিতিতে ঝুঁকি কমিয়ে বা হ্রাস করে মানুষের জীবন ও জীবিকা টিকিয়ে রাখার জন্য গৃহীত উপযোগী কৌশলকে জলবায়ু পরিবর্তনে 'অভিযোজন' বলা হয়। তেমনই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মৎস্যখাতের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত গৃহীত কৌশলই হবে মৎস্যখাতের অভিযোজন। মৎস্যখাতে উন্মুক্ত জলাশয় ও মৎস্যচাষ উভয়ের জন্যই অভিযোজন প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তনে উন্মুক্ত জলাশয়ের উপযোগী অভিযোজন:

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যখাতের ঝুঁকি, বিপন্নতা ও প্রভাব বিবেচনায় অভিযোজন কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন স্থিতিশীল এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার মান স্বাভাবিক রাখা সম্ভব। মাছ জলজ প্রাণী। তাই এর প্রাচুর্য ও সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন সুস্থ জলজ পরিবেশ যা প্রতিনিয়ত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বিপন্ন হচ্ছে। তাই জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজন উন্মুক্ত জলাশয়ে অভিযোজন উপযোগী মৎস্য ব্যবস্থাপনার কৌশল নির্ধারণ, কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখা।

উন্মুক্ত জলাশয়ে অভিযোজনের উপযোগী নিম্নের ক্ষেত্রগুলোতে অভিযোজন কৌশল নির্ধারণ করা যেতে পারে।

- জলজ আবাসস্থল উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- মাছের মজুদ বৃদ্ধি (জলজ আবাসস্থল উন্নয়ন, অভয়াশ্রম স্থাপন ও বিল নার্সারি);
- নদী, বিল, প্লাবনভূমি, বাঁওড় ও দামুস/কোলে সমাজভিত্তিক জলাশয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
- সকল সংযোগ খালের উন্নয়ন যাতে অবাধ পানির প্রবাহ নির্বিঘ্ন করা যায়;
- পানির গভীরতা বৃদ্ধি (নদী, খাল, বিল খনন/পুনঃখনন); এবং
- মাছের সকল অভিপ্রয়াণ পথ সচল ও নির্বিঘ্ন করা।

মাছ চাষে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য অভিযোজন কৌশল:

মাছ চাষে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ আপদ মাছের স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত করছে এবং উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। মাছচাষে জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি মোকাবেলা ও ঝুঁকি হ্রাসের জন্য অভিযোজন উপযোগী চাষযোগ্য মাছ চিহ্নিতকরণ; অভিযোজন উপযোগী মাছ চিহ্নিতকরণ,এর চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ কাজগুলো অতীব জরুরি। তাই-

- সকল পর্যায়ে মাছ চাষে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, প্রভাব ও দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- কম ও বেশি তাপমাত্রা সহনশীল মাছের প্রজাতি নির্ধারণ, চাষ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
- স্বল্প সময়ে বাজারজাতযোগ্য মাছ চাষের প্রজাতির চাষ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও দুর্যোগ বিবেচনায় নিরাপদ মাছ চাষ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং
- লবণাক্ততা সহনশীল প্রজাতি মাছের চাষ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

মাছ চাষে জলবায়ু পরিবর্তনের মূল প্রভাবক ও আপদগুলো বিবেচনায় রেখে চাষযোগ্য মাছের প্রজাতি নির্বাচন, মাছের বৈশিষ্ট্য, মৎস্যচাষের কারিগরি অভিযোজন কৌশল নিম্নরূপ হতে পারে:

আপদ		চাষযোগ্য মাছ	চাষ ব্যবস্থাপনায় অভিযোজন কৌশল
উচ্চ তাপমাত্রা		তেলাপিয়া, শিং, মাগুর ও কৈ	○ জলাশয়ের ১৫-২০% অংশ কচুরিপানা দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে দিনের বেলা সরাসরি সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পায়। ○ পুকুরের তলায় ১০-১৫% অংশ ২ ফুট পর্যন্ত অধিক গভীর করতে হবে যাতে সে অংশের পানি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকে প্রয়োজনে সে অংশে মাছ আশ্রয় নিতে পারে। ○ সম্ভব হলে বাইরের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা পানি পুকুরে সরবরাহ করা।
নিম্ন তাপমাত্রা		তেলাপিয়া, পাঙ্গাস ও মাগুর	○ পুকুরে সার ও খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া। ○ পুকুরের তলায় ১০-১৫% অংশ ২ ফুট পর্যন্ত অধিক গভীর করা। কারণ নিম্ন তাপমাত্রার সময় গভীর অংশের পানি তুলনামূলক গরম থাকায় সে অংশের পানিতে প্রয়োজনে মাছ আশ্রয় নিতে পারে। ○ সম্ভব হলে ভূগর্ভস্থ পানি পুকুরে সরবরাহ করা।
দিবা-রাত্র তাপমাত্রার অতি পার্থক্য		তেলাপিয়া, শিং, মাগুর, পাংগাস, কই কমপক্ষে ২৫০ গ্রাম ওজনের কার্পের পোনা	○ পুকুরের তলায় ১০-১৫% অংশ ২ ফুট পর্যন্ত অধিক গভীর করতে হবে। কারণ নিম্ন তাপমাত্রার সময় গভীর অংশের পানি তুলনামূলক গরম থাকায় সে অংশের পানিতে প্রয়োজনে মাছ আশ্রয় নিতে পারে। ○ সম্ভব হলে বাইরের অপেক্ষাকৃত গরম পানি মাঝ/শেষ রাত্রে পুকুরে সরবরাহ করা।
বৃষ্টিপাতের কাল, ধরন ও পরিমাণে পার্থক্য		কমপক্ষে ২৫০ গ্রাম ওজনের কার্পের পোনা, তেলাপিয়া, সরপুঁটি এবং চিংড়ি	○ বড় আকারের মাছের পোনা মজুদ করে স্বল্পকালীন (৩-৫ মাস) সময়ের চাষ ব্যবস্থাপনা যাতে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির শুরুতেই বাজারজাতযোগ্য মাছ আহরণ করা যায়। ○ নিয়মিত ও পরিমিত পরিমাণে সার ও খাদ্য প্রয়োগ যাতে মাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত থাকে।
জলাশয়ের পানি ধারণক্ষমতা ও পানি ধরে রাখার সময় হ্রাস		কমপক্ষে ২৫০ গ্রাম ওজনের কার্পের পোনা, তেলাপিয়া, সরপুঁটি এবং চিংড়ি	○ বড় আকারের মাছের পোনা মজুদ করে স্বল্পকালীন (৩-৫ মাস) সময়ের চাষ ব্যবস্থাপনা যাতে অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির শুরুতেই বাজারজাতযোগ্য মাছ আহরণ করা যায়। ○ নিয়মিত ও পরিমিত পরিমাণে সার ও খাদ্য প্রয়োগ যাতে মাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত থাকে। ○ ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমানোর জন্য খামারের পানি পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করা।
পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলির পরিবর্তন			○ অপেক্ষাকৃত মন্দ পরিবেশে বৃদ্ধি পেতে পারে এমন মাছের চাষ করা ○ জিয়ল মাছের চাষ করা ○ বড় আকারের মাছের পোনা মজুদ করে স্বল্পকালীন (৩-৫ মাস) সময়ের চাষ ব্যবস্থাপনা যাতে অতি বৃষ্টি/অনাবৃষ্টির শুরুতেই লাভজনক মাছ আহরণ করা যায়। ○ নিয়মিত পানি বদল করা ○ নিয়মিত ও পরিমিত পরিমাণে সার ও খাদ্য প্রয়োগে মাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।
পানির ধারণক্ষমতা হ্রাস		তেলাপিয়া, কৈ, সরপুঁটি, বাটা, পাঙ্গাস	○ বড় আকারের মাছের পোনা মজুদ করে স্বল্পকালীন (৩-৫ মাস) সময়ের চাষ ব্যবস্থাপনা যাতে অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির শুরুতেই বাজারজাতযোগ্য মাছ আহরণ করা যায়। ○ জৈব সার প্রয়োগ করা ○ পুকুরের তলায় ধৈইঞ্চা চাষ করা এবং বাইরের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
লবণাক্ততার হ্রাস-বৃদ্ধি	১৫ + পিপিটিতে	বাগদা, ভেটকি ও পারসে	যে সমস্ত এলাকায় বছরের বেশির ভাগ সময়ে ১৫ পিপিটি'র বেশি লবণাক্ততা থাকে এমন এলাকায় উল্লিখিত মাছগুলো অন্যান্য আপদ ও ঝুঁকি বিবেচনায় চাষ করা যেতে পারে।
	৮-১৪ পিপিটিতে	বাগদা, ভেটকি, পারসে, পাঙ্গাস এবং তেলাপিয়া	যে সমস্ত এলাকায় বছরের বেশির ভাগ সময়ে ৮-১৪ পিপিটি'র লবণাক্ততা থাকে এমন এলাকায় উল্লিখিত মাছগুলো অন্যান্য আপদ ও ঝুঁকি বিবেচনায় চাষ করা যেতে পারে।
	০-৭ পিপিটিতে	বাগদা, গলদা, ভেটকি, পারসে, পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া	যে সমস্ত এলাকায় বছরের বেশির ভাগ সময়ে ০-৭ পিপিটি'র লবণাক্ততা থাকে এমন এলাকায় উল্লিখিত মাছগুলো অন্যান্য আপদ ও ঝুঁকি বিবেচনায় চাষ করা যেতে পারে।

ইতোমধ্যেই মৎস্য অধিদপ্তর কর্তক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যেমন আবাসস্থল উন্নয়ন, অভায়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, উন্মুক্ত জলাশয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে মৎস্যচাষ, পোনা অবমুক্তি, বিল নার্সারি, জলবায়ু সহিষ্ণু মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করে। তাছাড়াও জেলেদের পুনর্বাসন ও ঝুঁকি মোকাবেলায় ভিজিএ ও এআইজি কার্যক্রমসহ পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

উপসংহার (Conclusion)

জলবায়ু পরিবর্তন একটি চলমান ঘটনা, প্রকৃতিতে যার মাত্রা ও তীব্রতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবন ও জীবিকা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে। আর তা মোকাবেলায় সারা বিশ্ব আজ তৎপর। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যতম একটি দেশ। সেজন্য দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন স্থিতিশীল রাখার জন্য উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলার বিষয়টি অতীব গুরুত্বসহ বিবেচনা করে যথাশীঘ্র অভিযোজন কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা জরুরি।

[১]সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
[২]ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিএসপি লি., তেজগাঁও, ঢাকা
[৩]সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রাকৃতিক জলজসম্পদ ও জীববৈচিত্র্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ক্রেল প্রকল্প

CREL Project for Mitigating Impact of Climate Change on Natural Wetland Resources and Biodiversity

ড. মোঃ শরীফ উদ্দীন[১], ড. বিনয় কুমার বর্ম্মন[২] ও ড. মোঃ আবদুল কাইয়োম[৩]

Abstract

The overall objectives of the Climate-Resilient Ecosystems and Livelihoods (CREL) Project are to adapt and expand successful co-management models to conserve wetlands, Ecological Critical Areas (ECAs), improve governance of natural resources and biodiversity, and increase resilience to climate change through improved planning and livelihoods diversification to help "Bangladesh to become a knowledge-based, healthy, food-secure, and climate-resilient middle income democracy". The CREL project will assist Bangladesh to reduce its vulnerability to climate change impacts, decrease the environmental, economic, and social consequences of climate change, and improve the effectiveness and sustainability of Bangladesh's general development goals. Major performance targets within the context of framework of USAID's broader Global Climate Change (GCC) initiative include: 80,000 stakeholder with increased capacity to adapt to impact of climate variability and change; 500,000 people with increased climate change resilient economic benefits; 300,000 tonnes CO^2 reduced emission; 80 institutions to build climate change adaptation (CCA) capacity; 740,000 ha under improved natural resource management (NRM); 14 policy targets to stabilize co-management of NRM and $20 million leveraged from public and private sources to support CREL goals and improve responsiveness to climate change.

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানুষের জীবন-জীবিকা। প্রতিবেশ ও সংরক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বহুমুখী জীবিকায়নের মাধ্যমে জলবায়ু সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ অ্যান্ড লাইভলিহুডস্ (ক্রেল) প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের ৩টি অঞ্চল যথা: উত্তর-পূর্বাঞ্চল (মৌলভীবাজার ও সিলেট), দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল (সুন্দরবন) এলাকায় ক্রেল কাজ করছে। ইউএসএইড-এর অর্থায়নে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, যথা- উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, ওয়ার্ল্ডফিস-বাংলাদেশ, টেট্রাটেক এবং দেশীয় উন্নয়ন সংস্থা, যথা- বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ, সিএনআরএস, কোডেক এবং নেকম-এর মাধ্যমে ক্রেল প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ক্রেল প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। ক্রেল প্রকল্পটি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারীদের আর্থিক ও ব্যবসায়িক উদ্যোগ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং উৎপাদন উপকরণ, ঋণ, বাজার, তথ্য ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করবে যাতে করে সুফলভোগীরা লাভজনকভাবে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে।

বাস্তবায়ন কৌশল
(Implementation strategy)

ক্রেল প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশলের মধ্যে রয়েছে পরিবেশগত, আর্থসামাজিক, নীতিমালা/আইনগত এবং অন্যান্য প্রভাবকগুলোর মোকাবিলা করা যা নির্বাচিত সংরক্ষিত এলাকা ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোকে ঝুঁকির মধ্যে রেখেছে। এজন্য জলাবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে কার্যকর পদ্ধতিগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১. সুন্দরবনসহ অন্যান্য সংরক্ষিত এলাকা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পটি সুন্দরবনসহ অন্যান্য সংরক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কাজ করে যাচ্ছে। সে সাথে প্রাকৃতিক করিডোর সৃষ্টির জন্য সংরক্ষিত এলাকা এবং সংযোগ সৃষ্টিকারী জলাভূমি এবং বনভূমিকে সংরক্ষণভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসার মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোকে জলবায়ু সহিষ্ণুভাবে সম্পদ ব্যবহারে সক্ষম করে তোলা।

২. জলবায়ু সহিষ্ণু বিকল্প, অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি

নির্বাচিত এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কাজের সুযোগ নিশ্চিত করা এবং তাদের জীবিকার মূলভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদকে যেন তারা টেকসইভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় সেই উদ্দেশ্যে এ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে ক্রেল কাজ করছে। প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করতে পরিবেশবান্ধব পর্যটন ও অন্যান্য পরিবেশবান্ধব ব্যবসার সাথে সাথে বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কাজ, যেমন- উন্নত পদ্ধতিতে পুকুরে ও খাঁচায় মাছ চাষ, বাড়ির আঙিনায় সবজিচাষ ও কাজের সুযোগ চিহ্নিত করা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করছে।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলবায়ু সংক্রান্ত ঝুঁকির প্রভাবে মানুষ ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থা

ক্রেল জলবায়ু সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য নবায়ন, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, পরিবীক্ষণ ও পূর্বানুমানসহ ল্যান্ডস্কেপ পরিকল্পনা এবং পূর্বপ্রস্তুতিমূলক বিষয়গুলোকে সংগঠিত করছে। এছাড়াও স্থানীয় অংশীদার ও সুফলভোগীদের মাধ্যমে ঐ এলাকার জনগোষ্ঠীর অবকাঠামো, জীবিকা ও সম্পদ সংক্রান্ত ঝুঁকিগুলো চিহ্নিতকরণ ও মোকাবিলার পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছে। প্রকল্পটি কার্বন মজুদ, কার্বন শোষক বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে সাহায্য করছে, তথা- নতুন

বনভূমি সৃষ্টি, জলাভূমি সংরক্ষণ ও বন-উজাড় রোধ করার মাধ্যমে বন ও জলাভূমিতে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে সহায়তা করছে।

ক্রেল প্রকল্পটি একটি সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় নিম্নরূপ ৪টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে:

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের উন্নত সুশাসন প্রতিষ্ঠা: বাংলাদেশে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে শক্তিশালী করে প্রকল্পটি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করার জন্য কাজ করছে। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর স্থায়িত্বশীলতার ভিত্তি শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য প্রকল্পটি ল্যান্ডস্কেপ পর্যায়ের জ্ঞান বৃদ্ধি করছে এবং এ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করছে, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কার্যকর নীতিমালা, আইন ও কৌশল তৈরিতে সাহায্য করছে। এ প্রক্রিয়ায় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৩২টি জলমহালকে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কাছে হস্তান্তরের মাধ্যমে স্থায়িত্বশীল সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সম্পদ ব্যবহারকারি সংগঠনের সহজ প্রবেশাধিকারের সুযোগ প্রদান, ন্যায়সঙ্গত ও যৌক্তিক পরিমাণ রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে ক্রেল কাজ করছে। ইতোমধ্যে ৮টি জলমহালকে সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ২টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

খ. প্রধান সুফলভোগীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ: প্রাকৃতিক সম্পদের ল্যান্ডস্কেপ কৌশল ও ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল এবং উপকরণ, পদ্ধতি ও প্রযুক্তির বাস্তব প্রয়োগের সাথে সুফলভোগীদের পরিচিত করানোর জন্য প্রকল্পটি বিশেষভাবে তৈরি ব্যবহারিক কোর্স পরিচালনা করছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, পরামর্শ ও অনুদানের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং পেশাগত উন্নয়নের জন্য মূল্যায়ন ও সহায়তা দিচ্ছে। সে সাথে জীববৈচিত্র্যের বৈজ্ঞানিক বিষয়কে নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশগত মূল্যায়ন নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের অংশীদারদের সাথে সমন্বয় সাধন করছে। এ প্রক্রিয়ায় প্রকল্প এলাকার মাঝে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন পেশার জনগোষ্ঠীকে মৎস্যচাষ ও সংশ্লিষ্ট আয়বর্ধক পেশায় প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে যাতে করে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এর পাশাপাশি উক্ত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নততর হয়। সুফলভোগীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে অদ্যাবধি ১০ হাজারের অধিক সদস্যকে বিভিন্ন মেয়াদে মৎস্য ও সবজি চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রায় ১০০ কর্মকর্তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গ. জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, অভিযোজন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ: ক্রেল প্রকল্প জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের উন্নত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্যকর সহ-ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করছে এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করছে। জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদ সহ-ব্যবস্থাপনায় জলজ বৃক্ষরোপণ, সংরক্ষণ, মৎস্য অভয়াশ্রম তৈরি ও ব্যবস্থাপনায় কাজ করছে। এ প্রক্রিয়ায় প্রকল্প এলাকার রক্ষিত এলাকা পরিকল্পনায় চিহ্নিত প্রতিবেশগত ঝুঁকিগুলো নিরসনে সহ-অর্থায়নের সুযোগ তৈরিতে নিঃসর্গ নেটওয়ার্কের অংশীদারদের সাথেও সমন্বয় করছে এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোকে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা প্রদান করছে। এছাড়াও ক্রেল নিয়মিতভাবে প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন জলাশয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন পর্যবেক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য পরিবীক্ষণ করছে।

ঘ. উন্নত, পরিবেশবান্ধব এবং জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকার উন্নয়ন: প্রকল্পটি উন্নত, বিকল্প, বৈচিত্র্যময় এবং পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকার উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে। আর্থিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য ল্যান্ডস্কেপ পর্যায়ের মূল্যায়ন এবং ভ্যালু চেইন পদ্ধতির প্রবর্তনে কাজ করছে। সে সাথে পরিকল্পনা প্রণয়ন, ভ্যালু চেইন তৈরি ও তা শক্তিশালী করা, সংযোগ ও অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা, ব্যবসায়িক উদ্যোগকে প্রেরণা প্রদান ও সেবা খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে।এ প্রকল্পের মাধ্যমে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে পদক্ষেপ গ্রহণের এলাকাভিত্তিক কাঠামোর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

- ৮০,০০০ স্টেকহোল্ডারের জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- ৫,০০,০০০ জন ব্যক্তিকে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন;
- বাৎসরিক ৩,০০,০০০ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ কমিয়ে আনা;
- ৭,৪০,০০০ হেক্টর জলাভূমি ও বনভূমিকে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন; এবং
- ১৪টি নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে সহ-ব্যবস্থাপনায় আনয়ন।

উপসংহার (Conclusion)

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ অ্যান্ড লাইভলিহুডস্ (CREL) প্রকল্পটি মৎস্য অধিদপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিগত জুলাই ২০১৩ থেকে সফলতার সাথে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যা আগামী সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত চলবে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের বিভিন্ন সফলতা মাঠ পর্যায়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর সদস্যগণ এর সুফল পাচ্ছেন। প্রকল্পটি মৎস্য অধিদপ্তরসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে মেয়াদকালীন সময়েই প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

[2] ওয়েটল্যান্ড এন্ড ফিসারিজ স্পেশালিস্ট, ক্রেল প্রকল্প
[3] সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, ওয়ার্ল্ডফিস-বাংলাদেশ
[3] প্রকল্প পরিচালক, ক্রেল প্রকল্প

বঙ্গোপসাগরের কোমলাস্থি মৎস্যসম্পদ ও এর সংরক্ষণ

Cartilaginous Fisheries Resources of Bay of Bengal and its Conservation

প্রফেসর ড. এম নিয়ামুল নাসের

Abstract

The cartilaginous fishes are the top carnivore of the ocean ecosystem. Little information is known from Bangladesh though the Bay of Bengal fish diversity supports sharks and rays of different kinds. However, the catch composition from marine sources showed that the fishery is as by-catch and the volume is usually close to 1 % of the total by-catch. The recent international efforts to conserve the fisheries are little implemented due to lack of information of the fishery. The present paper will highlight the diversity, scope and practice of the conservation of the fishes in Bangladesh perspectives.

কোমলাস্থি (Chondrichthyes) মাছগুলো সাধারণত কম প্রচলিতপণ্য হিসেবে বাজারে আসে। মাছগুলোর দেহ বৈশিষ্ট্যগতভাবে নরম অস্থি (cartilage) দিয়ে তৈরি বলে এদের কোমলাস্থি মাছ বলে। কোমলাস্থি মাছগুলোর মধ্যে হাঙ্গর, হাউসপাতা, পিতাম্বরী, কামোড, বিদ্যুৎ মাছ ইত্যাদি দেখা যায়। বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যখাতের প্রায় ১% এর কাছাকাছি মাছ হলো কোমলাস্থি মাছের পরিমাণ। বিগত ২০০১ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের সমীক্ষায় দেখা যায় মৎস্য অবতরণকেন্দ্রগুলোতে বছরে মাত্র ৪ থেকে ৫ হাজার মে.টন কোমলাস্থি মাছ আহরণ করা হয়। তবে এর পুরোটাই হচ্ছে বাইক্যাচ যা অন্য মাছ যেমন ইলিশ ধরার সময় বা অন্য মাছ ধরার পেতে রাখা জালে ধরা পড়ে। বঙ্গোপসাগরে আহরিত সকল মাছ-ই কোনো না কোনোভাবে ব্যবহার করা হয়। হাঙ্গরের পাখনা একটি অন্যতম রপ্তানি পণ্য। হাউসপাতার ফ্লেশ (flesh)-এর বাজারে চাহিদা রয়েছে। তবে বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের আহরণের কারণে মাছগুলো আজ বিপন্ন। International Union for Conservation of Nature (IUCN)-এর রেড বইয়ের তালিকায় আন্তর্জাতিকভাবে বেশ কয়টি প্রজাতিকে আজ সংরক্ষণের জন্য বলা হচ্ছে।

বাংলাদেশে কোমলাস্থি মাছের বৈচিত্র্য
(Diversity of Chondrichthyes of Bangladesh)

কুদ্দুস ও শফি (১৯৯৫) বঙ্গোপসাগরের ২১টি মাছের বর্ণনা দেন। পরবর্তীতে হারুন (২০১১) ৬৮টি প্রজাতির নামের তালিকা উল্লেখ করলেও অতিসম্প্রতি হক ও হারুন (২০১৪) ৩৫টি মাছের বিশদ বর্ণনা দেন। যার মধ্যে হাঙ্গরজাতীয় (Squaliformes) ১০টি প্রজাতি, স্কেট ও রে-জাতীয় (Rajiformes) ২২টি এবং বিদ্যুৎ রে (Torpediniformes) মাছ ৩টি। হাঙ্গরজাতীয় মাছগুলোর (Squaliformes) শরীর নলাকার এবং ফুলকা শরীরের পাশে অবস্থান করে। স্কেট ও রে-জাতীয় (Rajiformes) এবং বিদ্যুৎ রে (Torpediniformes)-এর শরীর চ্যাপটা এবং ফুলকা শরীরের নিচে অবস্থান করে, তবে বিদ্যুৎ রে মাছগুলোর বিদ্যুৎ অঙ্গ রয়েছে।

কোমলাস্থি মাছ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
(Importance of Conservation of Chondrichthyes)

বাংলাদেশে কোমলাস্থি মাছগুলোর সম্পর্কে খুব কমই তথ্য পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ সংস্থা IUCN-এর ১,০৪৫ প্রজাতির কোমলাস্থি মাছের ওপর পৃথিবীব্যাপী সম্প্রতি এক জরিপের তথ্য মতে, প্রায় ১১% প্রজাতি আজ সঙ্কটাপন্ন, ৪% প্রজাতি বিপন্ন এবং ২% মহাবিপন্ন, ১৩% কোনো না কোনোভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন। তবে সমস্যা হলো বেশির ভাগ কোমলাস্থি মাছের (৪৭%) 'তথ্য অপর্যাপ্ত' অবস্থায় ধরা হয়েছে। IUCN-এর কোমলাস্থি মাছগুলোর তালিকার মধ্যে কমপক্ষে ৯টি প্রজাতি বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় দেখা যায়। বিগত দশকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)ও ৩টির মতো কোমলাস্থি মাছ বাণিজ্যিক বিক্রি বা বিপণন আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

কোমলাস্থি মাছগুলোর বিপন্নতার আরও কারণ হচ্ছে এদের জীবনচক্রের জটিলতা। প্রায় সকল প্রজাতিই বাচ্চা প্রসব করে। তবে বাচ্চার সংখ্যা খুবই কম, যেমন-প্রজাতি ও আকার ভেদে ১টি থেকে ৯০টির মতো। কোমলাস্থি মাছগুলোর আরও সমস্যা হলো যে এদের পরিপক্ব হতে প্রজাতি ভেদে ১ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত লাগে। সুতরাং অল্প সংখ্যক বাচ্চা প্রসব ও বেশি সময় ধরে পরিপক্বতার কারণে মাছগুলোকে সংরক্ষণ করা দুরূহ কাজ, বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেখানে কোমলাস্থি মাছের প্রজনন ক্ষেত্রগুলো জানা নেই, সংরক্ষিত কোনো তথ্যও নেই।

কোমলাস্থি মাছের গবেষণার প্রয়োজনীয়তা
(Importance of Research on Chondrichthyes)

বাংলাদেশে বঙ্গোপসাগরের কোমলাস্থি মাছের জীববৈচিত্র্য, জীববিজ্ঞান ও প্রতিবেশগত তথ্য একেবারেই জানা নেই। তাই কোমলাস্থি মাছের প্রজাতিগত প্রকরণ, জীবনকালীন তথ্য অর্থাৎ বৃদ্ধিহার, খাদ্যাভ্যাস, প্রজনন ইত্যাদি প্রতিবেশগত তথ্য অর্থাৎ বিচরণ ও প্রজননক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করতে হবে। পাশাপাশি অন্যান্য তথ্য যেমন- পর্যাপ্ততা, বাজার চাহিদা ও মূল্য ইত্যাদিও জানতে হবে।

বঙ্গোপসাগরের কয়েকটি কোমলাস্থি মাছ

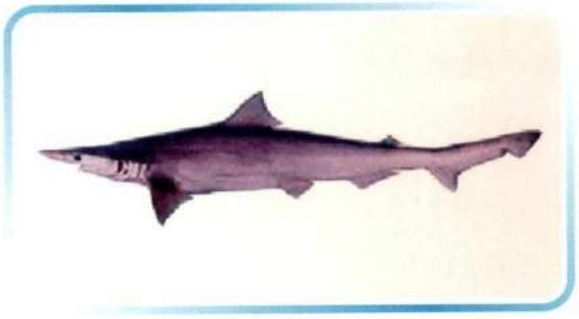

চিত্র: হাঙ্গর (*Scoliodon* sp.)

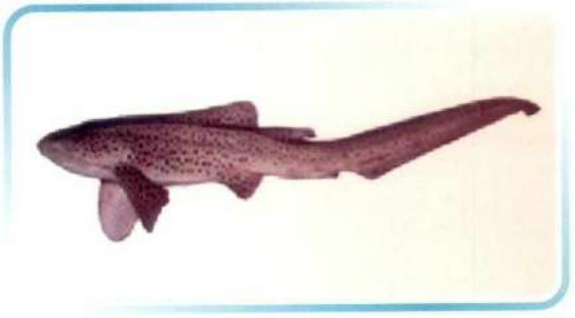

চিত্র: বাঘা হাঙ্গর (*Stegostoma* sp.)

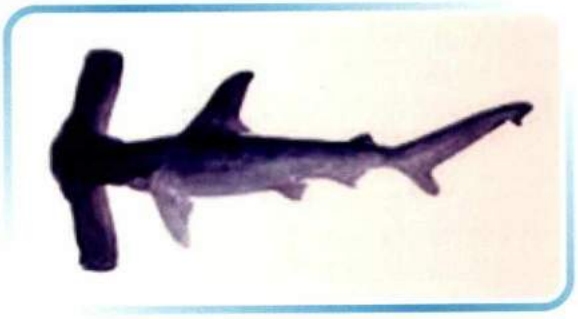

চিত্র: হাতুড়ি হাঙ্গর (*Sphyrna* sp.)

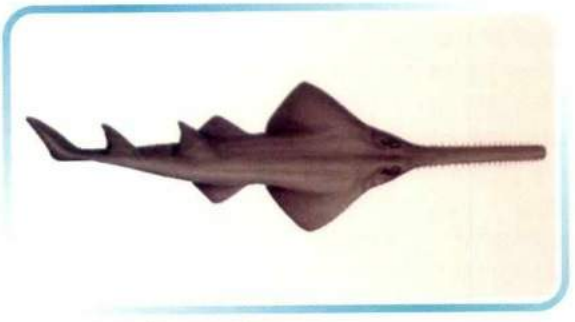

চিত্র: করাতি হাঙ্গর (*Pristis* sp.)

চিত্র: হাউসপাতা (*Dasyatis* sp.)

চিত্র: বিদ্যুৎ রে (*Narcine* sp.)

কতিপয় প্রস্তাবনা (Some proposals)

- কোমলাস্থি মাছের গবেষণার কাজ অতিসত্বর শুরু করতে হবে;
- কোমলাস্থি মাছের পাখনা ফিসারি (shark fin fishery) সম্পর্কে আরও তথ্যগত জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে;
- হাঙ্গর মিল, লিভার অয়েল, মাংস রপ্তানি ইত্যাদির পণ্যগতমান ও বাজার যাচাই করতে হবে;
- কোমলাস্থি মাছের সংরক্ষণে কার্যকর পলিসি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- তথ্যসংগ্রহে ও বিশ্লেষণে প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক গবেষণাগারের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হালদা নদীর অনন্য বৈচিত্র্য ও বর্তমান অবস্থা

Unique Features and Present Status of Halda River

শেখ মুস্তাফিজুর রহমান[১] ও প্রভাতী দেব[২]

Abstract

The Halda is the only tidal influenced river and an unique natural breeding habitat for Indian major carps in Bangladesh. It originates from Halda Chora of Ramgrah upazila under Khagrachari district and discharging into the Karnaphuli river confluence, covering almost 82 km. The main sources of water for this river are numerous hill-streamlets and canals. Fishermen and egg collectors collect naturally fertilized eggs of *Catla catla, Labeo rohita, Cirrhinus cirrhosa* and *Labeo calbasu* during April to June. Halda major carps are unique because of pure gene pool having fast growing and disease resistant quality. Halda is considered as natural gene-bank for major carps in Bangladesh. Due to natural and manmade interventions, the production of Halda spawn has considerably been declined in the last decade. The lowest production was recorded in 2004. During the recent past the situation has considerably improved due to several socio-eco-friendly interventions of the government. Improved hatchery facilities has been introduced to reduce mortality of spawn and improve socio-economic condition of Halda dependent fishers and egg collectors. At the same time 40 km area declared as sanctuary. The river should be given due importance as one of the renewable national resource and should be handled more judiciously. This article provides some inherent features of Halda and given some recommendations for rational use of this unique resource.

হালদা নদী বাংলাদেশের রুইজাতীয় মাছের এক অনন্য প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র এবং বলা যায় একমাত্র বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক জিন ব্যাংক। প্রাপ্ত তথ্য মতে এটি বিশ্বের একমাত্র জোয়ার-ভাটা নদী, যেখান থেকে সরাসরি রুইজাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করা হয়। কাজেই প্রাকৃতিক এ জিন পুল বাঁচিয়ে রাখার জন্য হালদা নদীর যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত জরুরি ও অপরিহার্য।

হালদা নদী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় উপজেলার বাদনাতলী পাহাড়শ্রেণি থেকে উৎপন্ন হয়ে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি, হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলা হয়ে চট্টগ্রাম শহরের চান্দগাঁও থানার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলি নদীতে মিশেছে। অসংখ্য ছোট ছোট ছড়া, ঝিরি, ক্রমাগত একত্রিত হয়ে হালদা নদীর সৃষ্টি। এটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৮২ কিলোমিটার এবং নদীর প্রস্থ স্থানভেদে ৪৫ মিটার থেকে ২১৫ মিটার। উৎসমুখের পর থেকে বোয়ালিয়া, চ্যাংখালী, সোনাইমুখী, কাগতিয়া, পরালি, মোগদাই, কুমারখালী, মাদারী, বইজাখালী, কাটাখালী, খন্দকিয়াও সাকারদাসহ প্রায় ১৮টি খাল ও প্রায় ৩৪টি ছোট পাহাড়ি ছড়া হালদা নদীতে মিশেছে। কর্ণফুলী মোহনায় মৌসুমভেদে জোয়ার ভাটায় ২ থেকে ৪ মিটার পর্যন্ত পানি ওঠানামা করে। ভরা বর্ষায় পানির গভীরতা স্থানভেদে ৪ থেকে ২০ মিটার পর্যন্ত হয়। প্রজনন সময়ে রুইজাতীয় মাছ হালদা নদীতে ডিম ছাড়ে। ডিম সংগ্রহকারীগণ নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে উৎপাদিত রেণু মৎস্যচাষিদের কাছে বিক্রি করে। অপরিকল্পিতভাবে কৃষি কাজ ও ওয়াসা কর্তৃক সুপেয় পানির চাহিদা মেটাতে পানি উত্তোলন এবং তীরবর্তী এলাকায় ইটভাটা ও কলকারখানা স্থাপন হালদা নদীর প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা ব্যাপকভাবে ব্যাহত করছে। অনিয়ন্ত্রিত নৌপরিবহন ও অবৈধভাবে বালু উত্তোলনও ব্যাপকভাবে ক্ষতি করছে এ নদীর উৎপাদনশীলতা। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এ নদীর রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান। এ নদীতে আছে প্রায় বিপন্ন প্রজাতির ডলফিন, যার স্থানীয় নাম শুশুক।

রুইজাতীয় মাছের অনন্য প্রজননক্ষেত্র

(Unique breeding ground for carps)

বাংলাদেশের বর্ধিত জনগোষ্ঠীর আমিষ চাহিদাপূরণ ও চাষ সম্ভাবনার নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতি হলো রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউস। বদ্ধ জলাশয়ে এসব প্রজাতির চাষ এবং পরিপক্ব করা সম্ভব হলেও এরা সেখানে প্রজনন করে না। এদের প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গের মধ্যে রয়েছে জলাশয়ের বাঁক, পানির স্রোত, বৃষ্টি, উপযুক্ত তাপমাত্রা, ঘোলাত্ব ইত্যাদি। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত হালদা নদীর ভৌত-রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, যথা- চাঁদের অবস্থান (পূর্ণিমা/অমাবশ্যা), বৃষ্টিপাত (১.০-২.৮৮ সেমি), পানির স্রোত (১৬.৫-৮৫ সেমি/সেকেন্ড), তাপমাত্রা (২৫-২৮° সে.), ঘোলাত্ব (৩০০-২১৫০ পিপিএম), পিএইচ (৭-৮), লবণাক্ততা (০ পিপিটি), দ্রবীভূত অক্সিজেন (+৬.৬ পিপিএম) ইত্যাদি সব বৈশিষ্ট্যই রুইজাতীয় মাছের প্রজননের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হওয়ায় রুইজাতীয় মাছ এখানে ডিম ছাড়ে। এ দেশে রুই জাতীয় মাছের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে অত্যন্ত সুপরিচিত অন্যান্য বৃহৎ নদী যেমন- পদ্মা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের সাথে হালদা নদীর কোনো সরাসরি সংযোগ নেই বিধায় হালদা নদীর কার্প মাছের জীনগত স্টক সম্পূর্ণ অবিকৃত রয়েছে। নৌপথে যোগাযোগ সুগম করার নিমিত্ত অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে ইতোমধ্যেই হালদা নদীর মোট ১১টি বাঁক কেটে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করিয়ে দেয়ায় হালদার প্রজননক্ষেত্র আজ বিপদাপন্ন। অনতিবিলম্বে হালদা নদীর ওপর নির্ভরশীল সুফলভোগী

ও সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারগণ কর্তৃক সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে হালদা থেকে বিশুদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ জীনগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রুইজাতীয় মাছের রেণু প্রাপ্তি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নদীর অবক্ষয় ও উত্তরণের সম্ভাব্য উপায়
(Degradation of the river and possible ways for improvement)

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত, সমুদ্রের উপরিতলের উচ্চতা বৃদ্ধি, অধিকতর মিষ্টি পানির এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, পলিপড়ার কারণে নদীর গভীরতা হ্রাস, গতিপথ পরিবর্তন, অব্যাহত ভাঙ্গন ইত্যাদিসহ মনুষ্যসৃষ্ট কারণে হালদা আজ আগের মতো নেই। এ নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ অবক্ষয়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো:

- নদীর বাঁক কর্তন;
- রাবার ও কংক্রিট ড্যাম নির্মাণ;
- নদীর পাড়ে ইট ভাটা ও কলকারখানা স্থাপন;
- অপরিকল্পিতভাবে ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ;
- নদী হতে বালু উত্তোলন;
- প্রজননক্ষেত্রে স্লুইস গেইটজনিত প্রতিবন্ধকতা;
- ওয়াসা কর্তৃক পানি উত্তোলন;
- ছোট-বড় নৌযানের অনিয়ন্ত্রিত চলাচল;
- নদী পাড়ে চাষকৃত ফসলের ক্ষেতে নির্বিচারে অবৈধ কীটনাশকের ব্যবহার;
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে স্বল্প পরিমাণ পানি অবমুক্তকরণ;
- হালদা নদীতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশজনিত দূষণ; এবং
- পানি দূষণ।

অতিসম্প্রতি (১৯ জুন ২০১৫) নদী সংলগ্ন বোয়ালখালী খালের রেলওয়ে ব্রীজ ভেঙ্গে তিনটি তেলবাহী ওয়াগন পানিতে নিমজ্জিত হয় এবং প্রায় ৫০-৬০ হাজার লিটার ফার্নেস তেল খালের পানিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা জোয়ারের সাথে হালদা নদীতে প্রবেশ করে মারাত্মক দূষণের সৃষ্টি করে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ
(Steps taken by the government)

হালদা নদীর অনন্য বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সরকার জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র পুনরুদ্ধার শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো:

- হালদা নদী হতে সংগৃহীত ডিমের হ্যাচিংরেট বৃদ্ধির লক্ষ্যে হালদা তীরে ছয়টি হ্যাচিং ইউনিট নির্মাণ;
- প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ৫১৫০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ;
- ব্রুড মাছ বৃদ্ধিকল্পে হালদার রেণু হতে উৎপাদিত মোট ৮১৫৬ কেজি রুইজাতীয় মাছের পোনা অবমুক্তকরণ;
- হালদার ডিম হতে উৎপাদিত রেণু প্রতিপালনের জন্য নদীর তীরে বিভিন্ন আকারের ২৪টি পুকুর খনন;
- হালদা নদীতে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি;
- নদী তীরবর্তী এলাকায় ২০ হাজার গাছের চারা রোপণ;
- বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ২৩০০ জন সুফলভোগীর মাঝে ১০ হাজার টাকা হারে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ;
- বিএফআরআই কর্তৃক হালদা নদীর ভৌত-রাসায়নিক ও জৈবিক অবস্থার ওপর গবেষণা পরিচালনার পাশাপাশি আইডব্লিউএম কর্তৃক নদীর শাসনের ওপর স্টাডি; এবং
- নদী তীরবর্তী ডিম সংগ্রহকারী ও মৎস্যজীবীদের বেইজলাইন সার্ভে।

বিগত ১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি'র ৩য় সভায় হালদা নদীর প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা যাতে হুমকির সম্মুখীন না হয় সেজন্য একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা নিম্নরূপ:

> মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা (genetic purity) অক্ষুণ্ন রাখতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বাংলাদেশের রুইজাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণের নিমিত্ত হালদা নদীকেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, ওয়াসা এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমন্বয় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ; মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর; জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য জরিপ ও পরিকল্পনা) সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে হালদা নদী সংলগ্ন সংসদীয় আসনসমূহের মাননীয় সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টা হিসেবে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। কমিটির কার্যপরিধি হিসেবে হালদা নদীর প্রবাহ ও গতি বৃদ্ধি, খালের পানিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা হ্রাস, স্লুইস গেটসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, বাঁক পুনরুদ্ধার, প্রজননক্ষম মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি, ক্যাচমেন্ট এলাকায় বৃক্ষ নিধন রোধ, দূষণ রোধ ইত্যাদি বিষয় প্রস্তাব করা হয়েছে।

উপসংহার (Conclusion)

হালদা নদী শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বের একটি অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ। কাজেই এ নদীর সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এ নদীর প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে সরকার কর্তৃক অপর একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শুধু সরকার নয়, সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ নদী রক্ষার দায়িত্ব সঠিক ও সুচারুরূপে পালন করতে হবে, যার মাধ্যমে প্রকৃতির এ অনন্যদানের সুফল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চালিত হবে।

[১]প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
[২]জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম

বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন
(২০১৩-১৪)

মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্র	জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)	শতকরা অংশ (%)	উৎপাদন হার (কেজি/হেক্টর)
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়				
১. মুক্ত জলাশয়				
(১) নদী ও মোহনা	৮৫৩,৮৬৩	১৬৭৩৭৩	৪.৭২	১৯৬
(২) সুন্দরবন	১৭৭৭০০	১৮৩৬৬	০.৫২	১০৩
(৩) বিল	১১৪১৬১	৮৮৯১১	২.৫১	৭৭৯
(৪) কাপ্তাই লেক	৬৮৮০০	৮১৭৯	০.২৩	১১৯
(৫) প্লাবনভূমি	২৬৯৫৫২৯	৭১২৯৭৬	২০.০৯	২৬৫
উপমোট	**৩৯১০০৫৩**	**৯৯৫৮০৫**	২৮.০৭	
২. বদ্ধ জলাশয়				
(৬) পুকুর	৩৭১৩০৯	১৫২৬১৬০	৪৩.০১	৪১১০
(৭) মৌসুমি চাষ জলাশয়	১৩০৪৮৮	১৯৩৩০৩	৫.৪৫	১৪৮১
(৮) বাঁওড়	৫৪৮৮	৬৫১৪	০.১৮	১১৮৭
(৯) চিংড়ি খামার	২৭৫২৭৪	২১৬৪৪৭	৬.১০	৭৮৬
(১০) পেন কালচার	৬৭৭৫	১৩০৫৪	০.৩৭	১৯২৭
(১১) খাঁচায় মাছচাষ	৭	১৪৪৭	০.০৪	২২ কেজি/ঘনমিটার
উপমোট	৭৮৯৩৪১	১৯৫৬৯২৫	৫৫.১৫	-
মোট অভ্যন্তরীণ জলাশয়	**৪৬৯৯৩৯৪**	**২৯৫২৭৩০**	**৮৩.২২**	-
খ. সামুদ্রিক জলসম্পদ	-			-
(১২) ট্রল ফিসিং	-	৭৬৮৮৫	২.১৭	-
(১৩) আর্টিসেনাল ফিসিং	-	৫১৮৫০০	১৪.৬১	-
মোট সামুদ্রিক জলাশয়	-	**৫৯৫৩৮৫**	**১৬.৭৮**	-
সর্বমোট	-	**৩৫৪৮১১৫**	**১০০**	-

বিগত ১৫ বছরে চিংড়ির উৎপাদন

বছর	চিংড়ির উৎপাদন (মে.টন)						সর্বমোট	চাষকৃত চিংড়ির শতকরা হার
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়			সামুদ্রিক জলাশয়				
	উন্মুক্ত	চাষকৃত	মোট	ট্রলার	আর্টিসনাল	মোট		
১৯৯৯-০০	৪৩১৬৭	৬৪৬৪৭	১০৭৮১৪	২৯১৫	২৮৪৮০	৩১৩৯৫	১৩৯২০৯	৪৬.৪৪
২০০০-০১	৪৪৩৪৩	৬৪৯৭০	১০৯৩১৩	৩১৭২	২৭৮৬৫	৩১০৩৭	১৪০৩৫০	৪৬.২৯
২০০১-০২	৫৪৯৬৫	৬৫৫৭৯	১২০৫৪৪	৩১৬৮	২৮৮০৮	৩১৯৭৬	১৫২৫২০	৪৩.০০
২০০২-০৩	৬০৮৭৬	৬৬৭০৩	১২৭৫৭৯	২৪৮৬	২৯৪৪৫	৩১৯৩১	১৫৯৫১০	৪১.৮২
২০০৩-০৪	৬৩১০৩	৭৫১৬৭	১৩৮২৭০	৩০৭৫	৩৩৪১৩	৩৬৪৮৮	১৭৪৭৫৮	৪৩.০১
২০০৪-০৫	৬৮৭৬৮	৮২৬৬১	১৫১৪২৯	৩৩১১	৪০৯৫০	৪৪২৬১	১৯৫৬৯০	৪২.২৪
২০০৫-০৬	৭৭৩৮১	৮৫৫১০	১৬২৮৯১	৩৪৪৪	৪৪৬৭৫	৪৮১১৯	২১১০১০	৪০.৫২
২০০৬-০৭	৮২৪২২	৮৬৮৪০	১৬৯২৬২	২১৭৫	৪৯৬৯৪	৫১৮৬৯	২২১১৩১	৩৯.২৭
২০০৭-০৮	৭৫৬৭৮	৯৪২১১	১৬৯৮৮৯	২৬২০	৫০৫৮৬	৫৩২০৬	২২৩০৯৩	৪২.২৩
২০০৮-০৯	৮৯৯০১	১০২৮৫৪	১৯২৭৫৫	২৯৩২	৪৯২৮৫	৫২২১৭	২৪৪৯৭২	৪২.০০
২০০৯-১০	৪৬৩৮৮	৮৭৯৭২	১৩৪৩০০	২৪৯৬	৫০০৯৬	৫২৫৯২	১৮৬৮৯২	৪৭.০৭
২০১০-১১	৫৭৯২২	১২৪৬৪৮	১৮২৫৭০.৭৬	২৭৮৫	৫৪২০৪	৫৬৯৭৯	২৩৯৪৬০	৫২.০৫
২০১১-১২	৫৭৬৮৮	১৩৭১৭৫	১৯৪৮৬৩	২২১২	৫৫৪৪৮	৫৭৬৬০	২৫২৫২৩	৫৪.৩২
২০১২-১৩	৪৫০১৩	১৪০২৬১	১৮৫২৭৪	৩০৮৩	৪৩৪৮৫	৪৬৫৬৮	২৩১৮৪২	৬০.৫০
২০১৩-১৪	৪৭৮০৭	১২৮৩১৩	১৭৬১২০	৩৭৯৯	৪৩৮৬৯	৪৭৬৬৮	২২৩৭৮৮	৫৭.৩৪

বিগত ১৫ বছরে ইলিশের উৎপাদন

বছর	ইলিশের উৎপাদন (মে.টন)			বৃদ্ধির হার
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়	সামুদ্রিক জলাশয়	মোট	
১৯৯৯-০০	৭৯১৬৫	১৪০৩৬৭	২১৯৫৩২	২.৩৪
২০০০-০১	৭৫০৬০	১৫৪৬৫৪	২২৯৭১৪	৪.৬৪
২০০১-০২	৬৮২৫০	১৫২৩৪৩	২২০৫৯৩	-৩.৯৭
২০০২-০৩	৬২৯৪৪	১৩৬০৮৮	১৯৯০৩২	-৯.৭৭
২০০৩-০৪	৭১০০১	১৮৪৮৩৭	২৫৫৮৩৯	২৮.৫৪
২০০৪-০৫	৭৭৪৯৯	১৯৮৩৬৩	২৭৫৮৬২	৭.৮৩
২০০৫-০৬	৭৮২৭৩	১৯৮৮৫০	২৭৭১২৩	০.৪৬
২০০৬-০৭	৮২৪৪৫	১৯৬৭৪৪	২৭৯১৮৯	০.৭৫
২০০৭-০৮	৮৯,৯০০	২০০১০০	২৯০০০০	৩.৮৭
২০০৮-০৯	৯৫,৯৭০	২০২,৯৫১	২৯৮৯২১	৩.০৮
২০০৯-১০	১১৪৭৬৮	১৯৮৫৭৪	৩১৩৩৪২	৪.৮২
২০১০-১১	১১৪৫২০	২২৫৩২৫	৩৩৯৮৪৫	৮.৪৬
২০১১-১২	১১৪৪৭৫	২৩২০৩৭	৩৪৬৫১২	১.৯৬
২০১২-১৩	৯৮৬৪৮	২৫২৫৭৫	৩৫১২২৩	১.৩৬
২০১৩-১৪	১২৭৫১৪	২৫৭৬২৬	৩৮৫১৪০	৯.৬৬

বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য

পরিমাণঃ মেট্রিক টন

মূল্যঃ কোটি টাকা

বৎসর	হিমায়িত চিংড়ি		জীবিত মাছ		হিমায়িত মাছ		শুটকি মাছ		লবণাক্ত ও পানিশুন্য মাছ		কাকড়া/ ইল		হাঙ্গরের পাখনা এবং মাছের ফোটকা		অন্যান্য		মোট		মোট রপ্তানি আয়ের হার
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	%
১৯৯৯-০০	২৮৫১৪	১৬১২.১৫			৯৪৮৪	১৩৭.১৯	২১৫	৩.৬৫	৮০৯	২৫.৯৬	১০৭	১.৪৪	২৬২	৩১.১৭			৩৯৩৯১	১৮১১.৫৬	৬.২৮
২০০০-০১	২৯৭১৩	১৮৮৫.১৫			৭৯৬৫	৯৪.৮৯	১৩৭	২.০২	৮৩৮	২৭.৭৩	১৫৪	২.৩৩	১৮১	২০.৬৩			৩৮৯৮৮	২০৩২.৭৫	৫.৭৭
২০০১-০২	৩০২০৯	১৪৪৭.৭৬			৯৮৬৪	১৩৭.৩৯	৫১৭	৮.৩২	২৯৩	৯.৫৩	৩৩৬	৭.০৭	২৬৩	২৭.০৭			৪১৪৮২	১৬৩৭.১৪	৪.৭৬
২০০২-০৩	৩৬৮৬৪	১৭১৯.৮৮			৮৮৪৬	১৫৮.৬৪	৩৩৩	৭.০২	৫২৬	১৯.১২	৬৩০	১৪.৫৮	১৭২	২২.৩৫			৪৭৩৭১	১৯৪১.৫৯	৫.১০
২০০৩-০৪	৪২৯৪৩	২১৫২.৭৭			১০২২৯	২০২.২৪	৪৭২	৪.১৬	৩৭৭	১.৩৮	১১৬	১.৩৯	৪	১.৫৩			৫৪১৪১	২৩৬৩.৪৭	৫.৭১
২০০৪-০৫	৪৬৫৩৩	২২৮১.৫৯			১৫৭৬৩	২৫৬.২০	২৭২	৩.৭১	৭৭০	২৮.৯৭	৩৮	০.৮৬	১	০.৩৯			৬৩৩৭৭	২৫৭১.৭২	৫.৯০
২০০৫-০৬	৪৯৩১৭	২৬৯৮.৩৫	৫৭	০.৪৮	১৭৪২৯	২৯৪.১৪	১৫০	২.১৯	৫৯১	১৯.৮৪	১১০৭	১২.৯৫	৭৮	০.৮০	১০০	১.০৯	৬৮৮২৯	৩০২৯.৮৪	৪.৫৬
২০০৬-০৭	৫৩৩৬১	২৯৯২.৩৩	৪	০.০৭	১৮৩৭৬	৩২৫.৯০	৭৭	১.৩৪	৪৪১	১২.৮০	১১২৩	১৫.৪৮	২৪৪	৪.১১	৭৮	০.৮৬	৭৩৭০৪	৩৩৫২.৮৯	৪.৯০
২০০৭-০৮	৪৯৯০৭	২৮৬৩.৯২	১০	০.১৫	২৩৫১৫	৪৯৫.৪৬	২১০	২.৬৭	৬৫৮	২৬.৯৭	৪৩৯	৪.৮৮	২৬৬	১.৮২	২৯৪	০.৪১	৭৫২৯৯	৩৩৯৬.২৮	৪.০৪
২০০৮-০৯	৫০৩৬৮	২৭৪৪.১২	০.৩	০.০০৬	১৯২৯৪	৪৫০.৯০	৩৪১	১১.৯৯	৮৪	৩.৯২	১২১৭	১১.৯৮	২৭৬	১.৭৭	১৩০৮	১৮.৭৩	৭২৮৮৮	৩২৪৩.৪১	৩.০০
২০০৯-১০	৫১৫৯৯	২৮৮৫.২১	১৭৮৩	১৩.২২	২১৪৬৪	৪৫৮.১১	৬২২	২৫.০৬	০	০	৬৯২	১০.৪১	৯৫৫	১২.৬৬	৫২৮	৩.৮৫	৭৭৬৪৩	৩৪০৮.৫২	২.৭২
২০১০-১১	৫৪৮৯১	৩৫৬৮.২	০.৬	০.০৪৫	৩৩১১২	১২১১.০৫	৬২৩	৫.৫৭	৫৭৬.৮	৩০.৮৬	৪৪৮৫	৫৪.১১	০০	০০	২৭৮০	৩৪.০	৯৬৪৬৯	৪৬০৩.৮৩	২.৭৩
২০১১-১২	৪৮০০৭	৩৬৪০.২	০.৪৬	০.০৪	৩৪৫৩৯	৯১৬.৯২	৯৯৬	৯.৪৩	৪১১	২৭.৪৬	৫৭৬৭	৯৫.৭৭	০০	০০	২৭৫৮	১৪.১৪	৯২৪৭৯	৪৭০৩.৯৫	২.৪৬
২০১২-১৩	৫০৩৩৩	৩৩৭৬.২	০	০	১১৪৩৫	৩১৬.৩৬	১২৭৮	৩৬.০৩	০	০	৭৪২৮	১৬৯.৪৯	১	০.০৯	২৫৯৯	১৩.৯৩	৮৪৯০৫	৪১৫৮.৯৭	২.০১
২০১৩-১৪	৪৭৬৩৫	৪১১৮.৮	০	০	১১৬৭৭	৩৩৭.১১	২৬৩৪	২৯.৬৭	২৬১	২১.৬৫	৭৭০৭	১৬৪.৭৫	০	০	২৩৯৩	১৫.৮৯	৭৭৩২৮	৪৭৭৬.৯২	২.০৯

বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা (১৯৯৯-০০ হতে ২০১৩-১৪)

(এককঃ মে.টন)

মৎস্য সেক্টর	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়	**১৩২৭৫৮৫**	**১৪০১৫৬০**	**১৪৭৫০৩৯**	**১৫৬৬২৮৯**	**১৬৪৬৮১৯**	**১৭৪১৩৬০**	**১৮৪৮৭৩৫**	১৯৫২৫৭৩	**২০৬৫৭২৩**	২১৮৬৭২৬	২৩৮১৯১৬	২৫১৫৩৫৪	২৬৮৩১৬২	২৮২১২৬৬	২৯৫২৭৩০
(১) মুক্ত জলাশয়	৬৭০৪৬৫	৬৮৮৯২০	৬৮৮৪৩৫	৭০৯৩৩৩	৭৩২০৬৭	৮৫৯২৬৯	৯৫৬৬৮৬	১০০৬৭৬১	১০৬০১৮১	১১২৩৯২৫	১০২৯৯৩৭	১০৫৪৫৮৫	৯৫৭০৯৫	৯৬১৪৫৮	৯৯৫৮০৫
১. নদী ও মোহনা	১৫৪৩৩৫	১৫০১২৯	১৪৩৫৯২	১৩৭৮৪৮	১৩৭৩৩৭	১৩৯৭৯৮	১৩৭৮৫৯	১৩৬৯৫৮	১৩৬৮১২	১৩৮১৬০	১৪১১৪৮	১৪৪৫৬৬	১৪৫৬১৩	১৪৭২৬৪	১৬৭৩৭৩
২. সুন্দরবন	১১৬৪৮	১২০৩৫	১২৩৪৫	১৩৮৮৪	১৫২৪২	১৫৭২৪	১৬৪২৩	১৭৭৫১	১৮১৫১	১৮৪৬২	২০৪৩৭	২২৪৫১	২১৬১০	১৫৯৪৫	১৮৩৬৬
৩. বিল	৭২৮২৫	৭৪৫২৭	৭৬১০১	৭৫৪৬০	৭৪৩২৮	৭৪৯২৫	৭৬৩৬৫	৭৫১৩৭	৭৭৫২৪	৭৯২০০	৭৯২০৯	৮১৫৬৪	৮৫২০৮	৮৭৯০২	৮৮৯১১
৪. কাপ্তাইলেক	৬৮৫২	৭০৫১	৭২৪৭	৭০২৫	৭২৩৮	৭৩৭৯	৭৫৪৮	৮০৮৫	৮২৪৮	৮৫৯০	৭৩৩৬	৮৯৮০	৮৫৩৭	৯০১৭	৮১৭৯
৫. প্লাবন ভুমি	৪২৪৮০৫	৪৪৫১৭৮	৪৪৯১৫০	৪৭৫১১৬	৪৯৭৯২২	৬২১৪৪৩	৭১৮৪৯১	৭৬৮৮৩০	৮১৯৪৪৬	৮৭৯৫১৩	৭৮১৮০৭	৭৯৭০৪	৬৯৬১২৭	৭০১৩৩০	৭১২৯৭৬
(২) বদ্ধ জলাশয়	৬৫৭১২০	৭১২৬৪০	৭৮৬৬০৪	৮৫৬৯৫৬	৯১৪৭৫২	৮৮২০৯১	৮৯২০৪৯	৯৪৫৮১২	১০০৫৫৪২	১০৬২৮০১	১৩৫১৯৭৯	১৪৬০৭৬৯	১৭২৬০৬৭	১৮৫৯৮০৮	১৯৫৬৯২৫
১. পুকুর	৫৬১০৫০	৬১৫৮২৫	৬৮৫১০৭	৭৫২০৫৪	৭৯৫৮১০	৭৫৬৯৯৩	৭৫৯৬২৮	৮১১৯৫৪	৮৬৬০৪৯	৯১২১৭৮	১১৪০৪৮৫	১২১৯৭৩৬	১৩৪২২৮২	১৪৪৬৫৯৪	১৫২৬১৬০
২. মৌসুমী চাষ জলাশয় (প্লাবনভূমি)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৪৬৯০২	৫১২৩০	১৮২২৯৩	২০০৮৩৩	১৯৩৩০৩
৩. বাঁওড়	৩৬২২	৩৮০১	৩৮৯২	৪০৯৮	৪২৮২	৪৩৮৮	৪৪৯৮	৪৬৯৮	৪৭৭৮	৫০৩৮	৮৭২৭	৪৮৬৪	৫১৮৬	৬১৪৬	৬৫১৪
৪. চিংড়ি খামার	৯২৪৪৮	৯৩০১৪	৯৭৬০৫	১০০৮০৪	১১৪৬৬০	১২০৭১০	১২৭৯২৩	১২৯১৬০	১৩৪৭১৫	১৪৫৫৮৫	১৫৫৮৬৬	১৮৪৯৩৯	১৯৬৩০৬	২০৬২৩৫	২১৬৪৪৭
৫. পেন কালচার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৩০৫৪
৬. খাঁচায় মাছ চাষ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৪৪৭
খ. সামুদ্রিক জলাশয়	**৩৩৩৭৯৯**	**৩৭৯৪৯৭**	**৪১৫৪২০**	**৪৩১৯০৮**	**৪৫৫২০৭**	**৪৭৪৫৯৭**	**৪৭৯৮১০**	**৪৮৭৪৩৮**	**৪৯৭৫৭৩**	**৫১৪৬৪৪**	**৫১৭২৮২**	**৫৪৬৩৩৩**	**৫৭৮৬২০**	**৫৮৮৯৮৮**	**৫৯৫৩৮৫**
১. ট্রলার	১৬৩০৪	২৩৯০১	২৫১৬৫	২৭৯৫৪	৩২৬০৬	৩৪১১৪	৩৪১৮৪	৩৫৩৯১	৩৪১৫৯	৩৫৪২৯	৩৪১৮২	৪১৬৬৫	৭৩৩৮৬	৭৩০৩০	৭৬৮৮৫
২. আর্টিসেনাল	**৩১৭৪৫৯**	৩৫৫৫৯৬	৩৯০২৫৫	৪০৩৯৫৪	৪২২৬০১	৪৪০৪৮৩	৪৪৫৭২৬	৪৫২০৪৭	৪৬৩৪১৪	৪৭৯২১৫	৪৮৩১০০	৫০৪৬৬৮	৫০৫২৩৪	৫১৫৯৫৮	**৫১৮৫০০**
সর্বমোট	১৬৬১৩৮৪	**১৭৮১০৫৭**	**১৮৯০৪৫৯**	**১৯৯৮১৯৭**	**২১০২০২৬**	**২২১৫৯৫৭**	**২৩২৮৫৪৫**	**২৪৪০০১১**	**২৫৬৩২৯৬**	**২৭০১৩৭০**	**২৮৯৯১৯৮**	**৩০৬১৬৮৭**	**৩২৬১৭৮২**	**৩৪১০২৫৪**	**৩৫৪৮১১৫**
বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার	৭.০২	৭.২০	৬.১৪	৫.৭০	৫.২০	৫.৪২	৫.০৮	৪.৭৯	৫.০৫	৫.৩৯	৭.৩২	৫.৬০	৬.৫৪	৪.৫৫	৪.০৪

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য কণিকা (২০১৩-১৪)

১.	**অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ**		
	ক. বদ্ধ জলাশয়	:	৭৮৯৩৪১ হেক্টর
	▪ পুকুর	:	৩৭১৩০৯ হেক্টর
	▪ বাঁওড়	:	৫৪৮৮ হেক্টর
	▪ চিংড়ি খামার	:	২৭৫২৭৪ হেক্টর
	▪ পেন কালচার	:	৬৭৭৫ হেক্টর
	▪ খাঁচায় মাছ চাষ	:	৭ হেক্টর
	▪ মৌসুমি জলাশয়	:	১৩০৪৮৮ হেক্টর
	খ. উন্মুক্ত জলাশয়	:	৩৯১০০৫৩ হেক্টর
	▪ নদী ও মোহনা	:	৮৫৩৮৬৩ হেক্টর
	▪ সুন্দরবন	:	১৭৭৭০০ হেক্টর
	▪ বিল	:	১১৪১৬১ হেক্টর
	▪ কাপ্তাই লেক	:	৬৮৮০০ হেক্টর
	▪ প্লাবনভূমি	:	২৬৯৫৫২৯ হেক্টর
	গ. সামুদ্রিক জলসম্পদ		
	▪ সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ	:	১১৮৮১৩ বর্গ কিলোমিটার
	▪ উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি	:	৭১০ কিলোমিটার
২.	**মৎস্য উৎপাদন ও মূল্যমান**		
	▪ মৎস্য উৎপাদন	:	৩৫৪৮১১৫ মে.টন
	▪ উৎপাদিত মাছের বর্তমান বাজার মূল্য	:	৫৩৩১৬ কোটি টাকা
৩.	**মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি**		
	▪ রপ্তানির পরিমাণ	:	৭৭৩২৮ মে.টন
	▪ রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন	:	৪৮৯৮.২২ কোটি টাকা
	▪ মোট রপ্তানিতে মৎস্য খাতের অবদান	:	২.০১%
৪.	**জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান**		
	▪ জাতীয় জিডিপিতে অবদান	:	৩.৬৯%
	▪ কৃষিজ জিডিপিতে অবদান	:	২২.৬০%
৫.	**জনপ্রতি মাছ গ্রহণ ও চাহিদা**		
	▪ জনপ্রতি বার্ষিক মাছ গ্রহণ	:	১৯.৩০ কেজি
	▪ জনপ্রতি মাছের বার্ষিক চাহিদা	:	২১.৯০ কেজি
	▪ জনপ্রতি মাছের দৈনিক চাহিদা	:	৬০ গ্রাম
	▪ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে অবদান (প্রায়)	:	৬০%
৬.	**মৎস্য/চিংড়ি চাষি ও জেলে**		
	▪ মৎস্য ও চিংড়ি চাষে সম্পৃক্ত চাষি (অনুমিত)	:	৪০.০০ লক্ষ
	▪ জেলের সংখ্যা (অনুমিত)	:	২০.০০ লক্ষ

৭.	**উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম**		
	▪ বাণিজ্যিক ট্রলার	:	১৮৪টি
	▪ ইঞ্জিন চালিত নৌকা	:	৩২৮৫৯টি
	▪ ইঞ্জিন বিহীন নৌকা	:	৩৪৮১০টি
	▪ মাছ ধরার জাল ও বড়শি	:	১৮৩৭৭৭টি
৮.	**মৎস্য প্রজাতি (সংখ্যা)**		
	▪ মিঠা পানির মৎস্য প্রজাতি	:	২৬০ টি
	▪ বিদেশি মৎস্য প্রজাতি	:	১২ টি
	▪ মিঠা পানির চিংড়ি প্রজাতি	:	২৪ টি
	▪ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি	:	৪৭৫ টি
	▪ সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতি	:	৩৬ টি
৯.	**মৎস্য হ্যাচারি ও উৎপাদন**		
	▪ সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের সংখ্যা (৭৬টি হ্যাচারি সুবিধাসহ)	:	১৩৬টি
	▪ বেসরকারি হ্যাচারির সংখ্যা	:	৯০৩টি
	▪ সরকারি হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন (২০১৪)	:	১০৩৩৮ কেজি
	▪ বেসরকারি হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন (২০১৪)	:	৪৭৮৯৯৩ কেজি
	▪ গলদা হ্যাচারি (সরকারি ১১টিসহ)	:	২৭টি
	▪ বাগদা হ্যাচারি (সরকারি ৮টিসহ)	:	৫৫টি
	▪ গলদা হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদন (সরকারিসহ)	:	২.৭০ কোটি
	▪ বাগদা হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদন (সরকারিসহ)	:	৯৫৫.০০ কোটি
১০.	**মানবসম্পদ উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো**		
	▪ মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমী	:	০১টি
	▪ মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	:	০৬টি
	▪ মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট (নির্মাণাধীন ৩টিসহ)	:	০৪টি
১১.	**মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল**		
	▪ ১ম শ্রেণি	:	১৫৯৫
	▪ ২য় শ্রেণি	:	৬৪৯
	▪ ৩য় শ্রেণি	:	২০৬৯
	▪ ৪র্থ শ্রেণি	:	১৪৭৩
	মোট	:	**৫,৭৮৬**

সংকলিত: মৎস্য সম্পদ জরিপ পদ্ধতি, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofl.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি মাননীয় মন্ত্রী	৯৫৪০৪৩০ (অ) ৯৫৪৫৫৫৫ (অ) ৯৩৪৯২৫৫ (বা) ০১৭১৭৪০৪১১০ (মো) ৯৫৪০১৮২ (ফ্যা) minmofl@gmail.com
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মাননীয় মন্ত্রীর পিএস	৯৫৪০৯৩০ (অ) ps.minister.mofl@gmail.com
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মাননীয় মন্ত্রীর এপিএস	৯৫৭৪৮১২ (অ) mizanmofl@gmail.com
জনাব মোঃ আকতারুল ইসলাম সিনিয়র তথ্য অফিসার	৯৫৭৪৮১৯ (অ) aktarullalpur@gmail.com
জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ সরকার মাননীয় মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৯৫৪০৪৩০ (অ)
জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ,এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	৯৫৪০০৭৫ (অ) ৯৫৪০২৫০ (ফ্যা) ncchandamp@yahoo.com
জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর পিএস	৯৫৪০০৭৯ (অ) mazaman121273@gmail.com
জনাব সমীর কুমার দে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর এপিএস	৯৫৪০০৮১ (অ) samirdey274@yahoo.com
শেলীনা আফরোজা, পিএইচডি সচিব	৯৫৪৫৭০০ (অ) ৮১৫৯৫৯৬ (বা) ৯৫১২২২০ (ফ্যা) ০১৭১৩০৬৩৭১১ (মো) shelina.afroza@gmail.com
জনাব দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী সচিবের একান্ত সচিব	৯৫১৫৭৯৯ (অ) sstr15542@gmail.com
রীনা মণ্ডল সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৫৯৪৫৭০০ (অ)
ডা. আফতাবুন নাহার মাকসুদা অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)	৯৫৭৪৪৯৫ (অ) anmaksuda@gmail.com
ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ উপ-সচিব (বাজেট)	৯৫৫১০০৭ (অ) harunrashid61@gmail.com
জনাব মোঃ আনিছুর রহমান অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)	৯৫১৪২০১ (অ) anisur3112@gmail.com
জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম উপ-সচিব (মৎস্য-১)	৯৫৭৭২৬২ (অ) msi_bd@hotmail.com
জনাব এ কে এম মুখলেছুর রহমান উপ-সচিব (মৎস্য-২ এবং আইন)	৯৫৭৬৩৫৭ (অ)
জনাব এ এম সাইফুল হাসান উপ-সচিব (মৎস্য-৩)	৯৫৭৬৩৫৬ (অ) amsaifulhassan@yahoo.com
জনাব মজিবুল হক মজুমদার সহকারি সচিব এবং প্রটোকল অফিসার (মৎস্য-৪)	৯৫৪০৪৩৮ (অ) mazibur.hm3002@gmail.com

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ মুহিবুজ্জামান উপ-সচিব (মৎস্য-৫)	৯৫৪৯১৪১ (অ)
জনাব একরামুল হক অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	৯৫৪৫৫৬৩ (অ) akramul30@yahoo.com
জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা উপ-সচিব (প্রশাসন-২)	৯৫৭৬৬৯৬ (অ) dsmofla@gmail.com
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম উপ-সচিব (প্রশাসন-৩)	৯৫৪০৪০৭ (অ) shafique1860@gmail.com
জনাব এস এম মাকসুদুর রহমান সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪)	৯৫৫৩৮৪০ (অ) admnb_mofl@yahoo.com
জনাব মোঃ ইফতেখারুল ইসলাম খান যুগ্ম সচিব (এমএফএ ও বিএফডিসি)	৯৫১৫৫২৭ (অ)
জনাব মোঃ আলী নূর যুগ্ম সচিব (প্রাণিসম্পদ-১ ও ২)	৯৫১৪৬৪৫ (অ) alinoor1962@yahoo.com
বেগম দেলোয়ারা বেগম উপ-সচিব (প্রাণিসম্পদ-১)	৯৫৬৬৯৪৭ (অ) delwora_6324@yahoo.com
বেগম নিগার সুলতানা সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২)	৯৫৭৬৬৯৮ (অ) sultanabd1010@gmail.com
কাজী ওয়াছি উদ্দিন যুগ্ম সচিব (প্রাণিসম্পদ-৩ ও ৪)	৯৫৭৬৬৯৪ (অ) wasiuddin4145@gmail.com
বেগম কে এফ এম জেসমীন আখতার উপ-সচিব (প্রাণিসম্পদ-৩)	৯৫৬১১১৭ (অ) kfm_j@yahoo.com
জনাব অসীম কুমার বালা উপ-সচিব (প্রাণিসম্পদ-৪)	৯৫১৫৬৪৪ (অ) ashimkumar.bala@yahoo.com
বেগম দিলরুবা ইয়াসমিন যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা)	৯৫৪৫৯৬৯ (অ) adrita62@gmail.com
জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান উপ-প্রধান (পরিকল্পনা)	৯৫৭৪৮১৪ (অ) mizanlgu@yahoo.com
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সহকারী প্রধান (মৎস্য পরি ১ও ৩)	৯৫৭৪৮১৬ (অ) ac25mohfw@yahoo.com
বেগম তানজিনা শাহরীন সহকারী প্রধান (মৎস্য পরিঃ -২)	৯৫৭৪৮১৭ (অ) shahrinp@gmail.com
জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মুস্তাসিম বিল্লাহ সহকারী প্রধান (প্রাসঃ পরিঃ-১)	৯৫৬১৬৭৭ (অ) mambillah@yahoo.com
জনাব এইচ এম মনিরুজ্জামান সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্রাসঃ পরিঃ-২)	৯৫৬৫৭৭৫ (অ) monir_2005ku@yahoo.com
জনাব মোহাম্মদ-আল-মারুফ সহকারী প্রধান (মনিটরিং-১)	৯৫১২২২০ (অ) maruf230@gmail.com
বেগম মাহমুদা মাসুম সহকারী প্রধান (মনিটরিং-২)	৯৫৫০৩৭১ (অ) masum.ridi@gmail.com
জনাব মোঃ হাসান হাফিজুর রহমান ভূঞা প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৩৫৬২৭৪ (অ)
জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯৫৭০৬৬০ (অ)
জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন সিস্টেম অ্যানালিস্ট (অ.দা.)	৯৫৬২৪৭৪ (অ) moflsa333@gmail.com

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা www.fisheries.gov.bd	
নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
সৈয়দ আরিফ আজাদ মহাপরিচালক	৯৫৬২৮৬১ (অ) ৯৫৬৮৩৯৩ (ফ্যাক্স) dg@fisheries.gov.bd
জনাব মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ সহকারী পরিচালক (স্টাফ অফিসার)	৯৫৬৯৯৩৪ (অ) kbdmamun_1974@yahoo.com
সৈয়দ আরিফ আজাদ পরিচালক (অভ্যন্তরীণ)	৯৫৭১৮১২ (অ) s_arif_azad@yahoo.com
জনাব নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মাননিয়ন্ত্রণ)	৯৫৬৯৯৪৩ (অ) psofiqcdof@gmail.com
জনাব মোঃ ইসরাইল গোলদার পরিচালক (রিজার্ভ)	৯৫৭১৮১২ (অ) golder4@gmail.com
শেখ মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (জরিপ ও পরিকল্পনা)	৯৫৬১৩৫৫ (অ) ৮৯৩২৪৮৪ (বা) sumonazma@yahoo.com
জনাব পরিমল চন্দ্র দাস উপপরিচালক (প্রশাসন)	৯৫৬৯৩৫৫ (অ) ৯৫৬৭২১৭ (ফ্যা) parimal.das58@yahoo.com
জনাব মোঃ গোলজার হোসেন উপপরিচালক (মৎস্যচাষ)	৯৫৬১৫৯২ (অ) ddaqua@fisheries.gov.bd
জনাব জোয়াদ্দার মোঃ আনোয়ারুল হক উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)	৯৫৫৩০৮৮ (অ) anwarulhaque35@yahoo.com
জনাব আ ক ম আজিজুল হক মোল্লা উপপরিচালক (রিজার্ভ)	৯৫৫৪৭১৬ (অ) ahoque1957@gmail.com
কাজী শামস আফরোজ উপপরিচালক (চিংড়ি)	৯৫৬১৭১৫ (অ) qsafroz@gmail.com
জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৬৫০২১ (অ) monwar.hossain@gmail.com
জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৬০৬৫৩ (অ) aminul@fisheries.gov.bd
সৈয়দা শিরিন কুলসুমা খাতুন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৬৭২১৬ (অ) syedashirin@yahoo.com
জনাব ফেরদৌস আহমেদ উপ-প্রধান (সামুদ্রিক শাখা)	৯৫৬৫০২৩ (অ) ferdous1959@gmail.com
জনাব ওয়াহিদুজ্জামান উপ-প্রধান	৯৫৬১৭১৫ (অ) ohiddof@gmail.com
জনাব মোঃ জাকির হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অ.দা)	৯৫৬০৪৫৭ (অ) zakir_aul@yahoo.com
জনাব মোঃ আবু মাসুম সিদ্দিকী সহকারী পরিচালক (মৎস্যচাষ)	৯৫৬০৫১৭ (অ) masumdof@yahoo.com
জনাব মোঃ ইউসুফ খান প্রধান সমন্বয়কারী ও সহকারী পরিচালক (আইসিটি শাখা)	৭১৬২৮০৪ (অ) yousuf@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ)	৯৫৬০৪৭২ (অ) zahid_dof@yahoo.com
জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৯৫৬১৪৩৭ (অ) majibdof@yahoo.com
বেগম শামীম আরা বেগম সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)	৯৫৬৬১০৩ (অ) admin_2@fisheries.gov.bd
জনাব এ কে এম লুৎফুর রহমান সিদ্দীক সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)	৯৫৬৭২১৮ (অ) lutfur.dhaka@yahoo.com

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
ড. আলী মুহম্মদ ওমর ফারুক সহকারী পরিচালক (সরবরাহ ও সেবা)	৯৫৬৭২১৯ (অ) faruqamo@yahoo.com
জনাব কৃষ্ণেন্দু সাহা প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৯৫৬৭২২০ (অ) sakrisna05@yahoo.com
বেগম শিল্পী দে সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)	৯৫৬৯০৪১ (অ) shilpiplus@yahoo.com
জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির খান সহকারী পরিচালক (মাননিয়ন্ত্রণ)	৯৫৫৪৭১৬ (অ) houmyoun@yahoo.com
বেগম তানমী শাহরীন সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ) (ডোসিয়ার)	৯৫৬৯০২৬ (অ) tanmi_s1988@yahoo.com
জনাব সরকার মুহাম্মদ রফিকুল আলম সহকারী পরিচালক (অর্থ)	৯৫৫৪৯৯২ (অ) sarkeripon@gmail.com
ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী সহকারী পরিচালক (লিগ্যাল শাখা)	৯৫৫০২৮০ (অ) tanvir_h1998@yahoo.com
জনাব মোঃ সৈয়দ হোসেন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (জরিপ)	৯৫৬৯২৯৫ (অ) sayodhossain1956@gmail.com
ড. জি এম শামসুল কবীর সহকারী প্রধান	৯৫১৪১৩৫ (অ) gmskabir@yahoo.com
জনাব মোঃ আলীমুজ্জামান চৌধুরী নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫৮৮১১২ (অ) alimuzzaman@gmail.com
জনাব মোঃ ফিরোজ আহমেদ শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫৬০৫৪৩ (অ) firozahmedsikder@yahoo.com
তথ্য সেবা কেন্দ্র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৯৫৫৫৩৪৯(অ) alamst@live.com
সাধারণ শাখা	৯৫৫৪৮৭৫ (অ)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯৫৬১৫৮৮ (অ)

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	
জনাব মোঃ রমজান আলী প্রকল্প পরিচালক (অতি. পরি.) ,বাঁওড় প্রকল্প (রাজস্ব)	০৪২১-৬৩১০৮ (অ)
জনাব এ বি এম আনোয়ারুল ইসলাম এনপিডি, বিএমএফসিবি প্রকল্প	৯৫৫৪৫৭৭ (অ) ৭১১১৫৪৪ (ফ্যা) bmfcbp@yahoo.com
জনাব মোহাঃ আতিয়ার রহমান এডি, বিএমএফসিবি প্রকল্প	৯৫৫৬৮০৯ (অ) atiardof@yahoo.com
জনাব মোঃ গোলজার হোসেন পরিচালক, এনএটিপি	৯৫৬১৬৮৫ (অ) ৯৫৬৯৯৮৯ (ফ্যা) goljardof@yahoo.com
জনাব সরকার ফিরোজ আহমেদ মুকুল বাজেট অফিসার	৯৫৫৫৩৫১ (অ) sarkerferoz@yahoo.com
জনাব জোয়াদ্দার মোঃ আনোয়ারুল হক পিডি, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৯৫১৩৫০৭ (অ) anwarulhaque35@yahoo.com
জনাব মোঃ আব্দুস সালাম পিডি, নিমগাছী প্রকল্প	০১৭১১৪৭৮৮৮৬ salam_dof@59@yahoo.com
জনাব অজিত কুমার পাল উপ-প্রকল্প পরিচালক, এফসিডিআই প্রকল্প	৯৫৫৮৩৩৯ (অ) akp589@hotmail.com
কাজি ইকবাল আজম পিডি, ব্রুড ব্যাংক প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৯৫৫৩১৩৩ (অ) kibalazam2012@gmail.com
খ: মাহবুবুল হক এডি, ব্রুড ব্যাংক প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৯৫৫৬৬৮৫ (অ) kmahbubh252@yahoo.com
জনাব ছালেহ আহমদ এনপিডি, BEST প্রকল্প	৯৫৫৯১২১ (অ) saleh_ahmednpd@yahoo.com
জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এডি, BEST প্রকল্প	৯৫৫৯১৪৫ habib.ict94@yahoo.com
জনাব এ বি এম শাব্বীর এডি, BEST প্রকল্প	৯৫৫৯১৯৯ (অ) abm_sabbir@yahoo.com

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মো: সিরাজুর রহমান পিডি, অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার প্রকল্প	৯৫১১৯৯৬ (অ) serajurrahman62@yahoo.com
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রকল্প সমন্বয়কারী, IAPP	৯১০৪৬৬৭ (অ) niloy37@yahoo.com
জনাব এ বি এম জাহিদ হাবিব জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রির্জাভ)	৯৫১৩৮৫৭ (অ) abmjahidhabib@yahoo.com
বেগম মাসুদ আরা মমি সহকারী পরিচালক	৯৫১৩৮৫৮ (অ) masudara_momi@yahoo.com
জনাব মোঃ আবুল হাশেম পিডি, WBRP	৯৫৬৯৯৪৫ (অ) hashemsumon@yahoo.com
জনাব মোঃ তৌহিদুর রহমান এপিডি, WBRP	৯৫১৪০৪২ (অ) ৯৫১৪০৪১ (ফ্যা) touhiddof@gmail.com
জনাব তপন কুমার পাল পিডি, হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৯৫৫৬২৮৯ (অ) tapanaddof@yahoo.com
ড. মোঃ আব্দুস সবুর এডি, হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৯৫৫৬২৮৪ (অ) asabur030856@yahoo.com
জনাব মোঃ জাকির হোসেন পিডি, মৎস্য স্থাপনা প্রকল্প	৯৫৬০৪৫৭ (অ) zakir_zul@yahoo.com
জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক সহকারী পরিচালক, মৎস্য স্থাপনা প্রকল্প	৯৫৫৬১৩০ (অ) razzaque_dof05@yahoo.com
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম পরি. ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা, মৎস্য স্থাপনা প্রকল্প	৭১১৪৭০৯ (অ) rafiquedof@gmail.com
জনাব মোঃ আরিফুর রহমান তরফদার পিডি, জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প	৯৫৫২১৭৯ (অ) arif@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান পিডি, বিল-নার্সারি প্রকল্প	৯৫৮৬৬৬৯ (অ) mrbe47@gmail.com
জনাব এস এম মনিরুজ্জামান এডি, বিল-নার্সারি প্রকল্প	৯৫৮৮৩৯৬ (অ) monidof@yahoo.com
জনাব ড. আবদুল কাদির পিডি, বৃহত্তর ফরিদপুর মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	৬৬৮৫৪৫৪ (অ) akadir_bau@yahoo.com
ড. মোঃ রিয়াজ উদ্দিন সরকার এনপিডি, মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রকল্প	৯৫১২৫৮৮ (অ) reaz_phd@yahoo.com
বেগম সালমা সাইদ এডি, মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রকল্প	৭১১৪৮৪৪ (অ) salmasayeed40@yahoo.com
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম পিডি, স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ প্রকল্প	৯৫৮৭০১১(অ) mdrafiq1101@gmail.com
জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন এডি, স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ প্রকল্প	৭১১৮৩৮৩ (অ) eyasinfme@gmail.com
ড. বিনয় কুমার চক্রবর্ত্তী পিডি, কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষ ও গবেষণা প্রকল্প	৭১১৯০৪২ (অ) bbroty@gmail.com
জনাব মোঃ আবদুল হান্নান মিয়া পিডি, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ প্রকল্প	০৩৫১-৬২৬২৯ (অ) hannan07@yahoo.com
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পিডি, রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	০৫২১-৫৫৩৪৫(অ) nazruldof1969@gmail.com
জনাব মোঃ আতাউর রহমান খাঁন এপিডি রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	০৫২১-৫৫৩৪৬(অ) mark_196403@yahoo.com
জনাব মোঃ আবদুল কাইয়োম পিডি, ক্রেল প্রকল্প	৯৫৫৮৮৮৩(অ) dfodhaka@fisheries.gov.bd

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম	
জনাব নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন পরিচালক	০৩১-৭২১৭৩১ (অ) nasir_dof@yahoo.com
বেগম মরিয়ম সুলতানা উপপরিচালক	০৩১-২৫২৮২৮২ (অ) msultana860@yahoo.com
জনাব মোঃ ইকবাল হারুন সহকারী পরিচালক	০৩১-২৫১৭৩৯১(অ) asifnafis@gmail.com
জনাব অধীর চন্দ্র দাস সহকারী পরিচালক	০৩১-২৫১৭৩৯০ (অ) adhirdas7@gmail.com

মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ	
জনাব মোহাম্মদ আলী মিয়া পরিচালক (অ.দা), এফটিএ, সাভার	৭৭১২৫১৮ (অ)
জনাব মোহাম্মদ হাসান অধ্যক্ষ, এফটিআই, চাঁদপুর	০৮৪১-৬৩৪০২ (অ)
কাজী মাহবুবুল হক অধ্যক্ষ, এফটিইসি, ফরিদপুর	০৬৩১-৬২৪৫৭ (অ)
জনাব এস.এম. মহিব উল্যাহ এসএসও, এফবিটিসি, রায়পুর, লক্ষীপুর	০৩৮২২-৫৬০৩৭ (অ) ০৩৮২২-৫৬০৩৯ (ফ্যা)
জনাব তপন কুমার দাস প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, এফবিটিসি, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪-৭৪৩২৪ (অ)
জনাব মোঃ ইসহাক আলী খামার ব্যবস্থাপক, এফটিসি, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪-৭৪৪০২ (অ)
জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, এফটিসি, কোটচাঁদপুর	০৫৩৩৪-৭৪৩২৪ (অ)

মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তরসমূহ	
জনাব ছালেহ আহমদ উপপরিচালক (অ.দা.), ঢাকা	৯৫৮২০১২ (অ) saleh_ahmednpd@yahoo.com
বেগম প্রভাতী দেব উপপরিচালক (অ.দা.), চট্টগ্রাম	০৩১-৬৮২৬০৩ (অ) provatideb @gmail.com
জনাব মোঃ আব্দুর রাশেদ উপপরিচালক, খুলনা	০৪১-৭৬০৪৯৫ (অ) ddfiqckln@gmail.com

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারমাড়ি, ঢাকা	
জনাব সৈয়দ খোরশেদ জাফরী পরিচালক	৯১১২২৬০ (অ)
জনাব মিজানুর রহমান প্রধান তথ্য অফিসার	৮১৩০৪৭২ (অ)
ফার্ম ব্রডকাস্টিং অফিসার	৯১১৪২৬৪ (অ)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	
জনাব মোঃ হামিদুর রহমান মহাপরিচালক	৯১৪০৮৫৭ (অ)
শেখ হেমায়েত হোসেন পরিচালক (সরেজমিন উইং)	৮১২৩১৪৭ (অ)
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ পরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং)	৯১৩১২৯৫ (অ)
জনাব এস এম সিরাজুল ইসলাম পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	৯১১১৭৩৮ (অ)
জনাব সুভাস চন্দ্র দেবনাথ পরিচালক (প্রশিক্ষণ উইং)	৮১২৩৬৩৯ (অ)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	
জনাব অজয় কুমার রায় মহাপরিচালক	৯১০১৯৩২ (অ)
জনাব বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য পরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১২৩৮৮১ (অ)
জনাব কালিদাস সরকার পরিচালক (উৎপাদন)	৯১১৭৪৫৮ (অ)
জনাব ডা. যতীন্দ্র নাথ দাস পরিচালক (গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন)	৯৮৯৮৮৯৬ (অ)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা	
ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম মহাপরিচালক	৭৭৯১৬৭৬ (অ) ০১৭৩০০২৬৩৯৮

পরিকল্পনা কমিশন, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
জনাব এ এন সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী সদস্য (কৃষি)	৯১৮০৭৯৯ (অ)
জনাব নিখিল কুমার দাস একান্ত সচিব	৯১৮০৬৪৮ (অ)
জনাব সরদার ইলিয়াস হোসেন বিভাগ প্রধান	৯১১১৭২৫ (অ)
ড. শাহজাহান আলী খন্দকার যুগ্ম-প্রধান (বমপ্রাও সমন্বয়)	৯১৮০৭৫৮ (অ)
বেগম ইস্‌রাত জাহান তস্‌লিম উপ-প্রধান (মওপ্রা)	৯১১৭৫৪৬ (অ) ৯৬৬১৩৬৩ (বা)
বেগম শাহিনা সুলতানা সহকারী প্রধান (মওপ্রা)	৯১১৭০৩৯ (অ)

আইএমইডি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার সচিব	৯১৮০৭৬১ (অ)
জনাব মোঃ ফারুক হোসেন মহাপরিচালক, সিপিটিইউ	৯১৪৪২৫২ (অ)
জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান মহাপরিচালক (কৃষি,পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা)	৯১৮০৬৭৮ (অ)

ইআরডি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন সিনিয়র সচিব	৯১১৩৭৪৩ (অ)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেইট, ঢাকা	
ড. আবুল কালাম আজাদ নির্বাহী চেয়ারম্যান	৯১৩৫৫৮৭ (অ)
ড. কবীর ইকরামুল হক সদস্য পরিচালক (মৎস্য)	৮১১০৬১৮ (অ)

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, খামারবাড়ি, ঢাকা	
কৃষিবিদ আ. ফ. ম. বাহাউদ্দিন নাছিম সভাপতি	৯১১৪১০৭ (অ)
কৃষিবিদ মোহাম্মদ মোবারক আলী মহাসচিব	৯১১১৪৩২ (অ)

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা	
জনাব পিউস কস্তা চেয়ারম্যান	৭১৬২০০১ (অ) ৮৩৬০১৬৬ (বা)
জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন খান পরিচালক (অর্থ)	৭১৬২৮০০ (অ) ৯৩৩১৩৫৭ (বা)
জনাব প্রশান্ত কুমার দাস পরিচালক (ক্রয় ও বিপণন)	৯৫৬৪০০৭ (অ)
খন্দকার লুৎফন নেছা সচিব	৯৫৫২৬৮৯ (অ)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	
ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস মহাপরিচালক	৯২৫২৭৩৬ (অ)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মণ্ডল মহাপরিচালক	৯২৫২৭১৫ (অ) ৯১২৪১৭৪ (বা)

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন	
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর চেয়ারম্যান	৯৫৬৪৩২৮ (অ)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা	
জনাব মোঃ শেফাউল করিম উপপরিচালক (উপ-সচিব)	৭১৬৯৪৫৪ (অ)
জনাব সাজ্জাদ হোসেন তথ্য অফিসার (মৎস্য)	৭১৬৯৪৫৩ (অ)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ	
জনাব মোহাম্মদ জাহের মহাপরিচালক	০৯১-৬৫৮৭৪ (অ) ফ্যাক্স: ০৯১-৬৬৫৫৯
ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ পরিচালক (প্রশাসন)	০৯১-৬৬২৭১০ (অ) yahiamahmud@yahoo.com
ড. সৈয়দ লুৎফর রহমান সিএসও, লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা	০৪০২৭-৫৬০৩০ (অ) rahman397@yahoo.com
ড. মোঃ ইনামুল হক মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সমুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার	০৩৪১-৬৩৮৫৫ (অ) hoq_me@yahoo.com
জনাব খান কামাল উদ্দিন আহমেদ সিএসও, চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট	০৪৬৮-৬২২৯১
জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম এসএসও, নদী উপকেন্দ্র, রাঙামাটি	০৩৫১-৬২১৫৯ (অ)
জনাব এ এফ এম শফিকুজ্জোহা এসএসও, স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, যশোর	০৪২১-৬৮৯৮২ (অ)
ড. ডেভিড রিন্টু দাস এসএসও, প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, সান্তাহার, বগুড়া	০৭৪১-৫৫৩১২
জনাব খোন্দকার রশীদুল হাসান এসএসও, স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর	০৫৫২৬-৭২৯৪৪
জনাব মোঃ আশরাফুল হক এসএসও, নদী উপকেন্দ্র, খেপুপাড়া, পটুয়াখালী	০৪৪২৫-৫৬০০২

মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ	০৯১-৬৭৪০১০৬ ফ্যাক্স: ৬১৫১০
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	০৪১-৭২১৩৯৩ ফ্যাক্স: ৭৩১২৪৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৯৬৬১৯০০-১৯ ফ্যাক্স: ৮৬১৫৫৮৩
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৯১৪৪২৭০-৮
বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	৯২০৫৩১০-১৪
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	০৭২১-৭৫০৭৮৩
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	০৩১-৭১৪৯৪৯
মেরিন ফিসারিজ একাডেমী, চট্টগ্রাম	০৩১-৬৩৪৩৭৫
হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর	০৫৩১-৬৫৪২৯
মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল	০৯২১-৫৫৩৯৯
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	৭৭০৮৪৭৮-৮৫
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	০৮২১-৭৬০৯৩০
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০৪৪২৭-৫৬০১৪
শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ফিসারিজ কলেজ, মেলান্দহ, জামালপুর	০১৭১১৬১৩৩০১ (অধ্যক্ষ)
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর	০৪২১-৬২০২০

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	
অ্যাটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ	৯৫৬২৮৬৮ (অ)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা	৭৭৪৫০১০-১৬
বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন	৯১১৭৪৭৬ (সি. স্কেল) ৯১৪৩২০৪ (বিভাগীয়)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা	০৮১-৬৩৬০০
মেরিন ফিসারিজ এসোসিয়েশন, ঢাকা	৯১২০২৩৪
ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৮১৫১৪৯৭
প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, ঢাকা	৮৩১৬৮৮২ ৮৩১৭৫৩১
ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, খুলনা অঞ্চল	০৪১-৮১৩২৯২ (অ) ০৪১-৮১২৯২৫ (ফ্যা)
ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিএফএফইএ, চট্টগ্রাম অঞ্চল	০৩১-৭২৪৯৪৫ (অ) ০৩১-২৫১১৮৮৭ (ফ্যা)
বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন ঢাকা	৮৪১৭৭৩১ (অ) ৮৪১২৭০৯ (ফ্যা)
প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার অ্যালায়েন্স	৮৩৯১৫৯৪ (অ)
সমন্বয়ক ফিসারিজ প্রোডাক্ট বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল	৯৫১৪৪৩৪ (অ)

ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক সংস্থা	
বিশ্ব ব্যাংক	৮১৫৯০০১
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	৮১৫৬০০০-৮
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	৯৫৬৯৩২০
এফএও	৮১১৮০১৫-৮

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
ইউএনডিপি	৮১৫০০৮৮
ওয়ার্ল্ডফিস	৮৮১১১৫১
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	৯৮৬২১৯৯
আইইউসিএন	৯৮৯০৪২৩
জাইকা	৮১২৪৫৫১-৩
আইএমএফ	৯৫৫০২৭৫
ইউনিসেফ	৮৮৫২২৬৬
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা	৮১১৮৪০৮
জিআইজেড	৯৬৬৬৭০১০০০

ঢাকা বিভাগ	
বেগম ফরিদা বেগম উপপরিচালক	৯৫৫০৮২২(অ) ৯৫৬৫০২২(ফ্যা) dddhaka@fisheries.gov.bd
জনাব এস এম রেজাউল করিম সহকারী পরিচালক	৯৫৬৫০২২(অ) rezaul6950@yahoo.com

ঢাকা জেলা	
জনাব মোঃ আবদুল কাইয়োম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৯৫৫৮৮৮৩(অ) dfodhaka@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাভার	৭৭৪৭৫৩৪(অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধামরাই	০৬২২২-৭১১৪৭(অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেরানীগঞ্জ	৭৭৬৬৪৭৭(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দোহার	০৩৮৯৪-৬৮০০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ	০৬২২৫-৫৬২৪৯(অ)

মানিকগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ নুরতাজুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৭৭১০৩৯১(অ) dfomanikgonja@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	৭৭১০৭৯৩(অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিঙ্গাইর	৭৭১৭১৯১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘিওর	৭৭২৭৩৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবালয়	৭৭১৬২৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাটুরিয়া	৭৭২৫০৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতপুর	৭৭১৫১৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিরামপুর	৭৭২৮০৪৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	৭৭১১৫২৩ (অ)

মুন্সিগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম সরদার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৭৬১১৫৯১ (অ) dfomunshigonja@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	৭৬১২৩৭৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীনগর	৭৬২৭৩২৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিরাজদিখান	০৬৯২৪-৮৮০২৬ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লৌহজং	৭৬২৫২৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টঙ্গীবাড়ী	৭৬১৮২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গজারিয়া	৭৬১৬২৩২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মুন্সিগঞ্জ সদর	৭৬১১৫৮৩ (অ)

গাজীপুর জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৯২৬১২৮৩ (অ) dfo.gazipur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০২-৯২০৫২৪৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর	০৬৮২৫-৫১০৪২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাপাসিয়া	০৬৮২৪-৫১৩৯৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর	০৬৮২২-৫১১৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৬৮২৩-৫১১০৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, টঙ্গী	০২-৯২৯১৩১৭ (অ)
নরসিংদী জেলা	
চৌধুরী মোহাম্মদ আবুল ফারাহ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৯৪৬২৪১০ (অ) dfo.narsingdi@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০২-৯৪৬২৪৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়পুরা	০২-৯৪৪৮১৪৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবপুর	০৬২৫৬-৭৫০৯৬ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনোহরদী	০৬২৫৩-৫৬১৪৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পলাশ	০২-৯৪৬৬৪১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেলাবো	০৬২৫২-৬৩১০৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নরসিংদী সদর	০২-৯৪৬৩০০৬ (অ)
নারায়ণগঞ্জ জেলা	
বেগম মর্জিনা বেগম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৭৬৩০৬২৫ (অ) dfonarangonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০২-৭৬৪৮৩৫৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনারগাঁ	০২-৭৬৫৬৩০১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আড়াইহাজার	০২-৭৬৫৪০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বন্দর	০২-৭৬৬১১১৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রূপগঞ্জ	০২-৭৬৫০০২৭ (অ)
ফরিদপুর জেলা	
জনাব মোঃ এমদাদুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৩১-৬৩২২৩ (অ) dfofaridpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৩১-৬৬৬১২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মধুখালী	০৬৩২৬-৫৬১৫২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোয়ালমারী	০৬৩২৪-৫৬২৮৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আলফাডাঙ্গা	০৬৩২২-৫৬১২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নগরকান্দা	০৬৩২৭-৫৬৩২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চরভদ্রাসন	০৬৩২৫-৫৬০৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভাঙ্গা	০৬৩২৩-৫৬৫৪৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ফরিদপুর সদর	০৬৩১-৬৩৯৯০ (অ)
রাজবাড়ী জেলা	
জনাব রতন দত্ত জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৪১-৬৫৫৮৩ (অ) dforajbari@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৪১-৬৫০৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোয়ালন্দ	০৬৪২৩-৫৬৩৮০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাংশা	০৬৪২৪-৭৫০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালিয়াকান্দি	০৬৪২২-৫৬০২৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, রাজবাড়ী সদর	০৬৪১-৬৫৩৬৪ (অ)

মাদারীপুর জেলা	
জনাব আ- ব- মোঃ আক্তারুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৬১-৬১৪৪২ (অ) dfomadaripur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৬১-৫৫৪১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালকিনি	০৬৬২২-৫৬১৮৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবচর	০৬৬২৪-৫৬১২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজৈর	০৬৬২৩-৫৬১২৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাদারীপুর সদর	০৬৬১-৬১৪১৯ (অ)
গোপালগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ শামীম হায়দার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৬৬৮৫৪৫৪ (অ) dfogopalgonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০২-৬৬৮৫৬১৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টুঙ্গীপাড়া	০২-৬৬৫৬৩৫৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুকসুদপুর	০৬৬৫৪-৫৬২৪৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোটালীপাড়া	০২-৬৬৫১৩১৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাশিয়ানী	০৬৬৫২-৫৬২০৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গোপালগঞ্জ সদর	০২-৬৬৮৫৯৪২ (অ)
শরীয়তপুর জেলা	
জনাব মোঃ মহসিন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৬০১-৬১৬৫৬ (অ) dfoshariatpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬০১-৬১৪৮২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভেদরগঞ্জ	০৬০২২-৫৬২২৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোসাইরহাট	০৬০২৪-৭৫৭৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জাজিরা	০৬০২৭-৫৬০৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডামুড্যা	০৬০২৩-৫৬৩৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নড়িয়া	০৬০১-৫৯১৪৫ (অ)
ময়মনসিংহ জেলা	
জনাব মোঃ লুৎফর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৯১-৬৬৭৪৮ (অ) dfomymensingh@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯১-৬৬১৫০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গৌরীপুর	০৯০২৪-৫৬০৯৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলপুর	০৯০৩৩-৫৬১১৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নান্দাইল	০৯০২৯-৬৪৩২০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ত্রিশাল	০৯০৩২-৫৬০৫৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঈশ্বরগঞ্জ	০৯০২৭-৫৬০৫৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুক্তাগাছা	০৯০২৮-৭৫৩৫১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ীয়া	০৯০২৩-৭৩০৪৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভালুকা	০৯০২২-৫৬০৫০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গফরগাঁও	০৮০২৫-৫৬২২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হালুয়াঘাট	০৯০২৬-৫৬১৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধোবাউড়া	০৯০৩৪-৫৬০৮৪ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, শম্ভুগঞ্জ	০৯১-৬৬১৫৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাসকান্দা	০৯১-৬৬৩৩৯(অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গৌরীপুর	০৯০২৭-৫৬০১৬ (অ)
কিশোরগঞ্জ জেলা	
ড. মোঃ মজিবুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৪১-৬১৯২৭ (অ) dfokishorgonj@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৪১-৬১৭১২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, করিমগঞ্জ	০৯৪২৭-৫৬০১৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভৈরব	০৯৪২৪-৭১৭১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাজিতপুর	০৯৪২৩-৬৪২৯১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কটিয়াদী	০৯৪২৮-৫৬১৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুলিয়ারচর	০৯৪২৯-৫৬১৬৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিঠামইন	০৯৪৩৫-৫৬০২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাকুন্দিয়া	০৯৪৩৩-৫৬০৩১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাড়াইল	০৯৪৩৪-৭৫১৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ইটনা	০৯৪২৬-৫৬০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, অষ্টগ্রাম	০৯৪২২-৫৬০৫৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হোসেনপুর	০৯৪২৫-৫৬০২৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, কিশোরগঞ্জ সদর	০৯৪১-৬১৮৬৯ (অ)
কার্প হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কটিয়াদি	০৯৪২৮-৫৬০৪৭ (অ)
নেত্রকোণা জেলা	
জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৫১-৬১৪০৪ (অ) dfonetrokona@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৫১-৬১৩৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোহনগঞ্জ	০৯৫২৪-৫৬০৪৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বারহাট্টা	০৯৫২৩-৫৬০৮৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেন্দুয়া	০৯৫২৮-৫৬০০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটপাড়া	০৯৫২২-৭৪০৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পূর্বধলা	০৯৫৩২-৫৬১২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মদন	০৯৫২৯-৫৬১৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলমাকান্দা	০৯৫২৭-৫৬১৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খালিয়াজুরী	০৯৫২৬-৫৬০৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দূর্গাপুর	০৯৫২৫-৫৬৩৪৪(অ)
খামার ব্যবস্থাপক, দূর্গাপুর	০৯৫২৫-৫৬১৮৩ (অ)
জামালপুর জেলা	
জনাব রণজিৎ কুমার পাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৮১-৬৩৬২০ (অ) dfojamalpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৮১-৬৩২০৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ইসলামপুর	০৯৮২৪-৭৪১৭১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সরিষাবাড়ী	০৯৮২৭-৫৬২৬১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেওয়ানগঞ্জ	০৯৮২৩-৭৫১২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাদারগঞ্জ	০৯৮২৫-৫৬১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বক্সীগঞ্জ	০৯৮২২-৫৬১৮৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেলান্দহ	০৯৮২৬-৫৬১৮০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, জামালপুর সদর	০৯৮১-৬৩৩৫১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মেলান্দহ	০৯৮২৬-৬৬১৮৪ (অ)
শেরপুর জেলা	
জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা আকন্দ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৩১-৬১৪৪৭ (অ) dfosherpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৯৩১-৬২৪৭৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নকলা	০৯৩২৩-৭৫০৬০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নালিতাবাড়ী	০৯৩২৪-৭৩৩০৭ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিনাইগাতী	০৯৩২২-৭৪০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীবর্দী	০৯৩২৫-৫৬০৭৯ (অ)
টাঙ্গাইল জেলা	
জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৯২১-৬৩৬৭৮ (অ) dfotangail@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯২১-৬৪০৭১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মির্জাপুর	০৯২২৯-৫৬২২৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোপালপুর	০৯২২৬-৭৫১৪২ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেলদুয়ার	০৯২২৪-৫৬০৪৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মধুপুর	০৯২২৮-৫৬০৮৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাগরপুর	০৯২৩৩-৭৩০৫০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভূঞাপুর	০৯২২৩-৫৬১৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিহাতী	০৯২২৭-৭৪০৭০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাসাইল	০৯২২২-৫৬১২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সখীপুর	০৯২৩২-৫৬১৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘাটাইল	০৯২২৫-৫৬০১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধনবাড়ী	০৯২২৮-৫৬২৯৯ (অ)

খুলনা বিভাগ	
জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান উপপরিচালক	০৪১-৭৬২৬৩৫ (অ) ০৪১-৭৬৩৩৪৫ (ফ্যা) ddkhulnaa@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মনিরুল মামুন সহকারী পরিচালক	০৪১-২৮৫১৫১৯(অ)
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মৎস্য জরিপ পদ্ধতি, খুলনা	০৪১-৭৬১০০৯ (অ)
প্রকল্প কর্মকর্তা	০৪১-৭৬১০০৯ (অ)
খুলনা জেলা	
জনাব প্রফুল্ল কুমার সরকার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪১-৭৬৩০১৬ (অ) ০৪১-৭৬১৬৭৬ (ফ্যা) dfokhulna@fisheries.gov.bd
সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম সহকারী পরিচালক	০৪১-৭৬৩০১৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলতলা	০৪১-৭০১৪৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তেরখাদা	০৪০২৯-৫৬০২১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বটিয়াঘাটা	০৪০২২-৫৬০২৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডুমুরিয়া	০৪০২৫-৫৬০২৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাকোপ	০৪০২৩-৫৬০৭৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাইকগাছা	০৪০২৭-৫৬২৬২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কয়রা	০৪০২৬-৫৬০৩৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিঘলিয়া	০৪১-৮৯০০১২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রূপসা	০৪১-৮০০১২২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গল্লামারী	০৪১-৮১৩২৫৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ডুমুরিয়া, খুলনা	০৪০২৫-৫৬১১৭ (অ)
সাতক্ষীরা জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুল অদুদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৭১-৬৩৩১৮ (অ) dfosatkhira@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০১৭১২-৮৪৫৫৯৪
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৭১-৬৩৮৪০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলারোয়া	০৪৭২৪-৭৫৩২৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তালা	০৪৭২৩-৫৬১২২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আশাশুনি	০৪৭২২-৫৬০২০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৪৭২৫-৫৬০৫৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্যামনগর	০৪৭২৬-৭৪০২৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবহাটা	০৪৭৩২-৭২০৫৫ (অ)
বাগেরহাট জেলা	
জনাব নারায়ণ চন্দ্র মন্ডল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৪৬৮-৬২৪৪৫ (অ) ০৪৬৮-৬২১৬১(ফ্যা) dfobagerhat@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৬৮-৬২৪৪৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামপাল	০৪৬৫৭-৫৬০২৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোড়েলগঞ্জ	০৪৬৫৬-৫৬২০৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মংলা	০৪৬৫৮-৭৩২১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কচুয়া	০৪৬৫৪-৫৬০০৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিতলমারী	০৪৬৫২-৫৬০২৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোল্লাহাট	০৪৬৫৫-৫৬০২১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফকিরহাট	০৪৬৫৩-৫৬২৪৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শরণখোলা	০৪৬৫৯-৫৬০৪৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	০৪৬৮-৬৪৩১৬(অ)
যশোর জেলা	
জনাব মোঃ রমজান আলী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪২১-৬৫৭৫২ (অ) ০৪২১-৬০৭৫১(ফ্যা) dfojessore@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪২১-৬৮৯৮১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, অভয়নগর	০৪২২২-৭১১২৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিকরগাছা	০৪২২৫-৭১৫২২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনিরামপুর	০৪২২৭-৭৮৪২৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেশবপুর	০৪২২৬-৫৬৩৭২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শার্শা	০৪২২৮-৭৫৪০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঘারপাড়া	০৪২২৩-৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌগাছা	০৪২২৪-৫৬৩৬৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, যশোর সদর	০৪২১-৬৪০৪৬ (অ)
ঝিনাইদহ জেলা	
জনাব শংকর চন্দ্র হালদার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৫১-৬২৮৫৭ (অ) ০৪৫১-৬২৯৫৭(ফ্যা) dfojhinaidah@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৫১-৬১৩৮১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৪৫২৩-৫৬১০৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোটচাঁদপুর	০৪৫২৪-৬৫০৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিণাকুণ্ডু	০৪৫২২-৭৪০২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহেশপুর	০৪৫২৫-৫৬২৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শৈলকূপা	০৪৫২৬-৫৬০৬০ (অ)
হ্যাচারি ম্যানেজার, কেন্দ্রীয় কার্প হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কোটচাঁদপুর	০৫৩৩৪-৭৪৩২৪ (অ)

নড়াইল জেলা	
জনাব হরিপদ মণ্ডল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮১-৬২০৩৩ (অ) dfonarail@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৮১-৬২০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লোহাগড়া	০৪৮২৩-৫৬৩৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়া	০৪৮২২-৫৬০৫৪ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	০৪৮১-৬২০৬৬ (অ)
মাগুরা জেলা	
জনাব চন্দ্র শেখর নন্দী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮৮-৬২৩৪১ (অ) dfomagura@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৮৮-৬২৩১১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শালিখা	০৪৮৫৩-৫৬১০৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুহম্মদপুর	০৪৮৫২-৭৫১৫৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর	০৪৮৫৪-৫৬১৫২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাগুরা সদর	০৪৮৮-৬২৮৫১ (অ)
কুষ্টিয়া জেলা	
ড. শেখ শফিকুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭১-৬২১৮৯ (অ) dfokushtia@fisheries.gov.bd
সহকারী পরিচালক, কুষ্টিয়া	০৭১-৬২১০৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭১-৭১১৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুমারখালী	০৭০২৫-৭৬৪৬৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভেড়ামারা	০৭০২২-৭১৫৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খোকসা	০৭০২৪-৫৬৩৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিরপুর	০৭০২৬-৫৬৪৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতপুর	০৭০২৩-৭৫২৬২ (অ)
মেহেরপুর জেলা	
শেখ মোহাম্মদ মেছবাহুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৯১-৬২৫৪৩ (অ) dfomeherpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৯১-৬২৬৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুজিবনগর	০৭৯২৩-৩৭৪১৬৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাংনী	০৭৯২২-৭৫৮৫৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	০৭৯১-৬২৯১৮ (অ)
চুয়াডাঙ্গা জেলা	
জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৬১-৬২৩৮৮ (অ) dfochuadangaa@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৬১-৬৩১২৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জীবননগর	০৭৬২৪-৭৫০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আলমডাঙ্গা	০৭৬২২-৫৬২৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দামুড়হুদা	০৭৬২৩-৫৬০৬৭ (অ)

রাজশাহী বিভাগ	
জনাব মোঃ মাহবুব উল আলম উপপরিচালক	০৭২১-৭৬০১৮৪ (অ) ddrajshahi@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ সাইদুর রহমান সহকারী পরিচালক	০৭২১-৮৬০০০২ (অ) ০৭২১-৮৬০০০২ (ফ্যা)
বেগম মঞ্জুয়ারা বেগম বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য সম্পদ জরিপ	০৭২১-৮৬১৫০১ (অ)
জনাব মোঃ রবিউল হাসান, মৎস্যচাষ প্রকৌশলী	০৭২১-৭৬১২৪৫ (অ)

রাজশাহী জেলা	
জনাব মোহাঃ গোলাম রাব্বানী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭২১-৭৬০২৪৫ (অ) dforajshahi@fisheries.gov.bd
সহকারী পরিচালক	০৭২১-৭৬০৮৫০(অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পবা	০৭২১-৭৬০৮২৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পুঠিয়া	০৭২২৮-৫৬৩২৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চারঘাট	০৭২২৩-৫৬১১৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোহনপুর	০৭২২৬-৫৬০২৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী	০৭২২৫-৫৬১৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দূর্গাপুর	০৭২২৪-৫৬০২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঘা	০৭২৩৩-৫৬১০৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগমারা	০৭২২২-৫৬০৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তানোর	০৭২২৯-৫৬০২৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, রাজশাহী সদর	০৭২১-৮৬১৪৪০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পুঠিয়া, রাজশাহী	০৭২২৮-৫৬৩১৩ (অ)
নাটোর জেলা	
জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৭১-৬২৫৯০ (অ) dfonatore@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৭১-৬২৬৪১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বড়াইগ্রাম	০৭৭২৩-৫৬০৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গুরুদাসপুর	০৭৭২৪-৭৪৪০৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিংড়া	০৭৭২৬-৬৩১২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগাতিপাড়া	০৭৭২২-৭২০৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালপুর	০৭৭২৫-৭৫০৬০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নাটোর সদর	০৭৭১-৬২৯১৮ (অ)
নওগাঁ জেলা	
জনাব মোহাঃ ওবাইদুল্লাহ্ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৪১-৬২৫৮৫ (অ) dfonaogaon@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৪১-৬২৮২৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মান্দা	০৭৪২৫-৬২০৩৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহাদেবপুর	০৭৪২৬-৫৭১২৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাণীনগর	০৭৪৩৩-৫৬০৪৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আত্রাই	০৭৪২২-৭১০০৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নিয়ামতপুর	০৭৪২৭-৫৬০৬৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাপাহার	০৭৪৩২-৭৪০৭৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বদলগাছী	০৭৪২৩-৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধামুইরহাট	০৭৪২৪-৫৬০৮৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পত্নীতলা	০৭৪২৮-৬৩০৯৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোরশা	০৭৪২৯-৫৬০১৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নওগাঁ সদর	০৭৪১-৬১৭৬১ (অ)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ একরামুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৮১-৫৫৪৮২ (অ) dfonawabganj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৮১-৫২৮৩৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাচোল	০৭৮২৪-৫৬০৩২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ	০৭৮২৫-৭৫২৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোমস্তাপুর	০৭৮২৩-৭৪১১২ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভোলাহাট	০৭৮২২-৫৬০৪৯ (অ)
পাবনা জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুল জলিল মিয়া জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৩১-৬৬০৬৮ (অ) ০৭৩১-৬৪৫১৫ (ফ্যা) dfo.pabna@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৩১-৬৪৯৩১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী	০৭৩২৬-৬৩৯১০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফরিদপুর	০৭৩২৫-৬৪০২১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাটমোহর	০৭৩২৪-৬৫৩২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটঘড়িয়া	০৭৩২২-৫৬০২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভাঙ্গুড়া	০৭৩২৮-৫৬১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেড়া	০৭৩২৩-৭৫১২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাঁথিয়া	০৭৩২৭-৫৬১৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুজানগর	০৭৩২৯-৫৬১৬৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	০৭৩১-৫১৮৮৯(অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ঈশ্বরদী	০৭৩২৬-৬৩৪২৭ (অ)
সিরাজগঞ্জ জেলা	
জনাব হরেন্দ্র নাথ সরকার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৫১-৬২১৩৭ (অ) ০৭৫১-৬২০০৫ (ফ্যা) dfosirajgonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৫১-৬২৯৩৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উল্লাপাড়া	০৭৫২৯-৫৬১৭৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়গঞ্জ	০৭৫২৬-৫৬১২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাজীপুর	০৭৫২৫-৫৬২০৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহজাদপুর	০৭৫২৭-৬৪৫৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কামারখন্দ	০৭৫২৪-৫৬০২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাড়াশ	০৭৫২৮-৪৬১০৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেলকুচি	০৭৫২২-৫৬৫০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌহালী	০৭৫১-৬৩৮২৩ (অ)
জয়পুরহাট জেলা	
জনাব সুভাষ চন্দ্র সাহা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৭১-৬২২২৪ (অ) dfojaipurhut@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৭১-৬২২৭৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাঁচবিবি	০৫৭১-৭৫২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালাই	০৫৭২৬-৫৬০৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আক্কেলপুর	০৫৭২২-৬৪০১৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ক্ষেতলাল	০৫৭২৩-৫৬০৪৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক,পাঁচবিবি	০৫৭২৪-৭৫৫৫৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ক্ষেতলাল	০৫৭২৩-৫৬১৯৬(অ)
বগুড়া জেলা	
বেগম রওশন আরা বেগম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫১-৬০৫৭০ (অ) dfobogra@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫১-৬৪৩৮৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শেরপুর	০৫০২৯-৭৭৪১৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আদমদীঘি	০৭৪১-৬৯২২১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাহালু	০৫০২৬-৫৬০৩০ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নন্দীগ্রাম	০৫০২৭-৭৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ	০৫০৩৩-৬৯০৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সারিয়াকান্দি	০৫১-৫৬২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দুপচাঁচিয়া	০৫০২৪-৮৮০৯২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধুনট	০৫০২৩-৫৬২৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাবতলী	০৫০২৫-৭৫০৮৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনাতলা	০৫০৩২-৭৯১১৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাজাহানপুর	০৫১-৮২২৫৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মালতিনগর	০৫১-৬৫৩৩৮ (অ)
রংপুর বিভাগ	
জনাব মোঃ রকিব উদ্দিন বিশ্বাস উপপরিচালক	০৫২১-৬৪৭৭০ (অ) ০৫২১-৫৫০৪৬ (বা) ddrangpur@fisheries.gov.bd rakibbiswas38@gmail.com
জনাব অদ্বৈত চন্দ্র দাস সহকারী পরিচালক	০৫২১-৫৫০৪৫ (অ) adwaita41@gmail.com
রংপুর জেলা	
ড. মোঃ জিল্লুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫২১-৬২৯২৯ (অ) dforangpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫২১-৬২২৩০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ	০৫২২৭-৫৬০৯৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিঠাপুকুর	০৫২২৫-৮৭০৮১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বদরগঞ্জ	০৫২২২-৫৬২৭৬ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গঙ্গাচড়া	০৫২২৩-৫৬০০৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাউনিয়া	০৫২২৪-৫৬০৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগাছা	০৫২২৬-৫৬০৬৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তারাগঞ্জ	০৫২২৮-৫৬০৩৪ (অ)
কুড়িগ্রাম জেলা	
সরকার আনোয়ারুল কবীর আহম্মেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৫৮১-৬১৫০১ (অ) ০৫৮১-৬১০২৪ (ফ্যা) dfo.kurigram@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৮১-৬১৮৫৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাগেশ্বরী	০৫৮২৬-৫৬৩২১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উলিপুর	০৫৮২৯-৫৬২৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	০৫৮২-৫৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজিবপুর	০৫৮২৩-৫৬২১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিলমারী	০৫৮২৪-৫৬০৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রৌমারী	০৫৮২৫-৫৬০৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজারহাট	০৫৮২৭-৫৬০০৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভুরুঙ্গামারী	০৫৮২২-৫৬০৭৪ (অ)
নীলফামারী জেলা	
শাহ ইমাম জাফর সাদেক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৫১-৬১৫৭০ (অ) dfonilphamari@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৫১-৬১৭৭০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সৈয়দপুর	০৫৫২৬-৭২৯৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডিমলা	০৫৫২২-৫৬২৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ	০৫৫২৫-৫৬০১৬ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডোমার	০৫৫২৩-৭৫১৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জলঢাকা	০৫৫২৪-৬৪০৮৩ (অ)
ঠাকুরগাঁও জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার প্রাং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৬১-৫৩৪৬৩ (অ) dfothakurgaon@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৬১-৫২৫২৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ	০৫৬২৪-৫৬৩৮৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাণীশংকৈল	০৫৬২৫-৫৬১১৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালিয়াডাঙ্গী	০৫৬২২-৫৬০৫৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিপুর	০৫৬২৩-৫৬০১৭ (অ)
দিনাজপুর জেলা	
জনাব মোঃ হাসান ফেরদৌস সরকার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৩১-৬৪৪৮৬ (অ) dfodinajpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৩১-৬৩৩১৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বীরগঞ্জ	০৫৩২৩-৭২৫১১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪-৭৪২২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাহারোল	০৫৩৩৫-৫৬০৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিরল	০৫৩২৪-৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিরিরবন্দর	০৫৩২৬-৫৬১৯৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	০৫৩২৭-৫৬৩২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিরামপুর	০৫৩২২-৫৬০২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাকিমপুর	০৫৩২৯-৭৫১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খানসামা	০৫৩৩২-৫৬০১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘোড়াঘাট	০৫৩২৮-৫৬০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ	০৫৩৩৩-৫৬০২৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সেতাবগঞ্জ	০৫৩২৫-৭৩২২১ (অ)
লালমনিরহাট জেলা	
জনাব মোঃ লতিফুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৯১-৬১৩৪৬ (অ) ০৫৯১-৬১১৩৭ (বা) dfo.lalmonirhat@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৯১-৬১০২৯ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৫৯২৪-৫৬১৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আদিতমারী	০২৯২২৫৬১৬৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাতীবান্ধা	০৫৯২৩-৫৬২৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাটগ্রাম	০৫৯২৫-৫৬০৮৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, লালমনিরহাট সদর	০৫৯১-৬১০৭১ (অ)
গাইবান্ধা জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৪১-৬১৬৪৩ (অ) dfogaibandha@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৪১-৬১৯২০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পলাশবাড়ী	০৫৪২৪-৫৬০৫৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোবিন্দগঞ্জ	০৫৪২৩-৭৫০৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাঘাটা	০৫৪২৬-৫৬১২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাদুল্লাপুর	০৫৪১-৬১৩৪৯৩১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলছড়ি	০৫৪২২-৬২০৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুন্দরগঞ্জ	০৫৪২৭-৬৪০৭২ (অ)

পঞ্চগড় জেলা	
জনাব মোঃ আব্দুস সালাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৬৮-৬১৩৬৯ (অ) dfopanchagarh@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৬৮-৬১৯৬৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটোয়ারী	০৫৬৫২-৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোদা	০৫৬৫৩-৫৬১৯৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবীগঞ্জ	০৫৬৫৪-৫৬০৬০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তেঁতুলিয়া	০৫৬৫৫-৭৫০৬৩ (অ)

চট্টগ্রাম বিভাগ	
ড. এ কে এম আমিনুল হক উপপরিচালক	০৮১-৭৬১২৭ (অ) ddchitagonj@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আব্দুস ছাত্তার সহকারী পরিচালক	০৮১-৭৬৫১১ (অ)
চট্টগ্রাম জেলা	
বেগম প্রভাতি দেব জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩১-২৫৮০৯৮২ (অ) dfochitagonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটিয়া	০৩০৩৫-৫৬৩২৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিরসরাই	০৩০২৪-৫৬২৪৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আনোয়ারা	০৩০২৯-৫৬০৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সীতাকুণ্ড	০৩০২৮-৫৬০৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঁশখালী	০৩০৩৭-৫৬১৩৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাউজান	০৩০২৬-৫৬২৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাটহাজারী	০৩১-২৬০১৮৯৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চন্দনাইশ	০৩০৩৩-৫৬২৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লোহাগাড়া	০৩০৩৪-৫৬৫১৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফটিকছড়ি	০৩০২২-৫৬২৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাতকানিয়া	০৩০৩৬-৫৬৪৭৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাঙ্গুনিয়া	০৩০২৫-৫৬২০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোয়ালখালী	০৩০৩২-৫৬১৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সন্দ্বীপ	০৩০২৭-৫৬২০৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পটিয়া	০৩০৩৫-৫৬৩৪৮ (অ)
কক্সবাজার জেলা	
জনাব অমিতোষ সেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৩৪১-৫১১৭৪ (অ) dfocoxsbazar@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৪১-৬৪২৮৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহেশখালী	০৩৪২৪-৭৪২৮২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টেকনাফ	০৩৪২৬-৭৫০০৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চকরিয়া	০৩৪২২-৫৬৫৩৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পেকুয়া	০৩৪২৮-৫৬১৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামু	০৩৪২৫-৫৬২৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উখিয়া	০৩৪২৭-৫৬১২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া	০৩৪২৩-৫৬১৫৫ (অ)
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৪১-৫১১২৬ (অ)

ফেনী জেলা	
জনাব মোঃ মোশারেফ হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৩১-৭৪০৪৬ (অ) ০৩৩১-৬১২৮৭ (বা) dfo.feni@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৩১-৭৪০৭৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ছাগলনাইয়া	০৩৩২২-৭৮৪৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পরশুরাম	০৩৩২৪-৫৬০০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলগাজী	০৩৩২৬-৭৭১৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাগনভূঞা	০৩৩২৩-৭৯১৫৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ফেনী সদর	০৩৩১-৭৪২৩২ (অ)
চাঁদপুর জেলা	
জনাব মোঃ সফিকুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৪১-৬৩১৬৫ (অ) dfochadpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৪১-৬৫৯৮০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কচুয়া	০৮৪২৫-৫৬১৮০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মতলব (দ.)	০৮৪২৬-৫৬৩৯০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মতলব (উ.)	০৮৪২৮-৫১০২৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাইমচর	০৪৪২৩-৫২২০১(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহরাস্তি	০৮৪২৭-৫৬২০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাজীগঞ্জ	০৮৪২৪-৭৫০৫৮(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফরিদগঞ্জ	০৮৪২২-৬৪৩৭৬(অ)
খামার ব্যবস্থাপক, কচুয়া	০৮৪২৫-৫৬১২৮(অ)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	
জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৫১-৫৮৫০১ (অ) ০৮৫১-৫৯৭৮৫ (বা) dfo.brahmanbaria@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৫১-৫৯০১৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,আখাউড়া	০৮৫২২-৫৬২৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাসিরনগর	০৮৫২৬-৫৬০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবীনগর	০৮৫২৫-৭৫২৭৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঞ্ছারামপুর	০৮৫২৩-৫৬১০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সরাইল	০৮৫২৭-৫৬১৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কসবা	০৮৫২৪-৭৩২০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ	০৮৫২৮-৭৪১০১ (অ)
কুমিল্লা জেলা	
জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস আকন্দ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮১-৭৬১৫১ (অ) dfocomilla@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮১-৭৬৬০৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বুড়িচং	০৮০২৯-৫৬১৬৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লাকসাম	০৮৩২-৫১৩৩৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌদ্দগ্রাম	০৮০২০-৫৬২১১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চান্দিনা	০৮০২২৫৬৪১৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবিদ্বার	০৮২৪-৫৩২৪৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুরাদনগর	০৮০২৬-৫৬০৩৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাউদকান্দি	০৮০২৩-৫৫৩৩১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাঙ্গলকোট	০৮০৩৩-৬৬২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরুড়া	০৮০২৭-৫২০৫৪ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ	০৮০৪২-৫৭০৩০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেঘনা	০৮০৩৫-৫১১৯২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তিতাস	০৮০২৩-৫৫৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হোমনা	০৮০২৫-৫৪২৭২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণপাড়া	০৮০২৮-৫৬২৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনোহরগঞ্জ	০৮০৩৭-৫৩০৩১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, দেবীদ্বার খামার	০৮০২৪-৫৩৩৮০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, জাঙ্গালিয়া খামার	০৮১-৭৬৫৪২ (অ)
রাঙামাটি জেলা	
জনাব আবদুল হান্নান মিয়া জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৫১-৬১৩৩৯ (অ) ০৩৫১-৬১৩৩৪ (ফ্যা) dforangamati@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৫১-৬৩৬০৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লংগদু	০৩৫১-৪২০১০ (অ)
বান্দরবান জেলা	
খন্দকার আক্তারুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৬১-৬৩০০৫ (অ) dfobandarban@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৬১-৬২৩৩৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আলীকদম	০৩৬১-৮১০১০ (অ)
খাগড়াছড়ি জেলা	
জনাব মোহাম্মদ মানিক মিয়া জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৭১-৬১৭২৬ (অ) dfokhagrachari@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৭১-৬২০৯৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহালছড়ি	০৩৭১-৫১০২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দীঘিনালা	০৩৭১-৮১০৪০ (অ)
লক্ষ্মীপুর জেলা	
জনাব মোহাম্মদ আলেক উজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৮১-৬১৪৬৫ (অ) dfolaksmipur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৮১-৬২২৬৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগতি	০৩৮২-৩৫৬২৭৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়পুর	০৩৮২-২৫৬৪৯১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগঞ্জ	০৩৮২-৪৭৫৪৯৫ (অ)
নোয়াখালী জেলা	
বেগম বিলকিস তাহমিনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৩২১-৬১৪৭৩ (অ) dfonoakhali@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩২১-৬১৬৪৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেগমগঞ্জ	০৩২১-৫২৩২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ	০৩২২৩-৫৬৩৮৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সেনবাগ	০৩২২৫-৫৬১৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাতিয়া	০৩২২৪-৫৬০৪৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাটখিল	০৩২২২-৭৫০৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুবর্ণচর	০৩২২৮-৫২১৫৬(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কবিরহাট	০৩২৩২-৫৩২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনাইমুড়ি	০৩২২৭-৫১০১৩ (অ)

সিলেট বিভাগ	
জনাব এ. এস. এম. রাশেদুল হক উপপরিচালক	০৮২১-৭২৬১৩০(অ) (ফ্যা) ddsylhet@fisheries.gov.bd
জনাব আবু হেনা মোঃ মোস্তফা কামাল সহকারী পরিচালক	০৮২১-৭২৩২৫৭ (অ) dfo.sylhet@fisheries.gov.bd
সিলেট জেলা	
জনাব শঙ্কর রঞ্জন দাশ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮২১-৭১৬২৪১ (অ) ০৮২১-৭১৬২৪১ (বা) dfo.sylhet@fisheries.gov.bd
সহকারী পরিচালক, জেলা মৎস্য দপ্তর	০৮২১-৭১১২৯৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮২১-২৮৭০০৩৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালাগঞ্জ	০৮২২২-৫৬১২২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোলাপগঞ্জ	০৮২২৭-৫৬৪২৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিশ্বনাথ	০৮২২৪-৫৬০৭০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জৈন্তাপুর	০৮২২৯-৫৬০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোয়াইনঘাট	০৮২২৮-৫৬০৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জকিগঞ্জ	০৮২৩২-৫৬০২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দক্ষিণ সুরমা	০৮২১-২৮৭৮২১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফেঞ্চুগঞ্জ	০৮২২৬-৫৬২৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কানাইঘাট	০৮২৩৩-৫৬১১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিয়ানীবাজার	০৮২২৩-৫৬০৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ	০৮২২৫-৫৬০৯৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, খাদিমনগর	০৮২১-২৮৭০২২৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গোলাপগঞ্জ	০৮২২৭-৫৬৪২৪ (অ)
সুনামগঞ্জ জেলা	
সুলতান আহমেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৭১-৬১৪৯৭ (অ) dfosunamgonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৭১-৬১৬৬২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিরাই	০৮৭২৪-৫৬৪৭৫ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধর্মপাশা	০৮৭২৫-৭৫০৫১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ছাতক	০৮৭২৩-৫৬০০৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাহিরপুর	০৮৭৩২-৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দোয়ারাবাজার	০৮৭২৬-৫৬০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাল্লা	০৮৭২৯-৫৬০৭২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর	০৮৭২২-৫৬১২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জামালগঞ্জ	০৮৭২৮-৫৬১৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দ: সুনামগঞ্জ	০৮৭১-৬২৪৭১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জগন্নাথপুর	০৮৭২৭-৫৬০৪২ (অ)
হবিগঞ্জ জেলা	
আশরাফ উদ্দিন আহাম্মদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৩১-৬৩৩৫০ (অ) dfohabigonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৩১-৬২৩১৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবীগঞ্জ	০৮৩২৮-৫৬৩০২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বানিয়াচং	০৮৩২৪-৫৬২১০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চুনারুঘাট	০৮৩২৮-৫৬১৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আজমিরীগঞ্জ	০৮৩২২-৫৬১১৬(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাহুবল	০৮৩২৩-৫৬০৯০ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাধবপুর	০৮৩২৭-৫৬১৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লাখাই	০৮৩২৬-৫৬০৩৪ (অ)
মৌলভীবাজার জেলা	
জনাব আ ক ম শফিক-উজ-জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৬১-৫২৮১৩ (অ) dfomoulavibazar@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৬১-৬২৯০৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল	০৮৬২৬-৭১৪৮০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজনগর	০৮৬২৫-৭৫৪৯৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুলাউড়া	০৮৬২৪-৫৬৬৪৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বড়লেখা	০৮৬২২-৫৬৬১৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কমলগঞ্জ	০৮৬২৩-৫৬১৪৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জুড়ী	০৮৬২৭-৫৭১৪৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মৌলভীবাজার সদর	০৮৬১-৫২২৯২ (অ)
বরিশাল বিভাগ	
জনাব মোহাঃ বজলুর রশীদ উপপরিচালক	০৪৩১-৬৪৬২৭ (অ) ০৪৩১-২১৭৫২৭৭ (ফ্যা) ddbarisal@fisheries.gov.bd
জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক	০৪৩১-৬৩৪৫২ (অ)
বরিশাল জেলা	
জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৩১-৬৪০১৮ (অ) dfobarisal@fisheries.gov.bd
সহকারী পরিচালক	০৮৬১-৬৪০৩০(অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৩১-৬২৬০৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাবুগঞ্জ	০৪৩২৭-৭৩০৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুলাদী	০৪৩২৬-৭৫২৩৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হিজলা	০৪৩২৪-৫৬০৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আগৈলঝাড়া	০৪৩২৩-৫৬২৯৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাকেরগঞ্জ	০৪৩২৮-৭৪২৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উজিরপুর	০৪৩২৯-৫৬১৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গৌরনদী	০৪৩২২-৫৬৫৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বানারীপাড়া	০৪৩৩২-৫৬৩৯১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেহেন্দিগঞ্জ	০৪৩২৫-৫৬১৬৪ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	০৪৩১- ২১৭৩৫১৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মেহেদিগঞ্জ	০৪৩২৫-৫৬১৬৫ (অ)
ভোলা জেলা	
জনাব প্রীতিষ কুমার মল্লিক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯১-৬২৪০৭ (অ) pkanamallicki@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৯১-৬২৮৬৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চরফ্যাশান	০৪৯২৩-৭৪০৯০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতখান	০৪৯২৪-৫৬১৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তজুমদ্দীন	০৪৯২৭-৫৬০৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোরহানউদ্দিন	০৪৯২২-৫৬১৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালমোহন	০৪৯২৫-৭৫৬১৭(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনপুরা	০৪৯২৬-৫৬০২১ (অ)

ঝালকাঠি জেলা	
জনাব মোঃ রেজাউল করিম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯৮-৬৩২৫৮ (অ) dfojhalokathi@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৯৮-৬৩২৫৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজাপুর	০৪৯৫৪-৬৫৩৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাঠালিয়া	০৪৯৫২-৫৬০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নলছিটি	০৪৯৫৩-৭৪০৩৪ (অ)
বরগুনা জেলা	
জনাব বঙ্কিম চন্দ্র বিশ্বাস জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৪৮-৬২৩৯৬ (অ) dfoborguna@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৪৮-৬২৩৮১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আমতলী	০৪৪৫২-৫৬১৩৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাথরঘাটা	০৪৪৫৫-৭৫২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বামনা	০৪৪৫৩-৫৬০৭৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেতাগী	০৪৪৫৪-৫৬১৪৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, বরগুনা সদর	০৪৪৮-৬২৬৮১ (অ)
পটুয়াখালী জেলা	
জনাব এস এম আজহারুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.)	০৪৪১-৬২৫০১ (অ) dfokpatuakhali@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৪১-৬২০৯৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলাপাড়া	০৪৪২৫-৫৬৩৬১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গলাচিপা	০৪৪২৪-৫৬১৩৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মির্জাগঞ্জ	০৪৪২৬-৭৫২৮৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দশমিনা	০৪৪২৩-৫৬১৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাউফল	০৪৪২২-৫৬১১৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পটুয়াখালী সদর	০৪৪১-৬২৮০৫ (অ)
পিরোজপুর জেলা	
জনাব মোঃ অলিউর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬১-৬২৫৯৭ (অ) dfopirojpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৬১-৬২৬৯৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মঠবাড়িয়া	০৪৬২৫-৭৫১৮৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাজিরপুর	০৪৬২৬-৭৪০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাউখালী	০৪৬২৪-৫৬২৪৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নেছারাবাদ	০৪৬২৭-৫৬০৪৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জিয়ানগর	০৪৬২২-৫৬১৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভান্ডারিয়া	০৪৬২৩-৫৬৪৩৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পিরোজপুর সদর	০৪৬১-৬২০৬৩ (অ)
মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	
প্রফেসর ড. মোঃ ইদ্রিস মিয়া ডীন, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	০৯১-৬৭৪২৬ (অ)
ড. মুহাম্মদ গোলাম কাদের খান প্রধান, ফিসারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স. ২৯১০ (অ)
প্রফেসর ড. মোঃ আলী রেজা ফারুক প্রধান, অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স. ২৯২০ (অ)
প্রফেসর ড. হারুনুর রশীদ প্রধান, ফিসারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স. ২৯৫৬ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
ড. মোঃ শাহেদ রেজা প্রধান, ফিসারিজ টেকনোলজি বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স. ২৯৭২ (অ)
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	
প্রফেসর ড. মোঃ ফায়েক-উজ্জামান ভাইস-চ্যান্সেলর	০৪১-৭২১৩৯৩ (অ) ০৪১-২৮৩০১১১ (বা)
প্রফেসর ড. মোঃ আইয়াজ হাসান চিশতী প্রধান, এফএমআরটি ডিসিপ্লিন	০৪১-৭৩২১৫৭ (অ) mahchisty@gmail.com
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী	
ড. সুলতান মাহমুদ ডীন, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	০৪৪২৭-৫৬৩১৭ sultanmahmud77@yahoo.com
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	
ড. মুহম্মদ আফজাল হোসাইন চেয়ারম্যান, ফিসারিজ বিভাগ	০৭২১-৭১১১১৭ (অ) afzalh_ru@yahoo.com
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	
মিসেস ওয়াহিদা হক চেয়ারম্যান, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ	৯৬৬১৯২০-৭৭৮৩ (অ) daahsan@yahoo.com
ড. এম. নিয়ামুল নাসের অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ	৯৬৬১৯২০-৫০ এক্স. ৭৫৯৮ (অ)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	
মোঃ আমজাদ হোসেন ডীন, মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	৯২০৫৩৩১ (অ)

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	
ড. মোঃ নূরুল আফসার খান ডীন, মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	০৩১-৬৫৯২১০ (অ)
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	
ড. শাহাব উদ্দিন ডীন, মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	০১৭১২-২৬০২৫৬
হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর	
ড. মোঃ রিজোয়ানুল হক ডীন, মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	০৫৩১-৫১৭৩৪
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	
ড. মোঃ আনিসুর রহমান ডীন, মেরিন বায়োসায়েন্স টেকনোলোজি বিভাগ	০৩১-৬৫৯২১০
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী	
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর সরকার চেয়ারম্যান, ফিসারিজ এন্ড মেরিন সায়েন্স	০৩২১-৭১৪৮৪
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	
ড. এম শাহাদাত হোসেন পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব মেরিন সায়েন্স এন্ড ফিসারিজ	০৩১-৭১০৩৪৭

সংকলনে
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারুক
সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

USAID Disclaimer: "This Publication is made through support provided by the United States Agency for International Development (USAID). The contents and opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the US Agency for International Development or the United States Government."

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

WorldFish

www.fisheries.gov.bd